মুসলিম ইতিহাসের গৌরবগাথা

হযরত মওলানা মুফতি মোহাম্মদ শফি র.

অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

হযরত মওলানা মুফতি মোহাম্মাদ শফী র.

মুসলিম ইতিহাসের গৌরবগাথা

অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম ইতিহাসের গৌরবগাথা

হযরত মওলানা মুফতি মোহাম্মদ শফী র.

অনুবাদ সহযোগী

হাফেজ মওলানা আবু নায়ীম

অনুবাদ সম্পাদনা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

প্রকাশক

খাদিজা আখতার রেজায়ী

ডাইরেক্টর, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

৬৩ গ্রীন ড্রাগন ইয়ার্ড, লন্ডন ই ওয়ান ফাইভ এন জে

ফোন : ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৭৪১৮

বাংলাদেশ সেন্টার

১৭ এ-বি, কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ পশ্চিম পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫ ৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ ওয়ারলেস রেলগেইট মাসজিদ (দোতলা), মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

৩৮ বাংলাবাজার, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), স্টল নং-২২৬

ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫, মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম প্রকাশ : ২০০৬

দ্বিতীয় সংস্করণ

মহররম ১৪২৮, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, মাঘ ১৪১৩

কভার ডিজাইন : আল কোরআন একাডেমী ডিজাইন সেন্টার

কম্পোজ : আল কোরআন কম্পিউটার

বাংলা অনুবাদের স্বত্ব : প্রকাশক

বিনিময় মূল্য : একশত বিশ টাকা মাত্র

MUSLIM ITIHASHER GOURABGATHA

HAZRAT MOULANA MUFTI MOHAMMED SHAFI (R.)

Editor for Bengali Translation

Hafiz Munir Uddin Ahmed

Published by

Khadija Akhter Rezayee

Director, Al Quran Academy London

63 Green Dragon Yeard, London E1 5NJ

Phone : 0044 020 7274 9164 Phone & Fax : 0044 020 7274 7418

Bangladesh Centre

17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205

Phone & Fax : 00880-2-815 8526

Sales Center: 507/1, Wireless Rail Gate Masjid (1st Floor), Moghbazar, Dhaka

38 Banglabazar Computer Market (1st Floor), Stall No-226

Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1st Edition : 2006

2nd Edetion

Moharram 1428, February 2007

Price Tk. 120.00

E-mail: info@alquranacademylondon.com website: www.alquranacademylondon.com

ISBN NO- 984-8490-34-6

www.nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুসলিম ইতিহাসের গৌরবগাথা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা কোরআনে হাকীমে সূরা আলে ইমরানে মানবজাতির উত্থান পতন সম্পর্কে একটি মৌলিক কথা বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– 'এভাবেই আমি মানুষদের মাঝে (তাদের উত্থান পতনের) দিনগুলোকে পালাক্রমে অদল বদল করাই।' *(আয়াত ১৪০)*

সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, রসূল (স.) বলেছেন, যখন কিসরা মারা যাবে তার জায়গায় দ্বিতীয় কোনো কিসরা পয়দা হবে না। যখন কায়সার মারা যাবে তার জায়গায় দ্বিতীয় কায়সার পয়দা হবে না। প্রিয় নবী এ কথাটা বলেছিলেন এমন এক সময় যখন কায়সার ও কিসরার ইরানী ও রোমান সভ্যতা উন্নতির শীর্ষদেশে অবস্থান করছিলো। পৃথিবীর একটি প্রাণীও তখন এটা বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে, আসলেই একদিন এমন কিছু ঘটবে। কিন্তু ইতিহাস দেখতে পেলো, সত্যিই মুসলমানদের হাতে কায়সার কিসরার সাম্রাজ্য রাজপ্রাসাদ ও বিপুল ঐশ্বর্য খান খান হয়ে গেলো। প্রিয়নবীর কথাই যথার্থ প্রমাণিত হলো, ইরানে অগ্নীপূজক বাদশার পরাজয়ের পর আজ পর্যন্ত আর কোনো অগ্নীপূজক বাদশাহ সে সিংহাসনে আরোহণ করেনি। রোমে সেই রোমান বাদশাহর পরাজয়ের পর সেখানেও আজ পর্যন্ত কোনো রোমান বাদশাহ ক্ষমতার আসনে বসতে পারেনি।

কোরআনে কারীমের এই আয়াতটির আলোকে আমরা চাইলে এই মানব জাতির উত্থান পতনের কিছু খন্ড চিত্র সহজেই দেখে নিতে পারি। রোমান ও ইরানী সভ্যতা যখন তবুক, কাদেসীয়া ও ইয়ারমুকে একে একে মুসলিম বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হচ্ছিলো, তখন কি কেউ ভাবতে পেরেছিলো যে, মাত্র কয়েকশ' বছরের ব্যবধানে দুর্ধর্ষ তাতার ও ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের হাতে বাগদাদ ও বায়তুল মাকদেসের নির্মম পতন ঘটবে!

জেরুজালেমের সেই বর্বর হত্যাযজ্ঞের কিছুকালের ব্যবধানেই সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর হাতে বায়তুল মাকদেস পুনরায় মুক্ত হলো– আজ আবার কয়েকশ বছর পর ঈসা ও মূসা নবীর স্মৃতি বিজড়িত সেই পবিত্র নগরী মুক্তির জন্যে আর্তনাদ করছে। ফিনকি দিয়ে মানুষের রক্ত ঝরছে সেখানে প্রতিদিন। আরেক সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর অপেক্ষায় মৃত্যুর সাথে লড়ছে সেখানকার লক্ষ লক্ষ অসহায় নারী ও শিশু।

বর্তমান পুস্তকটি উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন পাকিস্তানের সাবেক মুফতিয়ে আযম হযরত মওলানা মোহাম্মদ শফি (র.)-এর এক অবিস্মরণীয় সংগ্রহ। বইর শুরুতে তিনি এই বইটির ঐতিহাসিক পটভূমিকা স্ববিস্তারে বর্ণনা করেছেন, তার কথাগুলো তার কলমেই ভালো মানায় বলে আমি আর সেদিকে যাবো না। বইটির মূল পাণ্ডুলিপি দেখে আমি আমার নিজের প্রতিক্রিয়াটুকুই শুধু আপনাদের কাছে ব্যক্ত করতে পারি।

www.nagorikpathagar.org

অতীতের গৌরবগাথা প্রত্যেকটি জাতির জীবনেই জ্ঞানের একটি মূল্যবান উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। জাতি হিসেবে আগামী কালের পৃথিবীতে কিছু অবদান রাখতে চাইলে স্বাভাবিকভাবেই তার অতীতের প্রসংগ আসবে। কোনো জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যত গড়ায় অবশ্যই সে সম্প্রদায়ের ওপর আস্থা রাখা যাবে, যাদের শত শত বছর ধরে দুনিয়ার মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতি নির্মাণের ঐতিহ্য রয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে মুসলমানদের চাইতে সমৃদ্ধশালী ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক দ্বিতীয় কোনো জাতি এই ভূখন্ডে জন্মগ্রহণ করেনি। আমরা মুসলমানরাই দিনের বেলায় যুদ্ধ করে রাতের আঁধারে শত্রুপক্ষের সেনাপতিকে ডাক্তার সেজে চিকিৎসা সেবা পৌছে দিয়েছি। আমরা মুসলমানরাই ফোরাত নদীর পাড়ে আহত অবস্থায় পড়ে থাকা একটি কুকুর ছানাকেও তার প্রাপ্য সেবা দিয়েছি। সমস্ত রাজক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও মসজিদের জন্যে নেয়া একখন্ড যমীন একজন গরীব মহিলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমরাই তাকে ফেরৎ দিয়েছি। মানবতার কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষের জন্যে আমাদের তুলনা আমরাই। মানব সন্তানের সমগ্র ইতিহাসে এ পর্যায়ে আমাদের কোনো প্রতিপক্ষ নেই। আমরাই এখানে আমাদের পক্ষ।

এ বইটির পাতায় পাতায় যেমন আমাদের ইতিহাসের শীর্ষস্থানীয় আলেম, ওলামা মাশায়েখ ও ফেকাহবিদদের বীরত্ব ও সাহসিকতার শত শত উদাহরণ ছড়িয়ে আছে, তেমনি আছে দ্বীনবিমূখ কতিপয় বিলাসী খলিফা, আমীরুল মোমেনীন, সুলতান ও রাজা বাদশাহদের কলংকজনক কাহিনী।

এসব মর্দে মোজাহেদরা দুনিয়ার শাসকদের অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতনের সামনেও 'অত্যাচারী শাসকদের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জেহাদ'– প্রিয় নবীর এই বিখ্যাত হাদীসের যথার্থ হক আদায় করেছেন। আল্লাহ তায়ালা জান্নাতুল ফেরদাউসের সর্বোচ্চ আসনগুলো তাদের জন্যে বরাদ্দ করুন।

সর্বজন স্বীকৃত আলেম, মোফাসসেরে কোরআন ও মুফতি মোহাম্মদ শফি (র.) তার কিছু স্মৃতিকথা, কিছু তার ইতিহাসতত্ত্ব নিয়ে যে বইটি তৈরী করেছেন তা সত্যিই অপূর্ব। ঘটনা ও বর্ণনা বিন্যাস একে চমকপ্রদ একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থে পরিণত করেছে।

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন কোরআন গবেষণাধর্মী ও সৃজনশীল পুস্তকের পাশাপাশি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সিরিজটি কেন প্রকাশ করতে যাচ্ছে, একবার বইটি পাঠ করলে আশাকরি পাঠক তা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন।

বছর খানেক আগে বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক হাফেজ আবু নায়ীম যখন আমাকে এই বইগুলোর কথা বললেন, তখন এগুলোর প্রকাশনা নিয়ে আমি নিজেই কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলাম। পরে যখন সাহস করে একবার বইগুলো নিজে পড়লাম, তখন বুঝতে পারলাম– এ বইগুলো মনে হয় আমাদের আরো আগে বের করা উচিৎ ছিলো। বিলম্বে প্রকাশের দুঃখ থাকলেও বইগুলো হাতে পাওয়ার পর আমার অনাবিল স্বস্থির সাথে আমি আপনাকে শরিক করতে পারছি এটাই আমার বড়ো আনন্দ।

বিনীত
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
লন্ডন

www.nagorikpathagar.org

এই গ্রন্থের বিষয়সূচী

লেখকের কথা	১১
অমুসলিমদের অন্তরে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালোবাসা	১৩
হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ	১৪
হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শ	১৬
মানুষের নিজের হাতে অর্জিত কর্মফল	১৬
খলীফা মনসুরের দরবারে এক কয়েদী	১৮
হযরত সুফিয়ান সওরী (র.)–এর একটি উপদেশ	১৯
জীবিকা আহরণের মহাফযীলত	১৯
হযরত হাতেম আসাম্মের তেত্রিশ বছরে আটটি মাসয়ালা শেখা	২০
মৃত্যুর পর হযরত খলীল আহমদ (র.)-এর উক্তি	২২
বীরত্বের এক বিস্ময়কর উদাহরণ	২২
হযরত আবু বকর তামেস্তানী (র.)-এর উক্তি	২৪
ইমাম আবু হানীফা (র.) সম্পর্কে হাফেযে হাদীস ও ইমামদের কয়েকটি অভিমত	২৫
হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও হযরত ইয়াহইয়া বিন মোয়াম্মার (র.)	২৯
নাম ও নামধারীর মাঝে কুদরতী সম্পর্ক	৩০
হযরত সুফিয়ান সাওরী ও সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না (র.)	৩১
[illegible] বিন কোবায়সা (র.)-এর ইসলাম গ্রহণ	৩২
রসূলুল্লাহ (স.)-এর জামা কেমন ছিলো	৩৩
আব্বাদ খাওওয়াস (র.)-এর নামে সুফিয়ান সাওরীর (র.) চিঠি	৩৫
ভালোবাসার পুরস্কার	৩৫
নেককারদের বিদ্যমান থাকায় সৃষ্টিকুলের লাভ	৩৮
হযরত আবু মোসলেম খাওলানী (র.) ওপর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মোজেযার প্রতিফলন	৩৯
হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ পত্র	৪১
সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাস্বল্পতা সম্পর্কে ফোযায়ল বিন ইয়ায (র.)	৪৩
ইমাম আবু হানীফা ও আতা বিন আবী রাবাহর (র.) কথোপকথন	৪৩
হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.)-এর প্রথম ভাষণ	৪৪
আজব উপকারী বিষয়	৪৪
একটি উপকারী মাসয়ালা	৪৫
মোফাসসেরে কোরআন কাযী বায়যাবী (র.)	৪৫
মোমেনের দুনিয়া ও কাফেরের দুনিয়া	৪৬
কাফের এবং অপরাধীদের সাথে মুসলমানদের সদাচরণ	৪৮
সুফিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিতে বেদয়াত	৪৮
তরীকতের ইমাম হযরত ফোযায়ল বিন ইয়ায (র.)	৪৯
হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (র.)	৪৯
হযরত যুননূন মিসরী (র.)	৫০
হযরত বেশর হাফী (র.)	*৫০*

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবু বকর দাক্কাক (র.)	৫১
হযরত আবু আলী জাওযেজানী (র.)	৫১
হযরত আবু বকর তিরমিযী (র.)	৫১
হযরত আবুল হাসান ওয়াররাক (র.)	৫২
হযরত ইবরাহীম বিন শায়বান (র.)	৫২
হযরত আবু ওমর যুজাজী (র.)	৫২
হযরত আবু ইয়াযীদ বোস্তামী (র.)	৫২
হযরত আবু মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব সাকাফী (র.)	৫৩
হযরত সাহল তস্তরী (র.)	৫৩
হযরত আবু সোলায়মান দারানী (র.)	৫৪
হযরত আবু হাফস হাদ্দাদ (র.)	৫৪
হযরত হামদূন কাস্সার (র.)	৫৫
হযরত আহমদ বিন আবিল হাওয়ারী (র.)	৫৫
হযরত জোনায়দ বাগদাদী (র.)	৫৫
হযরত আবু ওসমান জায়রী (র.)	৫৬
হযরত আবুল হোসাইন নববী (র.)	৫৬
হযরত মোহাম্মদ বিন ফযল বলখী (র.)	৫৬
হযরত শাহ শুজা কেরমানী (র.)	৫৭
হযরত আবু সায়ীদ খাররায (র.)	৫৭
হযরত আবুল আব্বাস বিন আতা (র.)	৫৭
হযরত ইবরাহীম খাওওয়াস (র.)	৫৭
হযরত বেনান হাম্মাল (র.)	৫৮
হযরত আবু হামযা বাগদাদী (র.)	৫৮
হযরত আবু এসহাক রাক্কাশী (র.)	৫৮
হযরত মোমশাদ দায়নূরী (র.)	৫৮
হযরত আবু আলী রোযবারী (র.)	৫৮
মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মানাযেল (র.)	৫৮
হযরত বেন্দার ইবনুল হোসাইন (র.)	৫৯
নৈতিকতা ও সামাজিকতায় ভাষা এবং পোশাকের প্রভাব	৫৯
ইসলামের মধ্যপন্থার এক উদাহরণ	৬০
ইউরোপীয় দেশসমূহে ইসলামী ভাষা সভ্যতা ও সংস্কৃতি	৬২
স্পেনে আরবী ভাষা ও সংস্কৃতি নিশ্চিহ্নকরণ ও গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ	৬৬
জাগতিক মসিবতসমূহ আল্লাহর রহমত না আযাব	৬৮
হযরত আবু হোরায়রা (রা.)-এর রাত দিন	৬৯
হযরত আহমদ বিন হাম্বল (র.)-এর বাণীসমূহ	৬৯
হযরত ইয়াহইয়া বিন মোআয রাযী (র.)	৭২
হযরত আবুল কাসেম নসরাবাদী (র.)	৭২
হযরত মোহাম্মদ ইবনুল হাসান শায়বানী (র.) সংকলিত গ্রন্থ মাবসূত	৭২

www.nagorikpathagar.org

ফকীহদের মতভেদপূর্ণ বিষয়ে একটি নাকি একাধিক মত সঠিক	৭৩
ফ্যাশনপূজারী মহিলাদের জন্যে ফ্যাশন আবিষ্কারকদের ফতোয়া	৭৫
ইউরোপবাসীর হাস্যকর ওয়াকফ	৭৭
ইমাম শাফেয়ী (র.) হারুনুর রশীদের দরবারে	৭৭
পূর্বযুগের ওলামায়ে কেরামের কিছু প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি ঃ	
মানুষের সাথে মেলামেশা ও দূরে থাকার ভারসাম্যপূর্ণ হুকুম	৭৯
সুন্নতের অনুসরণ হচ্ছে সবচাইতে বড় তাকওয়া	৭৯
বিনয়ের মোড়কে অহংকার	৮০
সন্তানদের দীক্ষাদানের কাজ আল্লাহর হাতে সমর্পণ	৮০
নিয়ত সহীহ্ করা আমল সহীহ্ করার চাইতে বেশী জরুরী	৮০
কোন্ আমল পরিমাণে অধিক ?	৮১
শিক্ষাদান ও ওয়ায কেমন লোকের অধিকার?	৮১
বাগদাদের এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য	৮১
আবু জাফর মনসুর ও রোমক দূতের মধ্যকার আলাপচারিতা	৮২
জনৈক উদারমনা বাগদাদী সাকী	৮৩
ইউরোপবাসীর দৃষ্টিতে ইউরোপীয় সভ্যতা	৮৩
ইউরোপের অন্ধ অনুসারীদের জন্য ইউরোপের ফতোয়া–	৮৪
ইসলামী সামাজিকতা–রসূল (স.)–এর ঘোষণা	৮৪
সামাজিকতার সাধারণ মূলনীতি	৮৫
জার্মানীতে নারী স্বাধীনতার হাশর	৮৬
মিসরীয় আলেমদের দৃষ্টিতে হিন্দুস্তানে হাদীস ও হানাফী মাযহাব	৮৯
বিধিবিধান সম্পর্কিত হাদীসসমূহের চর্চা	৯১
মূতার রণাঙ্গণে হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)-এর ভাষণ	৯৬
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মোজেযা ঃ ফাযালা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ	৯৮
নবুওয়তের এক বিস্ময়কর ঘটনা– রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতেকাল পরবর্তী মোজেযা	৯৯
আরেক বিস্ময়কর ঘটনা	১০০
বিশ্বময় ইসলাম কিভাবে বিস্তার লাভ করছে?	১০১
ডক্টর খালেদ শেলড্রক কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন?	১০১
ইসলামের বিরুদ্ধে খৃষ্টবাদের বিভ্রান্তিমূলক প্রোপাগাণ্ডা	১০৩
মুসলমানদের কর্মক্ষেত্রে দ্বীনের নমুনা হওয়া কর্তব্য	১০৫
ইসলামী সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব	১০৬
বিশ্বাসগত বাস্তবতা	১০৮
কাফেরদের জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থান	১১০
সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা ও দ্বীনী বিষয়ে ব্যক্তির অনুসরণ	১১৩
দ্বীনী বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণের মূলতত্ত্ব	১১৪
মদীনাবাসীর হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা.)-এর অনুসরণ	১১৬
দ্বীনী বিষয়ে নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র	১১৭
জ্ঞানার্জন সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত	১২৩

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাজীবনে দারিদ্র এবং ক্ষুধায় ধৈর্য ধারণ	১২৪
ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর শিক্ষাজীবন	১২৪
ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর শিক্ষাজীবন	১২৫
আলী (রা.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি	১২৭
ঈসা বিন মোসাইয়াবের উক্তি	১২৭
হাকীম জালীনূসের উক্তি	১২৭
হযরত লায়স বিন সলীম (র.)-এর উক্তি	১২৭
হাদীসবেত্তা হযরত শাবী (র.)-এর উক্তি	১২৭
আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর উক্তি	১২৭
হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর উক্তি	১২৭
হযরত জাবের (রা.)-এর উক্তি	১২৮
সুফিয়ান সাওরী (র.)-এর উক্তি	১২৮
আধুনিক আবিষ্কার এবং মুসলমান	১২৮
কিছু কিছু আলেম ওলামার গ্রন্থ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ	১৩০
ছাত্রজীবনে আমলের প্রচেষ্টা	১৩২
হযরত ঈসা (আ.)-এর একটি উপদেশ	১৩২
প্রকৃত লজ্জা	১৩৩
ইমাম আওযায়ী (র.) মনসূর আব্বাসীর দরবারে	১৩৩
খলীফা মামুনুর রশীদ ও এক কমবয়সী কাযীর মধ্যকার পত্রালাপ	১৩৬
সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধ রহমত	১৩৭
কাফেরদের সাথে যুদ্ধে মুসলমানদের কঠোর সাবধানতা	১৩৭
কূফায় হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)	১৩৭
হযরত বেশর হাফী (র.)-এর কিছু অবস্থার বর্ণনা	১৩৮
মিথ্যা চাটুকারিতার শাস্তি	১৩৯
আসকালানে হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.)	১৪০
সংস্কার সংশোধনের দায়িত্বশীল ওলামায়ে কেরাম এবং নেতৃস্থানীয় সম্প্রদায়	১৪০
ফলিকার নামে হযরত যার বিন হোবায়শ (র.)-এর পত্র	১৪১
রুবয়ী বিন হেরাশ (র.)-এর সত্যবাদিতা এবং তার বরকত	১৪১
হযরত ওয়ায়স করনী (র.)-এর কিছু উপদেশ	১৪২
গান বাজনা সম্পর্কে শায়খ তকীউদ্দীন সুবকী (র.)	১৪২
দোজানা প্রদেশের এক আজব ঘটনা	১৪৩
আধুনিক সভ্যতার ধারক বাহকরা নিজেরাই তাদের ওপর বিরক্ত	১৪৬
হযরত যুল বাজাদাইন (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ	১৪৭
কুদরতের এক বিস্ময়কর নিদর্শন	১৪৮
বিভিন্ন পর্যায়ে রূহ ও দেহের সম্পর্ক	১৪৯

www.nagorikpathagar.org

আগের ও পরের যুগের ওলামায়ে কেরামের এলেমের পার্থক্য	১৫১
কল্যাণকর এলেম	১৫৪
দৃঢ় এলেমের অধিকারী কারা	১৫৫
সত্যপন্থী ও বাতিলপন্থীদের এক বিশেষ পার্থক্য	১৫৬
ইতিহাসের কতিপয় বিস্ময়	১৫৬
আরব দেশে কেয়াফা ও এয়াফা শাস্ত্র	১৫৬
কেবলার দিক নির্ধারণে অংক অথবা নক্ষত্র দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ	১৫৭
সাহাবাদের অনুসরণ ও হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ	১৫৭
পার্থিব বিপদ মসিবত অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, মহামারী	১৫৭
দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ মহামারী	১৫৮
ভূমিকম্প	১৫৯
হজ্জের অনুষ্ঠানাদি এবং কোরবানী আল্লাহ প্রেমের প্রকাশস্থল	১৬০
এতেকাফ	১৬৩
হজ্জের অনুষ্ঠানাদি প্রেমের দ্বিতীয় মনযিল	১৬৩
প্রেমের সর্বশেষ মনযিল হচ্ছে কোরবানী	১৬৪
সাপ মানুষকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করেছে	১৬৫
জ্ঞাতব্য	১৬৫
একটি পরীক্ষিত আমল	১৬৬
সুলতান নূরুদ্দীন জংগী শহীদ (র.)	১৬৬
সিংহ বকরী এক ঘাটে	১৬৭
হযরত আবুল আলিয়া রাবাহী (র.)	১৬৭
বন্ধু বান্ধবের সংগে সাক্ষাত	১৬৮
হযরত হাসান বসরী (র.)	১৬৮
ফকীহের পরিচয়	১৬৮
অনাগ্রহীকে এলেম শেখানো উচিত নয়	১৬৯
আবুদল্লাহ বিন আমর (রা.) বিন আসের হাদীস সংকলন	১৬৯
আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) সম্পর্কে হযরত ইমাম শাবী (র.)	১৬৯
হযরত আবু হোরায়রা (রা.) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)	১৬৯
কোরআনের ভাষ্যকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ছাত্র জীবন	১৭০
নবুওয়ত যুগের মুফতী	১৭১
হযরত ওসমান গনী (রা.) ও হযরত যায়দ বিন সাওহান (রা.)	১৭১
সুকণ্ঠ পাঠক থেকে কোরআন শোনা পছন্দনীয়	১৭২
আত্মত্যাগের এক আজব উদাহরণ	১৭২

www.nagorikpathagar.org

শালীন শব্দ ব্যবহারের সূক্ষ্ম উদাহরণ	১৭৩
উচ্চ স্বরে ও নিম্ন স্বরে যেকের সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি	১৭৩
দুনিয়ায় তাকওয়ার বরকত	১৭৫
হযরত যোহায়র বিন নোয়াইম বানী (র.)	১৭৬
স্বপ্নের আদেশ সম্পর্কিত ফতোয়া	১৭৬
অন্তরের দাওয়াই	১৭৭
জ্বিনদের মাঝে হাদীসের বর্ণনা ও শিক্ষা কার্যক্রম	১৭৭
ওস্তাদ এবং আলেমের সম্মান	১৭৮
বড় কথার নগদ শাস্তি	১৭৮
সময়ের দাবী কি?	১৭৮
চিন্তার বিষয় (প্রায় ৭০ বছর আগের লেখা একটি প্রতিবেদন)	১৭৯
সভ্য দেশসমূহে অপরাধের বন্যা	১৮১
ইউরোপীয় শহরসমূহে হত্যাপরাধ	১৮৩
পুলিশ বিভাগের ব্যয় আটাইশশ' কোটি টাকা	১৮৪
ব্যভিচার বেহায়াপনা	১৮৫
প্রবন্ধের উপসংহার	১৮৭
আলেম সমাজের জন্য মূল্যবান পথনির্দেশ	১৮৮
জান্নাত জাহান্নামের অবস্থান	১৮৯
বাবা মাকে সৎকাজের আদেশ দান পদ্ধতি	১৮৯
গোনাহের আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ নিজের কাছে রাখা	১৮৯
মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র.)-এর সত্য ভাষণ	১৮৯
ইসলামের ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা–	
মুসলমানদের প্রত্যেক ষষ্ঠ শাসক অপসারিত বা নিহত হন	১৮৯
আব্বাসী খেলাফত	১৯০
ফাতেমী খলীফাদের অবস্থা	১৯১
আইউবী খেলাফত	১৯১
তুর্কী খলীফাদের অবস্থা	১৯২
হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.)-এর উক্তি	১৯২
ইউরোপবাসীর দৃষ্টিতে ফেকাহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কেতাব হেদায়া	১৯২
যুবকদের পরিবর্তে বৃদ্ধ প্রবীণদের সাহচর্য উত্তম	১৯২
মানুষের সৌভাগ্য	১৯৩
আরবী ভাষার বিস্ময়কর প্রশস্ততা	১৯৩
সম্মান মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে হযরত ইউসুফ বিন আসবাত (রা.)	১৯৩
হযরত কোতায়বা বিন মুসলিম (র.)-এর অশ্বপৃষ্ঠে নদী অতিক্রম	১৯৩

www.nagorikpathagar.org

লেখকের কথা

এ পুস্তকটি বিচ্ছিন্ন কিছু বিষয়সূচীর সমষ্টি। এতে কোনো নির্দিষ্ট জ্ঞান বা বিষয়ের বিশেষত্ব নেই। ক্রমবিন্যাস বা বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় বিন্যাসেরও এখানে কোনোরকম রেয়াত করা হয়নি। বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়নকালে কোথাও কোনো সংক্ষিপ্ত ও মনোমুগ্ধকর বিষয় দৃষ্টিগোচর হলে তা আমি লিপিবদ্ধ করে রাখি। আসলে আজকাল মানুষ সময়ের স্বল্পতাহেতু লম্বা চওড়া আলোচনা পড়তে চায় না। অথচ এ ধরনের কোনো কোনো আলোচনা কিংবা কয়েক ছত্রের উপকারী বাক্য কখনও কখনও মানুষের জীবনে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করে দিতে পারে।

এ বিষয়গুলো দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত আল কাসেম, আর রশীদ ও আল মুফতীসহ প্রাচীন মাসিক পত্রিকায় এক সময় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মহান আল্লাহ এই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বিষয়সমূহকে যথাযথ গ্রহণযোগ্যতা দান করুন। বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষ থেকে এগুলোকে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশের তাগাদা আসে। এক সময় এর কিছু অংশ পুস্তিকাকারে ছাপাও হয়, কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই তা দুর্লভ হয়ে পড়ে। প্রায় বিশ বছর পর আমার প্রিয় সন্তান মোহাম্মদ রাযী তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'দারুল এশাআত' থেকে এই পুস্তিকাটি প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং সে এর সব অংশগুলো যোগাড় করে গুছিয়েও নেয়। এবারে গুছিয়ে নেয়া বিষয়ের সাথে আরো কিছু নতুন বিষয়ও সংযোজন করা হয়েছে। এ ধরনের পুস্তকে ক্রমবিন্যাস তো স্বাভাবিকভাবেই থাকার কথা নয়, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় আশা করা যায়, সর্বস্তরের সকল মেযাজের মানুষের জন্যে এ পুস্তিকাটি উপকারী এবং আকর্ষণীয় হবে।

বান্দা

মোহাম্মদ শফী

১৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৮০ হিজরী

৫ই নভেম্বর ১৯৬০ ইং

খাদেম. দারুল উলুম করাচী, পাকিস্তান

www.nagorikpathagar.org

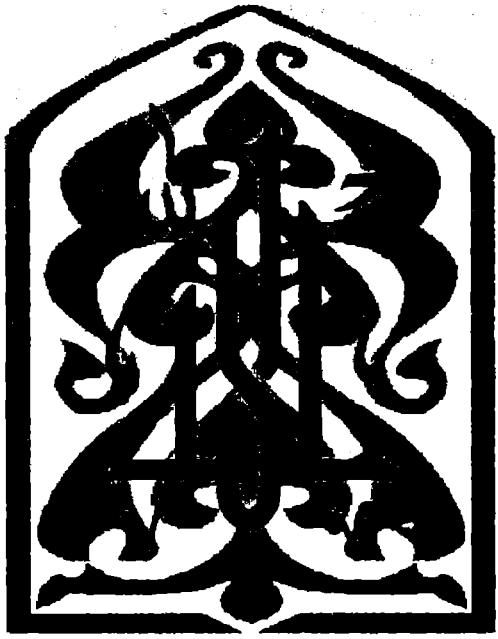

www.nagorikpathagar.org

অমুসলিমদের অন্তরে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালোবাসা

ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা.) শেরেক ও মূর্তিপূজার জালে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলাম ও মুসলমানের দুশমন দলের অন্তর্ভুক্ত। এ সময় তিনি ইসলাম এবং ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কার্যক্রম, রীতিনীতির কোনোটাকেই ভালো নযরে দেখতেন না। তাকে কোরায়শের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে মান্য করা হতো। অথচ তাজ্জবের বিষয়, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁর ভালোবাসায় ছিলেন বিভোর।

হাদীস ও ইতিহাসবেত্তা হযরত ইবনে আসাকের (র.) স্বরচিত ইতিহাস গ্রন্থে যোবায়র ইবনে বাক্কার (রা.)-এর সূত্রে উল্লেখ করেন, এক সময় নির্দয় যালেম কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর গোত্র বনী হাশেমকে সম্পূর্ণ বয়কট করে পাহাড়ী উপত্যকায় আবদ্ধ করে তাদের কাছে খাদ্য পানীয় পৌঁছার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলো। এ বয়কটের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের গাছের পাতা খেয়ে দিনাতিপাতের ঘটনাও ঘটে। এ সময় নিজের বংশ, গোত্র ও সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের জন্যে খাদ্য পানীয় পাঠায় এমন বুকের পাটা কার, কিন্তু হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.) অবরুদ্ধ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে খাদ্যশস্য পৌঁছানের একটা পন্থা উদ্ভাবন করেন। পন্থাটি হচ্ছে, তাঁর ব্যবসায়ী কাফেলা যখন গম নিয়ে শাম (সিরিয়া) থেকে আসতো, তখন যেসব উট ও গাধার পিঠে গমের বোঝা থাকতো, সেগুলোকে উক্ত পাহাড়ী উপত্যকার প্রবেশপথে নিয়ে তিনি পেটাতে শুরু করতেন। এমনভাবে পেটাতেন যে, গমবাহী উট ও গাধাগুলো ভেগে গিয়ে পাহাড়ী উপত্যকায় পৌঁছে যেতো, আর এ সুযোগে বনী হাশেমের লোকেরা সেগুলো ধরে তাদের পিঠ থেকে খাদ্যশস্য নামিয়ে নিতেন।

হযরত ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেন, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা.) বলতেন, জাহেলিয়াতের যুগেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি আমার ভালোবাসা ছিলো অনেক বেশী। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হিজরত করে যখন মদীনায় উপনীত হন, তখন হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা.) হজ্জের মওসুমে হজ্জ আদায় করছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, আরবের সুপ্রসিদ্ধ বাদশাহ যী-ইয়াযানের একটি চোগা বাজারে বিক্রী হচ্ছে। তিনি যদিও তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভালোবাসার প্রেরণা তাকে বাধ্য করলো, বাদশাহ যী-ইয়াযানের এ মূল্যবান সুন্দর চোগাটি তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে হাদিয়া দেবেন। তিনি চড়া মূল্যে চোগাটি কিনে মদীনার উদ্দেশে যাত্রা করেন, এক সময় তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

www.nagorikpathagar.org

সাল্লামের খেদমতে উপনীত হলেন। খেদমতে উপনীত হয়ে তিনি নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ চোগাটি আমার থেকে হাদিয়ারূপে গ্রহণ করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কখনও কখনও কাফেরের হাদিয়াও গ্রহণ করতেন। নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে এর প্রমাণ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা.)-এর ভালোবাসা দেখে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, সম্ভবত হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.) ইসলাম গ্রহণ করবেন। তিনি এরশাদ করলেন, আমি মোশরেকদের হাদিয়া গ্রহণ করি না। অবশ্য আপনি চাইলে আমি মূল্য পরিশোধ করে এ চোগা নিতে পারি।

এক বর্ণনায় আছে, হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার হাদিয়া ফেরত দেয়ায় আমি কঠোর অস্থিরতায় নিপতিত হই। তাঁর থেকে মূল্য গ্রহণ করে হাদিয়াটা তাঁকে দেয়াও আমার পছন্দের বিষয় ছিলো না। তাই আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবার থেকে এ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে উঠি, সর্বপ্রথম যার সাথে দেখা হবে তার কাছেই আমি চোগাটি বিক্রি করবো। এতে দাম যতো কমই হোক। ওদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত যায়দ বিন হারেসা (রা.)-কে গোপনে আমার পেছনে লাগিয়ে দেন। তাকে বলে দিলেন, হাকীম চোগাটি বেচতে চাইলে তুমি কিনে নেবে। হযরত যায়দ বিন হারেসা (রা.) আমার বিক্রি করা চোগাটি রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্যে কিনে নেন। এ ঘটনার পর যখন আমি চোগাটি তাঁর দেহে সুশোভিত দেখতে পাই, তখন আমার আনন্দের আর কোনো সীমা থাকেনি। কেননা, এতে একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন এ চোগাটি পরিধান করতেন, তখন আমার তাঁকে দুনিয়ার সবচাইতে সৌন্দর্যমণ্ডিত মানুষ বলে মনে হতো। *(তারীখে ইবনে আসাকের, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৫; লেগায়াহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৬)*

বদর যুদ্ধের সময়ও হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.) নিজের স্বজাতিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধ থেকে ফেরানোর যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ওতবা বিন রবিয়াকে অনেকটা নিজের সমমনা করেও ফেলেছিলেন, কিন্তু এ যুদ্ধে আবু জাহলের ভাগ্যলিপিতে মৃত্যু লেখা ছিলো, তাই যুদ্ধ বন্ধের কোনো প্রচেষ্টাই সে কার্যকর হতে দেয়নি। *(তারীখে ইবনে আসাকের, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৪)*

হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.) জাহেলী যুগে কুফুরের অবস্থায়ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা পোষণ করতেন, যেমনটা আগের ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়। তবে ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তখনও তাঁর অন্তর পুরোপুরি প্রশস্ত এবং আশ্বস্ত হয়নি। তাই নবম হিজরী সন পর্যন্ত নিজের পিতৃপুরুষের ধর্মের ওপরই তিনি স্থির থাকেন। অনন্তর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও

www.nagorikpathagar.org

তাঁর সত্যনিষ্ঠ ভালোবাসার কারণে আন্তরিকভাবে এ বাসনা পোষণ করতেন, যেন হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.) ইসলাম গ্রহণ করে সৌভাগ্যশালী হন এবং কুফুর ও শেরেকের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কা মোকাররামার নিকটবর্তী হয়ে আমাকে বললেন, মক্কা শরীফে এমন চার ব্যক্তি রয়েছে, যাদের শেরেকে জড়িয়ে থাকা আমার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর এবং অপসন্দনীয়। আমার আন্তরিক কামনা, তারা মুসলমান হয়ে যাক। আমি নিবেদন করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! সে চার ব্যক্তি কারা ? তিনি এরশাদ করলেন, সে চার ব্যক্তি হচ্ছে–

(১) এতাব বিন ওসায়দ, (২) জোবায়র বিন মোতয়েম, (৩) হাকীম বিন হেযাম, (৪) সাহল বিন ওমর। মহান আল্লাহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাসনা পূর্ণ করে দেন। এ চার জনই ইসলাম গ্রহণ করেন।

সারকথা হচ্ছে, যতোক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম এবং ইসলামের শিক্ষার সত্যতা সম্পর্কে হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.)-এর অন্তর পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হয়নি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আন্তরিক প্রীতি ভালোবাসা পোষণ সত্ত্বেও ততোক্ষণ পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। আর যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করলেন এবং তিনি তাওহীদের স্বাদ আস্বাদন করেন, তখন বিলম্বে ইসলাম গ্রহণের জন্যে ততোদিন পর্যন্তই দুখ প্রকাশ করতে থাকেন।

একদিন দেখা গেলো, হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.) অঝোরে কাঁদছেন। তাঁর মেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আব্বা! আপনি এমন অঝোরে কাঁদছেন কেন ? তিনি বললেন, আমার সকল কর্মতৎপরতাই হচ্ছে কান্নার উপযোগী। আমি ইসলাম গ্রহণে এতোটা বিলম্ব করে ফেলেছি যে, বড়ো বড়ো যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে শরীক থাকার সুযোগ আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে আমার অন্তর পূর্ণ প্রশস্ত হয়নি।

(তারীখে ইবনে আসাকের, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৭)

কোথায় সে মিথ্যারোপকারী যালেম, যে প্রচার করে বেড়ায়– ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে? সে মিথ্যারোপকারী যালেম হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.)-কে গিয়ে জিজ্ঞেস করুক, কোন্ তরবারি তাঁকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে।

মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হবার পর পরই হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.) রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে হোনায়নের জেহাদে শরীক হন। একবার তাঁর আর্থিক প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমীপে তাঁকে কিছু আর্থিক অনুদান প্রদানের আবেদন করেন। তাঁর আবেদনক্রমে সে যাত্রা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে কিছু আর্থিক অনুদানও প্রদান করেন। পরবর্তীতে আবার এমন অবস্থা দেখা দিলে তিনি পুনরায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা

www.nagorikpathagar.org

করেন। এবারও তিনি হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.)-কে দান করলেন বটে, তবে সাথে সাথে উপদেশ দিলেন–

এ ধন সম্পদ হামেশাই মনোলোভা এবং মিষ্ট। যে তা পরাঙ্মুখ হয়ে গ্রহণ করে তার তাতে বরকত হয়, আর যে মানসিক কামনা-বাসনা আর লোলুপতার সাথে তা গ্রহণ করে, তাতে তার কোনো বরকত হয় না। তার অবস্থা দাঁড়ায় সে ব্যক্তির মতো, যে খায় অথচ তার উদরপূর্তি হয় না। মনে রেখো, দাতার হাত গ্রহীতার হাত থেকে উত্তম। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এ উপদেশ চিরকালের জন্যে নিজের কণ্ঠহার বানিয়ে নেন। নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম! আপনার পরে আমি আর কাউকে আমাকে কিছু দেয়ার কষ্টে ফেলবো না। এর পর তিনি গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল থেকেও নিজের নির্ধারিত অংশ গ্রহণ করেননি। হযরত সিদ্দীকে আকবর ও হযরত ওমর (রা.) গনীমতের মালের অংশ হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.)-কে দিতে চাইতেন, কিন্তু তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপদেশ সম্বলিত উল্লিখিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে গনীমতের মাল থেকে নিজের অংশ গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করতেন।

হযরত হাকীম বিন হেযাম (রা.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শ

একবার হযরত ওমর (রা.) বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে সাহাবায়ে কেরামের জন্যে কিছু ভাতা নির্ধারিত করে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে তিনি মোহাজের এবং আনসারের পরামর্শ গ্রহণ করেন। সবাই হযরত ওমর (রা.)-এর এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তাদের ধারণা মতে, এতে করে সাহাবায়ে কেরাম সচ্ছলতার সাথে নিশ্চিন্ত মনে নিজেদের ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত রাখতে সক্ষম হবেন।

হযরত হাকীম (রা.)-এর পালা আসলে তিনি নিবেদন করলেন, আমীরুল মোমেনীন! আপনি কখনো এমনটা করতে যাবেন না। এতে কোরায়শের ধ্বংস আর বিনষ্টের উপকরণ নিহিত রয়েছে। কেননা, কোরায়শরা হচ্ছে পেশায় ব্যবসায়ী। আপনি যদি তাদের জন্যে মাসিক ভাতা নির্ধারণ করে দেন, তা হলে তারা ব্যবসায় ছেড়ে বসবে। অতপর আপনার পরবর্তী খলীফারা যদি নির্ধারিত ভাতা বন্ধ করে দেন, তা হলে কোরায়শরা মসিবতে নিপতিত হবে। তখন না তারা রাষ্ট্রীয় ভাতা পাবে আর না তাদের ব্যবসায় থাকবে। *(তারীখে ইবনে আসাকের, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২১)*

মানুষের নিজের হাতে অর্জিত কর্মফল

কোরআন করীমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, 'জঙ্গলে ও লোকালয়ে ফাসাদ প্রকাশ পাচ্ছে সেসব গোনাহের দরুন, যা মানুষের হাতসমূহ করছে।'

(সূরা আর রোম, আয়াত ৪১)

হযরত আলী (রা.)-এর শাগরেদ হযরত ইবনে খায়রা (র.) বলেন–

গোনাহের শাস্তির কারণে মানুষের এবাদতে অলসতা অমনোযোগিতা সৃষ্টি হতে থাকে, জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, স্বাদ আস্বাদনে সংকোচন সৃষ্টি হয়। লোকজন

www.nagorikpathagar.org

বললেন, স্বাদ আস্বাদনে সংকোচনের অর্থ কি? তিনি বললেন, যখন কোনো হালাল স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ আসে, তখন এমন কোনো কারণ এসে আপতিত হয়, যা হালাল স্বাদ তিক্ত করে দেয়।

আজকাল মুসলমান জীবিকার সচ্ছলতা, মানসিক শান্তি স্বস্তির অন্বেষায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য শিরে বহন করে ফিরছে।

এ অবস্থার কারণ হচ্ছে, আজকাল মুসলমানরা ডাক্তার এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের নির্দেশক্রমে নিজেদের রোগ নিরাময় করতে চায়। তাদেরই পদাংক অনুসরণে ঈপ্সিত উদ্দেশ্য অর্জনের চিন্তায় চিন্তান্বিত থাকে। তবে একথাও মনে রাখা দরকার। কবির ভাষায়–

'হে পথিক! যে পথ তুমি ধরেছো সে পথে তুমি কখনো কাবায় উপনীত হতে পারবে না। তোমার অনুসৃত পথ তো তুর্কিস্তান অভিমুখেই ধাবিত হচ্ছে।'

মুসলমানদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, তাদের সচ্ছলতা এবং তাদের রোগমুক্তির গ্রন্থ একমাত্র তাই, যা তাদের মহান চিকিৎসক রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন। তাঁর আনীত গ্রন্থই তাদের রোগের নির্ভুল কারণসমূহ নির্দেশ করে এবং তাঁর ব্যবস্থাপত্রই তাদের রোগ নিরাময় করতে পারে। মুসলমানরা একমাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নির্দেশিত ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমেই দুনিয়াতে নিশ্চিন্ত শান্তি স্বস্তির জীবন যাপন করতে পারে।

প্রত্যেক ব্যক্তির গঠন প্রকৃতি ও মেযাজ যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি প্রত্যেকের রোগের কারণ এবং প্রতিবিধান ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একইভাবে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সামগ্রিক মেযাজ প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীর রোগের কারণ এবং প্রতিবিধান ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। যদি ইংরেজ জাতি আল্লাহর সত্তা এবং তাঁর বিধানের প্রতি বিমুখ ও তার প্রতি অমনোযোগী হয়ে, আত্মপূজা ও ধোকা প্রতারণার মাধ্যমে জাগতিক উন্নতির সর্বোচ্চস্তরে উপনীত হতে সক্ষম হয়, হিন্দু জাতি যদি মূর্তিপূজা এবং সুদখোরীতে নিমজ্জিত থেকে সুখ শান্তি ও সচ্ছলতার জীবন যাপন করতে পারে, তা হলে এটা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে না যে, ইংরেজ ও হিন্দু জাতির কর্মপন্থা অবলম্বনে মুসলমানরাও একই পদ্ধতিতে জাগতিক জীবনে শান্তি স্বস্তি ও উন্নতিলাভে সক্ষম হবে। মুসলমানদের ইহাজাগতিক শান্তি স্বস্তি, সম্মান মর্যাদা এবং উন্নতি মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্যের মাঝেই নিহিত রেখেছেন। পাপাচার মুসলমানদের জাতীয় মেযাজ প্রকৃতির জন্য জীবনসংহারী হলাহলতুল্য। শুধু আল্লাহর বিধানের আনুগত্য এবং তাঁর এবাদতই মুসলমানদের সর্বরোগের দাওয়াই।

যদি মুসলমানরা রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাতলানো রোগ নিরাময় ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করে এবং এ ব্যবস্থাপত্রে বর্ণিত বিষয়সমূহ থেকে আত্মরক্ষা করে চলে, তবে তারা দেখতে পাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় দুনিয়া তাদের গোলামে পরিণত হয়েছে এবং আরাম, শান্তি স্বস্তি ও সম্মান মর্যাদা তাদের মালিকানাধীন এক ধরনের জায়গীরদারীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

খলীফা মনসুরের দরবারে এক কয়েদী

উমাইয়া শাসন অবসানের পর আব্বাসী শাসক মনসুর আব্বাসীর আমলে একবার জনৈক ব্যক্তি তাকে এসে সংবাদ দিলো, অমুক ব্যক্তির কাছে বনী উমাইয়ার বিপুল মালসম্পদ ও ধনভাণ্ডার রয়েছে, যা তার কাছে বনী উমাইয়ারা আমানত রেখেছিলো।

এ সংবাদ পেয়ে মনসুর আব্বাসী লোকটিকে দরবারে হাযির করার নির্দেশ দিলেন। অবিলম্বে তাকে বন্দী করে দরবারে হাযির করা হয়।

মনসুর বন্দীকে বললো, আমি শুনেছি, তোমার কাছে বনী উমাইয়ার অনেক ধনসম্পদ ও ধনভাণ্ডার আমানত রয়েছে, সেসব এখানে উপস্থিত করো। বাদীর বিস্ময়কর সাহস এবং নির্ভীকতা ছিলো দেখার মতো। সে নিতান্ত শান্ত সৌম্যভাবে মনসুরের নির্দেশের জবাব প্রদান করে। উভয়ের মধ্যকার কথোপকথন নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

বন্দী . আমীরুল মোমেনীন! আপনি কি বনী উমাইয়ার কোনো ওয়ারিস ?

মনসুর . না।

বন্দী . যদি আপনি বনী উমাইয়ার ওয়ারিস বা ওছি (যার নামে অসিয়ত করা হয়) কোনোটাই না হন, তা হলে তাদের ধন-সম্পদ, ধনভান্ডার দাবী করার আপনার কি অধিকার রয়েছে?

মনসুর . (কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রেখে চিন্তা করার পর–) দেখো, বনী উমাইয়া মুসলমানদের ওপর যুলুম করেছে, অবৈধ পন্থায় মুসলমানদের ধনসম্পদ করায়ত্ত করেছে। বর্তমানে আমি মুসলমানদের অভিভাবক ও প্রতিনিধি। আমার বাসনা, বনী উমাইয়ার অবৈধ পন্থায় আহরিত ধন-সম্পদ তাদের কাছ থেকে নিয়ে সরকারী কোষাগারে জমা করবো।

বন্দী . আমীরুল মোমেনীন! আপনার এ ঘোষণা গ্রহণযোগ্য নয় যতোক্ষণ না আপনি এ ব্যাপারে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন না করবেন। আপনাকে শরীয়তসম্মতভাবে প্রমাণ দিতে হবে, আমার কাছে বনী উমাইয়ার যে মাল সম্পদ ধনভান্ডার রয়েছে তা তাদের সে সম্পদ, যা তারা যুলুম অত্যাচার করে অবৈধ পন্থায় করায়ত্ত করেছে। কেননা, এতে কোনো সন্দেহ নেই, বনী উমাইয়াদের নিজেদের মালিকানাধীন কিছু ধন-ভান্ডারও ছিলো, যা যুলুম অত্যাচার করে করায়ত্ত করা হয়নি

মনসুর . (কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে রেখে চিন্তা ভাবনার পর উযির রবীকে সম্বোধন করে) হে রবী! এ ব্যক্তি কথা তো ঠিকই বলছে। নিসন্দেহে তার ওপর আমাদের কোনো অধিকার নেই। (এরপর সহাস্যে ও প্রশান্ত বদনে বন্দীর প্রতি নিবিষ্ট হয়ে বললো–) তোমার কি আমার কাছে কোনো প্রয়োজন আছে ?

বন্দী . হাঁ, আমার একটা প্রয়োজন আছে। আপনি অনতিবিলম্বে দূত মারফত আমার একটি চিঠি আমার পরিবারের কাছে পৌছে দিন, তা হলে তারা আমার সুস্থতা ও নিরাপত্তার কথা জানতে পেরে নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হবে। কেননা, আমার আপনার

www.nagorikpathagar.org

এখানে উপস্থিতি পরিবারের লোকদের কঠোর পেরেশানীতে নিপতিত করেছে। আমার দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, আপনি সে লোককে আমার সম্মুখে ডেকে আনুন যে আমার সম্পর্কে আপনার কাছে চোগলখোরী করেছে। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার কাছে বনী উমাইয়ার কোনো ধনসম্পদ ধনভান্ডার নেই, কিন্তু যখন আমাকে আপনার সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তখন আমি সে জবাবই দিয়েছি যাকে আমি ত্বরিত মুক্তি পাবার উপযোগী বলে বুঝেছি।

মনসুর . (উযির রবীকে সম্বোধন করে–) সে লোককে ডেকে পাঠাও যে এ সংবাদ সরবরাহ করেছে। উযির অবিলম্বে নির্দেশ পালন করে এবং সংবাদদাতাকে দরবারে হাযির করা হয়।

বন্দী . (সংবাদদাতাকে দেখেই–) আমীরুল মোমেনীন! এ তো হচ্ছে আমার গোলাম। এ আমার তিন হাজার দীনার নিয়ে পালিয়েছে।

মনসুর . (ক্রোধভরে গোলামের উদ্দেশে–) সত্য করে বলো, ব্যাপার কি ?

গোলাম . (নিরুপায় হয়ে–) জাহাঁপনা, ব্যাপার তাই যা তিনি (বন্দী) বলেছেন। প্রকৃতই আমি তার গোলাম এবং তার কথিত অংকের দীনার নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

মনসুর . (প্রথমে বন্দীকে উদ্দেশ করে–) এ গোলামকে মাফ করে দিতে আমি আপনাকে সুপারিশ করছি।

বন্দী . আমীরুল মোমেনীন! আমি তার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি এবং আমার যে সম্পদ নিয়ে সে পালিয়েছে তাও মাফ করে দিয়েছি। উপরন্তু নিজ থেকে আরও তিন হাজার দীনার আমি তাকে দিচ্ছি।

মনসুর . (বিস্ময়ভরে–) এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে!

এ ঘটনার পর মনসুর সর্বদাই এ ব্যক্তির ধৈর্য সহনশীলতা এবং তার ক্ষমা ও দানশীলতার ওপর বিস্ময় প্রকাশ করে বলতেন, এটা সত্যিই ক্ষমা ও দানশীলতার এক আজব উদাহরণ। *(সামারাতুল আওরাক লিল হুমুবী আলা হামেশিল মোস্তাতরাফ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৪)*

হযরত সুফিয়ান সওরী (র.)–এর একটি উপদেশ

হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না (র.) বলেন, হযরত সুফিয়ান সওরী (র.)-এর মৃত্যুর পর আমি তাকে একদিন স্বপ্নে দেখি। তখন আমি তার কাছে আবেদন জানালাম, আমাকে কোনো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, মানুষের সাথে জানাশোনা পরিচয় একটু কম করবে। *(কিতাবুর রূহ– আল্লামা ইবনে কাইয়েম)*

জীবিকা আহরণের মহাফযীলত

হাফেয আবু নোয়াইম (র.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, এমন বহু গোনাহ আছে, নামায, হজ্জ, ওমরা কোনোটা দ্বারাই সে গোনাহর কাফফারা হয় না। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, সেসব গোনাহের কাফফারা তাহলে কিসের

www.nagorikpathagar.org

দ্বারা হয়? তিনি এরশাদ করলেন, জীবিকা আহরণে যে দুখ কষ্ট হয়, তা দ্বারাই কেবল সেসব অজ্ঞাত গোনাহসমূহের কাফফারা হয়।

(মোখতাসার তাযকেরায়ে কুরতুবী, পৃষ্ঠা-৪২)

হযরত হাতেম আসাম্মের তেত্রিশ বছরে আটটি মাসয়ালা শেখা

একদিন হযরত শাকীক বলখী (র.) তার ছাত্র হাতেম আসাম্ম (র.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কতো বছর ধরে আমার সাহচর্যে রয়েছো? তিনি বললেন, তেত্রিশ বছর। হযরত শাকীক বলখী (র.) জিজ্ঞেস করলেন, এ দীর্ঘ সময়ে তুমি আমার কাছ থেকে কি শিখেছো?

হাতেম আসাম্ম (র.) বললেন, আপনার সাহচর্যে তেত্রিশ বছর পর্যন্ত অবস্থান করে আমি আটটি মাসয়ালা শিক্ষা করেছি। তার উত্তরে শকীক বলখী (র.) বললেন, ইন্না লিল্লাহ ... তোমাকে নিয়ে আমার সময়ই নষ্ট হলো শুধু। এ দীর্ঘ সময়ে তুমি শুধু আটটি মাসয়ালা শিক্ষা করেছো। হাতেম বললেন, মাননীয় ওস্তাদ, আমি আটটি মাসয়ালার বেশী শিখিনি। আর মিথ্যা বলা আমি অপছন্দ করি। এবার শকীক বলখী (র.) বললেন, ঠিক আছে, তুমি এ দীর্ঘ সময়ে যে আটটি মাসয়ালা শিখেছো তার বর্ণনা দাও তো, আমি শুনি। হযরত আসাম্ম (র.) নিম্নরূপে তাঁর শেখা আটটি মাসয়ালার বর্ণনা দেন।

মাসয়ালা : ১. আমি মানুষকে দেখে অনুধাবন করেছি, প্রত্যেক মানুষেরই পছন্দনীয় একটা কিছু থাকে, যা কবর পর্যন্তই তার সাথে থাকে। যখন সে কবরে যায়, তখন পছন্দনীয় বস্তু তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। তাই আমি পুণ্য কর্মকেই আমার পছন্দনীয় সাব্যস্ত করেছি। যখন আমি কবরে যাবো তখন আমার প্রিয় পছন্দনীয় বস্তুও আমার সাথে থাকবে।

হযরত শকীক বলখী (র.) বললেন, তুমি অত্যন্ত উত্তম মাসয়ালা শিখেছো। এবার অবশিষ্ট সাতটির বর্ণনা দাও।

মাসয়ালা : ২. যে ব্যক্তি নিজের রবের সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং স্বীয় আত্মাকে কামনা বাসনা থেকে নিবৃত্ত রেখেছে– আমি এ আয়াত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে আমি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছি, আল্লাহর কথাটাই সঠিক। তাই প্রবৃত্তির কামনা বাসনা দূর করার জন্যে আত্মার ওপর কিছু পরিশ্রম চাপিয়েছি। অবশেষে তা আল্লাহর আনুগত্যে স্থির হয়ে গেছে।

মাসয়ালা : ৩. আমি এ দুনিয়াকে নিরীক্ষণ করেছি। এতে দেখতে পেলাম, কারো মূল্যবান কোনো বস্তু সামগ্রী থাকলে সে তা উঠিয়ে রাখে এবং যথাযথ সংরক্ষণ করে। অতপর যখন দেখলাম, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করছেন–

'তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা সবই নি:শেষ হয়ে যাবে এবং যা আল্লাহর কাছে রয়েছে তাই অবশিষ্ট থাকবে।' *(সূরা নাহল, আয়াত ৯৬)*

সুতরাং মূল্যবান যা কিছু আমি লাভ করেছি, তা সবই আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি, যাতে তা তাঁর কাছে বর্তমান থাকে।

www.nagorikpathagar.org

মাসয়ালা : ৪. আমি মানুষজনকে দেখেছি, সবারই ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বংশীয় আভিজাত্য এবং মর্যাদার প্রতি ঝোঁকপ্রবণতা ও মানসিক আকর্ষণ রয়েছে। আমি এসব বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সব কিছুকেই নিরর্থক মূল্যহীন বলে হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতপর আল্লাহর ঘোষণা সম্পর্কে চিন্তা করেছি। তিনি ঘোষণা করেন–

'তোমাদের মাঝে সে-ই সবচাইতে বেশী সম্মানিত, যে সবচাইতে বেশী আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে।' (সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৩)

তাই আমি তাকওয়া অবলম্বন করেছি, যাতে আল্লাহর কাছে আমি সম্মানিত হতে পারি।

মাসয়ালা : ৫. আমি মানুষকে দেখেছি, তারা একে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে, একে অন্যকে মন্দ বলে। এর একমাত্র কারণ হলো হিংসা-বিদ্বেষ। বলা হয়, কোনো মানুষই হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত নয়। অতপর আমি আল্লাহর নিম্নোক্ত ঘোষণা বাণী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করেছি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

'আমি মানুষের মাঝে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি।'

তাই আমি হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করে মানুষজন থেকে পৃথক হয়ে গেছি। আমি জেনেছি, মানুষের জীবিকা বন্টনের কাজটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। অতএব, আমি মানুষের প্রতি শত্রুতা পরিহার করেছি।

মাসয়ালা : ৬. আমি মানুষকে দেখেছি, তারা একে অন্যের বিদ্রোহ করে, পরস্পরের রক্ত ঝরায়, খুনখারাবী করে। এ বিষয়ে আমি যখন আল্লাহর ঘোষণার প্রতি প্রত্যাবর্তন করি তখন আমি দেখতে পাই, আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করছেন–

'নি:সন্দেহে শয়তান তোমাদের দুশমন, অতএব তোমরা তাকে দুশমন হিসাবেই গ্রহণ করো। শয়তান নিজের দলবলকে আহ্বান জানায় যেন তারা জাহান্নামী হয়ে যায়।'

এ আয়াতের আলোকে আমি শয়তানকেই আমার একমাত্র শত্রু সাব্যস্ত করেছি। আমি তার থেকে আত্মরক্ষা করে চলি। শয়তানকে একমাত্র শত্রু সাব্যস্ত করে অবশিষ্ট সকলের শত্রুতা আমি পরিত্যাগ করেছি।

মাসয়ালা : ৭. প্রত্যেক মানুষকেই আমি পেয়েছি, তারা এক টুকরা রুটির প্রত্যাশী। এর জন্যেই তারা নিজের আত্মাকে কলুষিত অপদস্থ করে। এক টুকরা রুটির প্রত্যাশায় তারা এমন সব কাজে প্রবৃত্ত হয় যা তাদের জন্যে বৈধ নয়। এ বিষয়ে আমি আল্লাহর বাণী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। তিনি এরশাদ করেন–

'এমন কোনো প্রাণী নেই, যার জীবিকা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত নয়।'

অতএব, আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি, আমিও আল্লাহর তায়ালার সেসব প্রাণীর শামিল, যার জীবিকার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। তাই আমি জীবিকান্বেষণের চিন্তা পরিহার করে আল্লাহর হকসমূহ আদায়ে নিমগ্ন হয়েছি।

www.nagorikpathagar.org

মাসয়ালা : ৮. আমি প্রত্যেক মানুষকেই কোনো না কোনো বস্তুর ওপর নির্ভরশীল পেয়েছি। কেউ জমিজমার ওপর, কেউ ব্যবসায়ের ওপর, কেউ শিল্প নৈপুণ্যের ওপর, কেউ শারীরিক সুস্থতার ওপর নির্ভরশীল। অতপর দেখতে পেলাম, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

'যে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহই তার জন্যে যথেষ্ট।'

অতএব, আমি এক আল্লাহর ওপর নির্ভর করি, তিনিই আমার জন্যে যথেষ্ট।

হযরত হাতেম আসাম্ম (র.)-এর এ বর্ণনার পর হযরত শাকীক বলখী (র.) বলেন, হাতেম! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তাওফীক দিয়েছেন। আমি যখন কোরআন, তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জীলের শিক্ষার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তখন সে সবের সারমর্ম তোমার বর্ণিত আটটি মাস্য়ালায় দেখতে পাই। কোরআন, তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জীলের সব এলেমই তোমার আটটি মাসয়ালায় নিহিত রয়েছে।

বাস্তবে এটাই হচ্ছে এলেম, যা আম্বিয়ায়ে কেরামের যথার্থ উত্তরাধিকার এবং দুনিয়া আখেরাতে সাফল্যের নির্যাস। আজকাল আমরা যে বিষয়ের নাম এলেম (জ্ঞান) রেখেছি, তা এ মহাজন বাক্যের উদাহরণের মতো– 'এলেম যদি দেহের উপরিভাগে শোভা পায় তাহলে তা হবে আগুন।'

মৃত্যুর পর হযরত খলীল আহমদ (র.)-এর উক্তি

হযরত খলীল আহমদ (র.)-এর মৃত্যুর পর একদিন হযরত বসীর হেমসী (র.) তাঁকে স্বপ্নে দেখে বললেন, বর্তমানে আমরা অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় পড়েছি, কঠিন এলমী বিষয়সমূহের সমাধান কার কাছে করবো! বর্তমানে আপনার মতো কোনো আলেম পাওয়া যায় না। বসীর হেমসী (র.)-এর কথার উত্তরে হযরত খলীল আহমদ (র.) বললেন, আরে ভাই! কঠিন এলমী বিষয়সমূহ তো তোমরাই সমাধান করবে। আমি যেসব এলমী বিষয়ের অনুসন্ধান ও সমাধানের ধারক হওয়ার কারণে গর্বিত ছিলাম, সেসবের পরিণতি কি হয়েছে তা তো আগে জানবে। অতপর বললেন–

'সুবহানাল্লাহে ওয়াল হামদু লিল্লাহে ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।' বাক্যটাই শুধু আমার কাজে এসেছে।

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, সব প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি বড়ো মহান। সমুচ্চ মহান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কাজের কোনো শক্তি নেই।

অনুসন্ধান ও সমাধান সম্বলিত অবশিষ্ট এলমী বিষয়সমূহ সম্পর্কে আমাকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদই করা হয়নি।

বীরত্বের এক বিস্ময়কর উদাহরণ

ইবনে আরাবী বলেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনামলে হানীফা গোত্রে জাহদার বিন মালেক নামক এক বড়ো ডাকাত ছিলো। সে শত শত খুন খারাবী করেছে। সে

www.nagorikpathagar.org

একবার হেজরবাসীর এলাকায় ডাকাতি করে। এ ডাকাতির বিষয় অবহিত হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইয়ামামা অঞ্চলের স্থানীয় শাসনকর্তাকে খুব ধমক দিয়ে চিঠি লিখলেন–

এখনো হেজরবাসীর এলাকায় ডাকাতির ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হলো না কেন? অবিলম্বে জাহদারকে গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

হাজ্জাজের ক্রোধ, কঠোরতা এবং স্বৈরাচারী শাসনকার্যের কারণে ভয়ে মানুষ এমনিতেই থরথর করে কাঁপতো। হাজ্জাজের পত্রে ইয়ামামার শাসক নিজের মৃত্যুই দেখতে পেলেন। তিনি ইয়ারবূ ও হানযালা গোত্রের চতুর বাহাদুর লোকদের ডেকে তাদের জন্যে বিরাট পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে বললেন, তারা যেনো জাহদারকে হত্যা অথবা গ্রেপ্তার করে আনে। ইয়ারবূ ও হানযালা গোত্রের লোকেরা জাহদারের খোজে বের হয়। তারা জাহদারের বাসস্থানের নিকটবর্তী হয়ে নিজেদের এক লোক মারফত এই বলে খবর পাঠালো, আমরাও তোমার দলে শরীক হয়ে থাকতে চাই। এ প্রস্তাবে আশ্বস্ত হয়ে জাহদার তাদের সেখানে অবস্থানের অনুমতি দেয়। এভাবেই তারা জাহদারের সঙ্গে থাকতে শুরু করে। একদিন সুযোগ পেয়ে তারা জাহদারকে বেঁধে ইয়ামামার শাসনকর্তার কাছে খবর পাঠিয়ে দেয়। তিনি লোকজনসহ জাহদারকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং এসব লোকের প্রশংসনীয় কর্ম সম্পর্কেও পত্র মারফত হাজ্জাজকে অবহিত করেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সামনে জাহদারকে উপস্থিত করা হয়। সে জানতো, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রক্তলোলুপ মানুষ। সে এক লাখ বিশ হাজার লোককে বেঁধে হত্যা করেছে। *(জামে তিরমিযী)*

অথচ জাহদারের সাহসিকতা নির্ভীকতা দেখুন। তাকে হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলো, কি বিষয় তোমাকে এরকম ডাকাতি রাহাজানিতে উৎসাহিত করেছে? সে বলল, তিনটি বিষয় আমাকে এরকম ডাকাতি রাহাজানিতে উৎসাহিত করেছে– (১) আমার বীরত্ব ও সাহস, (২) শাসকের যুলুম অত্যাচার, (৩) কালের বিবর্তনজনিত দুর্যোগ।

এবার হাজ্জাজ জাহদারকে বললেন, তোমার কাছ থেকে এমন কি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যাতে তোমার সাহস বীরত্ব বর্ধিত হয়েছে, শাসক তোমার ওপর যুলুম করেছে এবং কালের বিবর্তনে দুর্যোগ তোমার ওপর ভেঙ্গে পড়েছে। জাহদার বলল, হে শাসক! যদি আপনি আমাকে পরীক্ষা করেন তবে নিজের প্রজাকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বীর এবং কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পাবেন। কেননা, যখনই কারো সাথে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে, তখনই আমি নিজেকে প্রতিপক্ষের ওপর বিজয়ী পেয়েছি।

হাজ্জাজ বললো, ঠিক আছে, আমি তোমাকে পরীক্ষা করছি, আর তোমার পরীক্ষা হলো, তোমাকে এক ময়দানে ছেড়ে দিচ্ছি, যে ময়দানে একটি সিংহ থাকবে। যদি সিংহ তোমাকে হত্যা করে তবে আমি তোমাকে হত্যার ধান্ধা ফাসাদ থেকে মুক্তি পাবো। আর যদি তুমি সিংহটিকে হত্যা করতে সক্ষম হও, তবে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেবো। জাহদার অত্যন্ত সানন্দে হাজ্জাজের এ প্রস্তাব গ্রহণ করে বললো, এটাই তো আমার প্রকৃত মনোবাসনা। আপনি অতি সত্বর এর ব্যবস্থা করুন।

www.nagorikpathagar.org

জাহদারের কথায় হাজ্জাজ বললো, শুধু এটাই নয় যে, তোমাকে সিংহের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছেড়ে দেয়া হবে; বরং এ সময়কার অবস্থা হবে, তোমার পায়ে ভারী শৃংখল থাকবে এবং তোমার ডান হাত ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে দেয়া হবে। শুধু বাম হাতই মুক্ত থাকবে এবং মুক্ত বাম হাতে তোমাকে একখানা তরবারি দেয়া হবে। জাহদার হাজ্জাজের এ শর্তও মেনে নেয়। সিংহের ব্যবস্থা হওয়া পর্যন্ত হাজ্জাজ ডাকাত জাহদারকে জেলখানায় বন্দী রাখে। সে অধীনস্থ কর্মচারীদের যে কোনোখান থেকে একটি হিংস্র সিংহের ব্যবস্থা করার নির্দেশ প্রদান করে। নির্দেশ পাওয়ামাত্রই অধীনস্থ কর্মচারীরা অবিলম্বে সিংহের ব্যবস্থা করে দেয়।

সিংহ এসে গেলে সেটিকে চতুর্দিক ঘেরাও করা একটি ময়দানে ছেড়ে দেয়া হয়। এর তিন দিন আগে থেকে জাহদারকে অভুক্ত রাখা হয়। অতপর তার পদদ্বয়ে ভারী শৃংখল পরিয়ে, ডান হাত ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে মুক্ত বাম হাতে একখানা তরবারি দিয়ে সিংহের সম্মুখে ছেড়ে দেয়া হয়। জাহদার সিংহ দর্শনে বীরত্ব প্রকাশসূচক সঙ্গীত আবৃত্তি করতে থাকে।

জাহদারকে দেখেই সিংহটি অত্যন্ত জোরে ভীতিজনক আওয়ায করে এবং শরীরের আড়মোড়া ভেঙ্গে জাহদারের দিকে অগ্রসর হয়। সিংহটি জাহদারের একেবারে কাছাকাছি হয়ে যখন মাত্র এক নেজার ব্যবধানে উপনীত হয়, তখন জাহদার অতি সজোরে সিংহের ওপর আঘাত হানে। এক আঘাতেই সিংহটি খতম হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। এদিকে পায়ে ভারী শৃংখল থাকায় জাহদার পিছন দিকে পড়ে যায়।

হাজ্জাজ এবং তার পাত্রমিত্র সভাসদরা একটি মঞ্চে উপবিষ্ট থেকে এ তামাশা উপভোগ করছিলো। তারা সবাই সমস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি করে উঠে। ওদিকে জাহদার পতিত অবস্থা থেকে ওঠে কোনো প্রকার চিন্তা ভাবনা ব্যতীতই হাজ্জাজকে সম্বোধন করে তিন পংক্তি কবিতা আবৃত্তি করে। কবিতার পংক্তিত্রয়ের অর্থ হচ্ছে–

'হে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ! যদি আপনি আমার মৃত্যু কামনা করে থাকেন, তা হলে আমি আপনার পুরস্কারের আশাবাদী।

মেয়েলোকেরা তো ধারণা করছিলো আমি আর ফিরে আসবো না, কেননা তারা স্বামীদের আত্মমর্যাদাবোধের প্রতি আস্থাহীন।

আর আমি বুঝেছি, যদি সিংহের মোকাবেলা এড়িয়ে যাই, তা হলে হাজ্জাজের কবল থেকে মুক্তি পাবো না।'

জাহদার সিংহটিকে বধ করার পর হাজ্জাজ বললো, তুমি চাইলে তোমাকে বিরাট পুরস্কার দেবো, আর চাইলে তোমাকে মুক্তি দেবো। জাহদার বললো, মুক্তি বা পুরস্কার কোনোটাই নয়, আমি আমীরের (হাজ্জাজ) সাহচর্যে থাকতে চাই। সুতরাং হাজ্জাজ জাহদার এবং তার পরিবারবর্গের জন্যে অনেক বড়ো ধরনের ভাতা নির্ধারণ করে দেয়।

(তারীখে ইবনে আসাকের, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩, ৪৪)

হযরত আবু বকর তামেস্তানী (র.)-এর উক্তি

হযরত আবু বকর তামেস্তানী (র.) বলেন, তাসাওউফের পথ উন্মুক্ত এবং কিতাব (কোরআন) ও সুন্নাহ আমাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। আর সর্বাগ্রে হিজরত এবং

www.nagorikpathagar.org

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহচর্যের কারণে সাহাবায়ে কেরামের ফযীলত মর্যাদাও সবার জানা বিষয়। অতএব এখন আমাদের মধ্য থেকে যে কিতাব ও সুন্নাহ অবলম্বন করে স্বীয় প্রবৃত্তি এবং সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক হয়ে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি হিজরত করে, শুধু এমন লোকই সত্যবাদী ও সত্যে উপনীত হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র.) সম্পর্কে হাফেযে হাদীস ও ইমামদের কয়েকটি অভিমত

মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণকারী ও লালিত পালিত কোনো মানুষই ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর বিদ্যাবত্তা, সম্মান মর্যাদা সম্পর্কে সম্ভবত অনবহিত নয়। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর বিদ্যাবত্তা, সংসারবিরাগ, তাকওয়া, দ্বীনের মর্মজ্ঞান এবং ইমাম পদের মর্যাদা তারাও অস্বীকার করতে পারেনি যারা তাকে ভর্ৎসনা করা ও তার ওপর অমূলক অভিযোগ আরোপকে নিজেদের পেশা বানিয়ে নিয়েছে, কিন্তু অনেক পড়ালেখা জানা লোক– অবশ্য এলমী যোগ্যতা এবং বোধশক্তি কম, তারা মনে করে বসে আছে, হাদীস শাস্ত্রে অন্যান্য ইমামরা যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী, ইমাম আবু হানীফা (র.) তেমন বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। হাদীসশাস্ত্র বিশারদ হবার দাবীদার অনেকেই হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সমালোচনা এবং তার ওপর অমূলক অভিযোগ আরোপের উদ্দেশে প্রস্তুত হয়ে বসে থাকেন। তারা মনে করেন, হাদীসশাস্ত্র ও রেওয়ায়াত বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মর্যাদাহানি করার পথেই তারা নিজেদের অভীষ্টলাভে সমর্থ হবেন। *(ইদানীং এমন কিছু নব্য আলেম ও গবেষক আমাদের এই বাংলাদেশেও রয়েছেন যারা ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে নেহায়াত বাজে মন্তব্য করেন, আল্লাহ তায়ালা এদের মানসিক হীনমন্যতা থেকে রক্ষা করুন।)*

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় না সম্মানিত ইমামের জীবনচরিত বর্ণনা সম্ভব, আর না সেসব উক্তি, উদ্ধৃতি ও প্রমাণসমূহ একত্র করা সম্ভব যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত রয়েছে। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য মালেকী মাযহাব অনুসারী আলেম, হযরত ইমাম মালেক (র.) সংকলিত হাদীস গ্রন্থ মোয়াত্তা ইমাম মালেকের ব্যাখ্যাতা, হাদীসশাস্ত্রের ইমাম, আবু আমর ইবনে আবদুল বার-এর সে নিবন্ধটি উপস্থাপন করা যা তিনি এ বিষয় সম্পর্কে তার নিজের গ্রন্থে লিখেছেন। হযরত ইমাম ইবনে আবদুল বার (র.) তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর সেসব আলেমদের একজন, যাদের স্পেন ও কর্ডোভায় এলেমের ভিত্তি মনে করা হয়। তিনি ৩৬৮ হিজরী সনে কর্ডোভায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই বিভিন্ন বিষয়ের এলেম অর্জন করেন। এলেম অর্জন শেষে তিনি স্পেনের বিভিন্ন শহরে কাযী (বিচারক) ছিলেন। হাদীস, ফেকাহ ও ইতিহাস বিষয়ে তার রচিত অসংখ্য গ্রন্থ স্ব স্ব বিষয়ের প্রাণ বলে মনে করা হয়। তিনি হানাফী মাযহাবের নয়; বরং ছিলেন মালেকী মাযহাবের অনুসারী। এ কারণে ইমাম আবু হানীফা (র.) সম্পর্কে তার অভিমত আরও বেশী গ্রহণযোগ্য। নীচে ইমাম আবু হানীফা (র.) সম্পর্কে হযরত ইমাম ইবনে আবদুল বার (র.)-এর আলোচনার অনুবাদ পেশ করা হচ্ছে–

www.nagorikpathagar.org

ইমাম আবু আমর ইবনে আবদুল বার (র.) বলেন, কোনো কোনো আহলে হাদীস ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সমালোচনায় খুব বেশী বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিয়ে সীমাতিক্রম করে থাকেন। এর কারণ হিসেবে তারা বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.) হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের উক্তির ওপর নিজের ব্যক্তিগত মত ও অনুমানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অধিকাংশ আহলে হাদীসের অভিমত হচ্ছে, কোনো হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হলে ব্যক্তির মত ও অনুমান বাতিল হওয়ার কথা। অথচ ইমাম আবু হানীফা (র.) যেসব হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের উক্তি পরিত্যাগ করেছেন, তা এমন কোনো সদর্থের কারণে করেছেন, যার অবকাশ সেসব হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের উক্তিতে ছিলো না ইমাম ইবনে আবদুল বার বলেন, এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা একা নন। তার পূর্ববর্তী ইমামরাও এরূপ পন্থা অবলম্বন করেছেন। পরবর্তী যুগে সত্যপন্থী ওলামায়ে কেরামও এ পন্থা অবলম্বন করেছেন।

সারকথা, তিনি যে হাদীসে ব্যক্তিগত মত ও অনুমানের প্রয়োগ করেছেন তা তার নিজ শহরের হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের ইমামদের অনুসরণেই করেছেন। তাদের একজন হলেন সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর শাগরেদ হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.)। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর উদ্ভাবিত ফেকহী মাসয়ালাসমূহে ব্যক্তিগত মত ও অনুমানের প্রয়োগ বেশী ঘটেছে। তিনি ও তাঁর শিষ্যরা স্বমতে ফেকাহ শাস্ত্রের অনেক মাসয়ালা সাব্যস্ত করে সেগুলোর সমাধান লিপিবদ্ধ করেছেন। এক্ষেত্রে যেসব শাখা মাসয়ালায় কোরআন হাদীসের স্পষ্ট সমাধান পাননি, সেগুলোর সমাধানে ব্যক্তিগত মত ও অনুমান প্রয়োগ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পূর্ববর্তী সম্মানিত ইমামরা যেহেতু ফেকাহ শাস্ত্রে স্বমতে সাব্যস্ত করা মাসয়ালা উদ্ভাবন ও তার সমাধান উপস্থাপনে কোনো কাজ করেননি, তাই তার বিরোধীরা এ কর্মধারাকে বেদয়াত বলে অভিহিত করে তার প্রবল বিরোধিতার দেয়াল দাঁড় করায়।

ইমাম আবু হানীফা (র.) ফেকাহ শাস্ত্রের কিছু কিছু শাখা মাসয়ালায় ব্যক্তিগত মত ও অনুমান প্রয়োগ করেছেন, এ ক্ষেত্রে তিনি একা নন; বরং আমি এমন কোনো আলেমকেই দেখতে পাই না, যিনি নিজের অভিমতের অনুকূলে কোরআনের কোনো আয়াত বা হাদীস গ্রহণ করে এর বিপরীত মর্মার্থ সম্বলিত আয়াত বা হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত বা হাদীসের বিধান রহিত বলে দাবী করেননি। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাযহাবে এ ধরনের বিষয় অধিক এবং অন্য ইমামদের মাযহাবে কম পরিলক্ষিত হয়।

হযরত লায়স বিন সা'দ (র.) বলেন, আমি হযরত ইমাম মালেক (র.)-এর এমন সত্তরটি মাসয়ালা নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যেগুলো হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইমাম মালেক (র.) শুধু নিজের অনুমানের ওপর নির্ভর করে সেসব মাসয়ালা বলেছেন। উপদেশ প্রদান ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষায় সেসব মাসয়ালা লিখে আমি ইমাম মালেক (র.)-এর সম্মুখে উপস্থাপন করেছি।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম ইবনে আবদুল বার (র.) বলেন, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীস সাব্যস্ত হওয়ার পর তা অস্বীকার করার কোনো অধিকার উম্মতের কোনো আলেমের নেই। যতোক্ষণ না এজমা (ঐকমত্য) এবং কর্মধারার মাধ্যমে অস্বীকৃত হাদীসটি রহিত বলে মতামত ব্যক্ত করবেন, অথবা সে হাদীস (বর্ণনাসূত্র)-এর সমালোচনা পর্যালোচনা করে তা বাদ দেবেন। যদি বর্ণিত কারণ ব্যতীত কেউ কোনো হাদীস গ্রহণে অস্বীকার করেন, তাহলে তার আদালত (মানবীয় সৌজন্য) রহিত হয়ে যাবে এবং সে ফাসেকী কর্মের গোনাহে গোনাহগার হবে। এমন ব্যক্তি কি করে উম্মতের ইমামের আসনে আসীন হতে পারে? তবে আল্লাহ তায়ালা সব ইমামকেই উল্লিখিত বিপদ থেকে সংরক্ষিত রেখেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিন্দুক সমালোচকরা তাকে তো নানা বাতিল মতবাদের সাথেও সম্পর্কিত করেছেন।

শুধু ইমাম আবু হানীফা (র.) একা নন; বরং দ্বীনের ইমামদের অনেকের ওপরই নানা রকম অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (র.) সম্পর্কে কথাবার্তা যে পরিমাণ বেশী বলা হয়েছে, অন্য কারো বেলায় তা হয়নি। এর কারণ, এ উম্মতের তিনি একজন প্রখ্যাত ইমাম। অন্যরা কেউ তার মতো এতো প্রখ্যাত নন। এতদসত্ত্বেও কিছু লোক তার নিন্দাবাদ ও সমালোচনা করে। আল্লাহ প্রদত্ত তার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কারণেও অনেকে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত। এমন অনেক বিষয় তার প্রতি সম্পর্কিত করা হয় যা তার মাঝে আসলেই নেই। তার মর্যাদার বিপরীত অনেক অপবাদও তার ওপর আরোপ করা হয়। পক্ষান্তরে সত্যপন্থী এক বিরাট দল তার প্রশংসা করেছেন এবং অন্যদের চাইতে তাকে বেশী মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে সময় দেন, তাহলে আমি ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম আওযায়ী (র.) প্রমুখের মর্যাদা সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করবো।

হযরত আব্বাস বিন মোহাম্মদ দাওরী বলেন, আমাকে হাদীসশাস্ত্রের ইমাম হযরত ইয়াহইয়া বিন মায়ীন (র.) বলেন, আমাদের সতীর্থ লোকেরা হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) ও তার শাগরেদের ব্যাপারে খুব বেশী বাড়াবাড়ি করে থাকে। জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রেওয়ায়াত (বর্ণনা) সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র.) কি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন না? এ জিজ্ঞাসার জবাবে হযরত ইয়াহইয়া বিন মায়ীন (র.) বলেন, তিনি এর চাইতেও ঊর্ধ্বতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাসলামা বিন শাবীব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-কে বলতে শুনেছি, ইমাম আওযায়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা (র.) সকলের অনুমানই অনুমান এবং এ অনুমানের প্রমাণ সাহাবায়ে কেরামের উক্তিতেই রয়েছে। হযরত ইমাম দারাওয়ারদী (র.) বলেন, ইমাম মালেক (র.) যখন কোনো মাসয়ালা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন, আমি নিজ শহরের (মদীনা) ওলামায়ে কেরামকে এ মাসয়ালায় সমমনা পেয়েছি। অথবা বলেন, আমি নিজের সমাবেশকে এ মতের সমর্থক পেয়েছি। তবে তিনি ওলামায়ে কেরাম বলতে তার সমকালীন আলেম এবং সমাবেশ বলতে রবিয়া বিন আবু আবদুর রহমান ও ইবনে হরমুয (র.)-কেই উদ্দেশ করে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

হাফেযে হাদীস হযরত মোহাম্মদ বিন হাসান এযদী মোসেলী (র.) স্বরচিত গ্রন্থ 'কিতাবুয যোয়াফা'র শেষের দিকে বলেন, হযরত ইয়াহইয়া বিন মায়ীন বলেছেন, আমি এমন কোনো আলেম দেখিনি যাকে ইমাম ওয়াকীর ওপর প্রাধান্য ও বেশী মর্যাদা দিতে পারি। এতদসত্ত্বেও তিনি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত অবলম্বনেই ফতোয়া দিতেন। সব হাদীসই তার কণ্ঠস্থ ছিলো। তিনি নিজেও ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বহু হাদীস শুনেছেন। হাফেয এযদী মোসেলী (র.) বলেন, হযরত ওয়াকী (র.) সম্পর্কে হযরত ইয়াহইয়া বিন মায়ীন (র.)-এর মন্তব্য অত্যুক্তিপূর্ণ। নতুবা হযরত ইয়াহইয়া বিন মায়ীন ও আবদুর রহমান বিন মাহদী (র.) ওয়াকী (র.) থেকে মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আর ইয়াহইয়া বিন মায়ীনের এ মন্তব্যের কারণ হচ্ছে, তার ইয়াহইয়া বিন সায়ীদ ও আবদুর রহমান বিন মাহদী (র.)-এর সাহচর্য লাভের সুযোগ হয়নি।

হযরত ইয়াহইয়া বিন মায়ীন (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হাদীস বর্ণনায় হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) কি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন? তিনি বললেন, হাঁ। অতপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) কি হাদীস বর্ণনায় সত্যনিষ্ঠ ছিলেন না? তখন ইয়াহইয়া বিন মায়ীন বললেন, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বর্ণিত হাদীস আমার পছন্দ নয়, আর না তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করাই আমি পছন্দ করি। হযরত আবু আমর ইবনে আবদুল বার (র.) বলেন, হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) বর্ণিত হাদীস নিম্ন পর্যায়ের, এ অভিমতের ব্যাপারে কাউকে কাউকে হযরত ইয়াহইয়া বিন মায়ীন (র.)-এর সহযোগী সমমনা হিসাবে দেখা যায়।

হযরত হাসান বিন আলী হুলওয়ানী (র.) বলেন, হযরত শাবাবা বিন সাওওয়ার (র.) বলেছেন, হাদীস শাস্ত্রের ইমাম হযরত শোবা (র.) হযরত ইমাম আবু হানীফা (রা.) সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করতেন। হযরত শাবাবা বিন সাওওয়ার (র.) আরও বলেন, হযরত শোবা (র.) আমার কাছ থেকে মোসাবেরুল ওয়াররাক (র.)-এর সেসব কবিতা শুনতেন, যা তিনি হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) সম্পর্কে রচনা করেছিলেন।

হাদীসশাস্ত্রের ইমাম হযরত আলী বিন মাদীনী (র.) বলেন, হযরত সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ বিন মোবারক, হাম্মাদ বিন যায়দ, হোশায়ম এবং ওয়াকী বিন জাররাহ, আব্বাদ বিন আওয়াম, জাফর বিন আওন (র.) প্রমুখের মতো হাদীসবেত্তারা হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। নিসন্দেহে তিনি হাদীসশাস্ত্রে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। নির্ভরযোগ্যতার বৈশিষ্ট্যে তার মধ্যে কোনো ঘাটতি নেই।

হাদীসশাস্ত্রের ইমাম হযরত ইয়াহইয়া বিন সায়ীদ (র.) বলেন, অনেক সময়ই হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত আমাদের মনোপূত হয় এবং আমরা তা গ্রহণ করি। তিনি আরও বলেন, আমি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর ছাত্র হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর কাছে 'জামে সগীর' পড়েছি। উল্লিখিত সব কয়টি অভিমতই হাফেয এযদী মোসেলী থেকে বর্ণিত।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম আবু আমর ইবনে আবদুল বার (র.) বলেন, যারা হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং হাদীস বর্ণনায় তার নির্ভরযোগ্য হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, তার প্রশংসা করেছেন, তাদের সংখ্যা ওদের চাইতে বেশী, যারা হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) সম্পর্কে কিছুটা উচ্চবাচ্য করেছেন। আর যেসব মাসয়ালায় কোরআন হাদীসের সুস্পষ্ট দলীল বর্ণিত নেই, সেসব মাসয়ালায় হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) অনুমান প্রয়োগ করে সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন। অনেক সমালোচক তার প্রতি বাতিল মতাবলম্বী হবারও অভিযোগ আরোপ করেছেন।

সব সময়ই এ কথা বলা হয়, পূর্ববর্তীদের কারো সম্পর্কে পরবর্তীদের নানা অভিমত তার প্রভাব এবং সুউচ্চ মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর ঘটনাই এ মন্তব্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তার সম্পর্কে দুই ধরনের লোক ধ্বংসে পতিত হয়েছে। এক দল তার প্রতি ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে শরীয়ত নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছে। আরেক দল তার প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে গিয়ে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করে ধ্বংস হয়েছে। হাদীস শরীফে এরূপ বিষয়বস্তুই বর্ণনা করা হয়েছে। যাদের আল্লাহ তায়ালা দ্বীনী মর্যাদা, প্রভাব এবং বুযুর্গী দান করেন, তাদের ব্যাপার এরূপই হয়ে থাকে। *(মোখতাসার জামেউল এলেম, পৃষ্ঠা ১৯৪)*

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও হযরত ইয়াহইয়া বিন মোয়াম্মার (র.)

একবার হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মজলিসে হযরত ইয়াহইয়া কিন মোয়াম্মার (র.) উপস্থিত হলেন। প্রসঙ্গক্রমে মজলিসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রাণনিধি হযরত হোসাইন (রা.)-এর আলোচনা ওঠে। তখন হাজ্জাজ বলতে লাগলো; হযরত হোসাইন (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বংশধর নন। কেননা, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কন্যার সন্তান, আর সন্তানের বংশসূত্র নানার প্রতি সম্পর্কিত হয় না।

হাজ্জাজের উক্তিতে হযরত ইয়াহইয়া বিন মোয়াম্মার (র.) ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, হাজ্জাজ! তুমি মিথ্যা বলেছো। নি:সন্দেহে হযরত হোসাইন (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বংশধর।

এবার হাজ্জাজ অগ্নিশর্মা হয়ে বললো; বংশসূত্র নানার সাথে সম্পর্কিত হয়– এ সম্পর্কে কোরআন থেকে কোনো দলীল উপস্থাপন করো, নতুবা আমি তোমাকে হত্যা করবো।

হযরত ইয়াহইয়া বিন মোয়াম্মার (র.) তৎক্ষণাত নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন–

'এবং তাঁর (ইবরাহীম) সন্তানদের মধ্য থেকে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা এবং হারূনকে হেদায়াত দান করেছি? আর এভাবেই আমি নেককারদের বিনিময় প্রদান করে থাকি। আর আমি যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলইয়াসকে হেদায়াত দান করেছি; তারা সবাই নেককারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।'

www.nagorikpathagar.org

এ আয়াত তেলাওয়াতের পর হযরত ইয়াহইয়া বিন মোয়াম্মার (র.) হাজ্জাজকে উদ্দেশ করে বললেন, এ আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-কে আদম (আ.)-এর বংশধর গণ্য করা হয়েছে। আর এটা সুস্পষ্ট, আদম (আ.) ছিলেন হযরত ঈসা (আ.)-এর নানা। কেননা, মাতৃসূত্র থেকেই তার বংশধারা নির্ধারিত হয়েছে। বাধ্য হয়ে হাজ্জাজের মেনে নিতে হয়, হযরত হোসাইন (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বংশধর ছিলেন।

এর পরও হাজ্জাজ বললো, আমার সম্মুখে বসে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে কিসে তোমাকে সাহসী ও উদ্বুদ্ধ করলো? হযরত ইয়াহইয়া বিন মোয়াম্মার (র.) বললেন, কোরআনের সে আয়াত আমাকে তোমার উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সাহস যুগিয়েছে, যে আয়াতে আল্লাহ তায়ালা (পূর্ববর্তী) আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাদের অনুসারীদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যেন তারা সত্য গোপন না করে। এ কথায় হাজ্জাজ আরো নিরুত্তর বনে যায়। অবশেষে হাজ্জাজ হযরত ইয়াহইয়া বিন মোয়াম্মার (র.)-কে খোরাসানে নির্বাসিত করে। *(তারীখে ইবনে আসাকের, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫)*

নাম ও নামধারীর মাঝে কুদরতী সম্পর্ক

ইমামুত তাবেয়ীন হযরত সায়ীদ ইবনে মোসাইয়াব (র.) হযরত ইবনে হাযুন (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একবার রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হন। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হাযুন। এ নাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পছন্দ হয়নি। কেননা, হাযুন শব্দের 'যা' অক্ষর যবর দিয়ে উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় রুক্ষ ভূমি। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমার নাম হবে সাহল (সাহল শব্দের অর্থ নরম)। হাযুন বললেন, আমি আমার পিতৃ প্রদত্ত নাম বদলাতে চাই না।

হযরত সায়ীদ (র.) বলেন, আমাদের দাদার হাযন (রুক্ষ ভূমি) নামের ওপর কায়েম থাকার প্রতিক্রিয়া হিসেবে অদ্যাবধি আমাদের সকলের (হাযনের বংশধর) মাঝে রুক্ষতা কঠোরতার প্রভাব প্রতিক্রিয়া বিদ্যামান রয়েছে। *(বোখারী)*

রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্বদা খেয়াল রাখতেন যেন এমন নাম রাখা হয় যা হবে বরকতময় এবং উপকারী। একবার এক সফরে তিনি দুটি পাহাড়ের কাছে উপনীত হন। মানুষজনকে পাহাড় দুটোর নাম জিজ্ঞেস করলে তারা একটির নাম ফাযেহ (লজ্জাদানকারী) এবং অপরটির নাম মুখযী (অপদস্থকারী) বলে জানায়। তিনি পাহাড় দুটোর নাম শুনে সাথে সাথেই এ পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করেন।

একবার রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উষ্ট্রীর দুধ দোহন করাতে চাচ্ছিলেন। এ সময় সেখানে একদল সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কে এ উষ্ট্রীর দুধ দোহন করবে? দলের মধ্য থেকে একজন বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাম, আমি দোহন করবো। তিনি তার নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মোররা (তিক্ত)। রসূল (স.) বললেন, তুমি বসো। আবার জিজ্ঞেস করলেন, কে উষ্ট্রীটির দুধ দোহন করবে? একজন দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, আমি দোহন করবো। তিনি এ ব্যক্তির নাম জিজ্ঞেস করলে বললেন, তার নাম হারব (যুদ্ধ)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমিও বসো। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কে উষ্ট্রীটি দোহন করবে? একজন দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, আমি দোহন করবো। তিনি আগের মতো এ লোকেরও নাম জিজ্ঞেস করেন। লোকটি বললেন, ঈয়াঈশ (বেঁচে রয়েছে)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ লোককে দুধ দোহনের অনুমতি প্রদান করেন। *(মোয়াত্তা ইমাম মালেক)*

এ আলোচনা থেকে জানা গেলো, আল্লাহ তায়ালা নাম ও নামধারী ব্যক্তির মাঝে একটা সম্পর্ক নিহিত রেখেছেন। যার জন্যে যেরূপ হাল অবস্থা ও কর্মসমূহ আল্লাহর এলেমে নির্ধারিত হয়, অনুরূপ নামের অনুপ্রেরণাই আল্লাহ্ তায়ালা তার মা বাপের মনে সৃষ্টি করে দেন। আরবী ভাষা ও অভিধানের ইমাম হযরত আবুল ফাতাহ জিন্নী চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর বড়ো আলেম ছিলেন। তিনি বলেন, দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমি অনেক নামই শোনতাম, কিন্তু সেসব নামের অর্থ আমার জানা হতো না। তবে আমি এসব নামের অক্ষরসমূহ, নামের শব্দমূলের ধরন ধারণ বিচারে অর্থ নির্ধারণ করে নিতাম। অতপর অনুসন্ধান পর্যালোচনায় আমার নির্ধারিত অর্থই সঠিক প্রতিপন্ন হতো।

আল্লামা ইবনে কাইয়েম (র.) স্বরচিত গ্রন্থ 'তোহফাতুল ওয়াদুদ ফী আহকামিল মাওলুদ' গ্রন্থে এ ঘটনা উদ্ধৃত করার পর নিজের ওস্তাদ হযরত আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র.)-এর সমীপে তা বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আমিও এরূপ বহু ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি।

সারকথা, আল্লাহ তায়ালা নাম ও নামধারী ব্যক্তি এবং নামের শব্দ ও অর্থের মাঝে এক বিশেষ সম্পর্ক এবং প্রভাব প্রতিক্রিয়া নিহিত রেখেছেন, তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমন নাম রাখতে নিষেধ করেছেন, যা খারাপ অর্থ এবং মন্দ প্রভাব প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে। দুখের বিষয়, মুসলমানরা এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মোটেই খেয়াল রাখে না। কিছু কিছু লোক সম্পূর্ণ নিরর্থক নাম রাখে। আবার কেউ কেউ এমন নামও রাখে যা মন্দ প্রভাব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। *(পড়ুন নাম সম্পর্কিত অনেক জানা অজানা তথ্য সমৃদ্ধ মুনমুন পাবলিশিং হাউজ-এর বই 'নাম সমাচার'।)*

হযরত সুফিয়ান সাওরী ও সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না (র.)

পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের মধ্য থেকে হযরত সুফিয়ান সাওরী ও সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না (র.) উচ্চস্তরের দুই জন আলেম ছিলেন। তাদের জীবন ইতিহাস ও উক্তিসমূহ ছিলো ঈমানের নূরে পরিপূর্ণ, নবুওয়তী এলেমের ধারক এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে উত্তম আদর্শ। এ দুই সম্মানিত আলেমের এক কথোপকথন এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে–

www.nagorikpathagar.org

হযরত সুফিয়ান বিন ওয়ায়না (র.) বলেন, আমি হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.)-কে বললাম, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, মানুষের সাথে চেনা পরিচয় কম করবে।

হযরত সুফিয়ান বিন ওয়ায়না (র.) বলেন, আমি নিবেদন করলাম, আল্লাহ তায়ালা আপনার ওপর রহমত করুন। হাদীসে কি বলা হয়নি, মানুষের সাথে জানাশোনা বেশী করো। কেননা, প্রত্যেক মুসলমানের শাফায়াত কবুল করা হবে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.) বললেন, আমি তো মনে করি, তোমার ওপর কোনো কষ্ট মসিবত আপতিত হলে তা জানাশোনা লোকের পক্ষ থেকেই হবে। সুফিয়ান বিন ওয়ায়না (র.) বলেন, আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলছেন।

হযরত সুফিয়ান বিন ওয়ায়না (র.) বলেন, এ উপদেশ প্রদানের পর হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.)-এর ইনতেকাল হয়ে যায়। একদিন আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে পেলাম, তিনি পায়চারি করছেন। আমি তার কাছে নিবেদন করলাম, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি আগের বাক্যেরই পুনরাবৃত্তি করেন। বললেন, যথাসম্ভব মানুষের সাথে চেনা পরিচয় কম করবে। কেননা, জানাশোনা, চেনা পরিচয়ের লোকদের থেকে ছাড়া পাওয়া খুবই দুষ্কর।

এর পর সুফিয়ান বিন ওয়ায়না (র.) এ বাক্যটি লিখে ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে দেন–

'আল্লাহ তায়ালা সেসব লোককে উত্তম প্রতিদান দিন যারা আমাকে চেনে না। এ প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা আমার বন্ধুদের যেন না দেন। কেননা, যখনই আমার ওপর কোনো কষ্ট মসিবত আপতিত হয়েছে, তা বন্ধুদের পক্ষ থেকেই আপতিত হয়েছে।'

হযরত সুফিয়ান বিন ওয়ায়না (র.)-এর এ উপদেশ বাক্যই এখানে পেশ করা হয়েছে–

'আল্লাহ তায়ালা সেসব লোককে উত্তম প্রতিদান দিন, যাদের এবং আমার মাঝে কোনো সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব নেই। আর না তাদের সাথে আমার কোনো প্রকার জানাশোনা বা চেনা পরিচয় রয়েছে।'

কেননা, যখনই আমার ওপর কোনো দুশ্চিন্তা, দুখ-কষ্ট আপতিত হয়েছে, তা শুধু আপন জন এবং চেনা জানা লোকদের পক্ষ থেকেই হয়েছে।

(মিনহাজুল আবেদীন, ইমাম গাযালী (র.), পৃষ্ঠা ১৬)

হাকীম বিন কোবায়সা (র.)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত হাকীম বিন কোবায়সা (র.) একজন মর্যাদাবান তাবেয়ী ছিলেন। তিনি হযরত মোয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি হযরত মোয়াবিয়া (রা.) সমীপে উপনীত হন। তখন মোয়াবিয়া (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, জীবনে তোমার ওপর সবচাইতে মসিবতের দিন কোন্‌টি অতিবাহিত হয়েছে? তিনি বললেন, আমার জীবনের সবচাইতে মসিবতের দিন সেটি, যেদিন শাকীক (র.) আমাকে তার কাছ থেকে বের করে দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

এর পর হযরত মোয়াবিয়া (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জীবনে সবচাইতে খুশীর দিন কোন্‌টি? নিবেদন করলেন, যেদিন আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েছেন,, সেটাই ছিলো আমার জীবনের সবচাইতে আনন্দ খুশীর দিন।

(তারীখে ইবনে আসাকের, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৩)

রসূলুল্লাহ (স.)-এর জামা কেমন ছিলো

এখানে রসূলুল্লাহ (স.)-এর জামার বুকের দিকে ফাড়া কেমন ছিলেন সেটাই আলোচনা হচ্ছে– জামার সামনের দিকের ফাড়ার দুটি প্রসিদ্ধ ধরন থাকে। তন্মধ্যে একটি ধরন ব্যাপক প্রচলিত। তা হচ্ছে, জামার সামনের দিকের ফাড়া থাকে বুকের ওপর। দ্বিতীয় ধরন, যা আগে প্রচলিত ছিলো, আজকাল কোথাও কোথাও এর প্রচলন আছে। এতে জামার সামনের দিকের ফাড়া উভয় কাঁধের ওপর থাকে। মাহবুবে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামার সামনের দিকের ফাড়া অংশ কেমন ছিলো সে সম্পর্কে কিছু কথা রয়েছে। এ বিষয়ে শায়খুল ইসলাম হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেন–

প্রকাশ্যত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামার সামনের দিককার ফাড়ার ধরন তাই ছিলো যা আজকাল প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ জামার ফাড়া ছিলো বুকের ওপর। সুনানে আবু দাউদ শরীফে 'ফী হাল্লিল ইযার' অধ্যায়ে হযরত মোয়াবিয়া বিন কোররা (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি তার পিতা কোররা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, আমি একবার মোযায়না গোত্রের এক দল লোকের সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমীপে উপস্থিত হই এবং আমরা তাঁর হাতে বায়াত (অঙ্গীকার) করি। তাঁর জামার ঘুন্ডিদ্বয় খোলা ছিলো। আমি জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তাঁর মোহরে নবুওয়ত স্পর্শ করি।

হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, এ কারণে আমি হযরত মোয়াবিয়া (র.) এবং তাঁর পিতা কোররা (রা.)-কে দেখেছি, উভয়ের জামার বোতাম থাকতো খোলা অবস্থায়।

(গ্রন্থকার বলেন, এ হাদীস দ্বারা একথা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে না যে, জামার বুকের দিকের ফাড়া অংশ খোলা রাখা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্থায়ী অভ্যাস বা সুন্নত ছিলো। এটা ছিলো একটা ঘটনা প্রসংগ মাত্র। তবে তাঁর প্রতি ভালোবাসার বিষয়টি আলাদা। হযরত কোররা (রা.) প্রথম দেখায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামার বুকের দিকের যে ধরন দেখেছেন, তা তার হৃদয়ে এমন কিছু প্রভাব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে, তিনি তাই নিজের স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করে নেন।)

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রকাশ্যত বুঝা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামার সামনের দিকের ফাড়া তাঁর বুকের ওপর ছিলো। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) নিজের সংকলিত বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফতহুল বারী'তে এ হাদীসকে এ বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

ফেকাহ গ্রন্থসমূহে এ সংক্রান্ত মাসয়ালা আলোচিত হয়েছে যে, যদি কেউ শুধু লম্বা জামা পরিধান করে নামায পড়ে, যা সতর ঢাকার জন্যে যথেষ্ট; কিন্তু রুকু সাজদায় বুকের ফাড়ার মধ্য দিয়ে সতরের ওপর দৃষ্টি পড়ে, তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তার নামায সহীহ হবে না। এ মাসয়ালা প্রমাণ করে, এসব ফকীহদের কালেও জামার সামনের দিকের ফাড়া বুকের ওপর রাখার প্রচলন ছিলো।

মোসনাদে আহমদ এবং সুনানে আরবায়া প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে এ মাসয়ালার বিষয়বস্তু হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.)-এর সূত্রে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত রয়েছে। হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমীপে নিবেদন করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি একজন শিকারী। লুঙ্গি বেঁধে দৌড়ানো আমার জন্য কষ্টকর। আমি কি শুধু এক জামা পরিধান করতে এবং তাতেই নামায আদায় করতে পারি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, হাঁ। তবে একটি কাঁটা দিয়ে হলেও জামার সামনের দিকের ফাড়া অংশ আটকে নেবে।

(আরবদের জামা হাঁটুর নীচ পর্যন্ত লম্বা এবং নীচের দিকে ডানে বামের কল্লি আটকানো থাকতো। ফলে শুধু জামা পরিধান করলেও কোনো প্রকারে উলঙ্গ হবার অথবা সতর খোলা থাকার আশংকা থাকতো না।)

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, এসব রেওয়ায়াতের কারণে আমি বুঝে নিয়েছিলাম, জামার সামনের দিকের ফাড়া অংশ সম্পর্কে আজকাল প্রচলিত পদ্ধতিই বুঝি সুন্নতসম্মত। সম্ভবত পূর্ববর্তীদের কর্মধারাও এরূপ ছিলো। আল হামদু লিল্লাহ, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আমি বোখারী শরীফে পেয়ে যাই। হযরত ইমাম বোখারী (র.) এ বিষয়ে 'জায়বুল কামীসে মিন ইনদিস সদরে'– 'জামার সামনের দিকের ফাড়া বুকের ওপর' এ নামে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ই স্থাপন করেছেন। অতপর এ অধ্যায়ে সে হাদীসটি বর্ণনা করেন, যাতে দানশীল ও কৃপণের উদাহরণ দেয়া হয়েছে দুটি জুব্বার সাথে। এ হাদীসে এও উল্লেখ করা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সংকীর্ণ জুব্বার উদাহরণ এভাবে বর্ণনা করেছেন, নিজের হাত জামার সামনের ফাড়া অংশ থেকে বের করে বলেন, এখন এ হাত যেমন জামার সামনের দিকের ফাড়া অংশের কারণে সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে, কৃপণের হাতও এরূপ সংকীর্ণ হয়ে থাকে।

হাফেয ইবনে হাজার (র.) সহীহ বোখারীর হাদীসের ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তার অনুবাদ হচ্ছে–

এটাই প্রকাশ্য, এ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জামা পরিহিত ছিলেন এবং তাঁর জামার সামনের দিকের ফাড়া ছিলো বুকের ওপর। অতপর বলেন, ইবনে বাত্তাল (র.) এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে বলেন, পূর্ববর্তীদের জামার সামনের ফাড়া থাকতো বুকের ওপর।

তাবারানী (র.) হযরত যায়দ বিন আবী আওফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একবার হযরত ওসমান (রা.)-কে দেখতে

www.nagorikpathagar.org

পেলেন, তার জামার বোতাম খোলা। তখন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বহস্তে তা বন্ধ করে দেন। অতপর বললেন, নিজের চাদর বুকের ওপর একত্র করে নাও। এ ঘটনাও প্রমাণ করে, হযরত ওসমান (রা.)-এর জামার সামনের দিকের ফাড়া অংশ বুকের ওপর ছিলো।

ইবনে আবী হাতেম (র.) 'আর তারা যেন নিজেদের চাদর বুকের ওপর ফেলে রাখে'– আয়াতের 'জুয়ূব' শব্দের তাফসীরে হযরত সায়ীদ বিন জোবায়র (র.) থেকে বর্ণনা করেন–

স্ত্রীলোকদের প্রতি নির্দেশ, তারা যেন নিজেদের দোপাট্টা জামার বুকের ফাড়া অংশের ওপর রাখে।

সারকথা, হাদীসের বর্ণনা এবং কথা বলার ইঙ্গিতে জানা যাচ্ছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামা বুকের দিকেই ফাড়া ছিলো। আর এ পদ্ধতি প্রথম যুগে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের মাঝেও প্রচলিত ছিলো।

আব্বাদ খাওওয়াস (র.)-এর নামে সুফিয়ান সাওরীর (র.) চিঠি

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.) তার এক বন্ধু হযরত আব্বাদ খাওয়াস (র.)-এর নামে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ–

অতপর, আপনি এমন এক যুগে রয়েছেন, যে যুগ থেকে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আশ্রয় চেয়েছেন। অথচ তাদের এমন গভীর এলেম অর্জিত হয়েছিলো যা আমাদের অর্জিত হয়নি। তা হলে আমাদের কি অবস্থা হবে যে, আমরা সে যুগ পেয়ে গেছি। আর না আমাদের তাদের মতো এলেম, ধৈর্য সহিষ্ণুতা, তাকওয়া এবং নেক কাজে সাহায্যকারী বন্ধুবান্ধব আছে। *(মিনহাজুল আবেদীন– ইমাম গাযালী (র.))*

ভালোবাসার পুরস্কার

যে সময় সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ অভিমুখে হিজরত করেন, সে সময় তাঁর গন্তব্যস্থল মদীনা শরীফে পৌছার কয়েকদিন পূর্ব থেকেই দর্শনাকাঙ্ক্ষীরা শহর থেকে বের হয়ে পথে বসে থাকতেন এবং সন্ধ্যা বেলায় হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে যেতেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সত্যি সত্যি একদিন শুভ পদার্পণ করলেন, সে দিনটি মদীনাবাসীর জন্যে ঈদের দিনে পরিণত হয়।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, যেদিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনায় শুভ পদার্পণ করেন, সেদিন তাঁর সৌন্দর্য সুষমায় মদীনার প্রতিটি বস্তু নূরান্বিত হয়ে পড়েছিলো। বয়স্কদের সাথে শিশুরাও আনন্দোল্লাস করতে থাকে। শিশু কন্যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মদীনায় অভ্যর্থনা জানিয়ে নিম্নোক্ত গানের আবৃত্তি করছিলো–

'সানিয়াতুল বেদা থেকে আমাদের ওপর পূর্ণ শশী উদিত হয়েছে। তাই আমাদের ওপর সব সময়ের জন্যে আল্লাহর শোকর ওয়াজেব হয়ে গেছে।'

www.nagorikpathagar.org

সব দিক থেকেই লোকজন আসছিলো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করছিলো। আনসারের মধ্য থেকে তালহা বিন বারা (রা.) নামক এক যুবক তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জড়িয়ে ধরেন এবং মোবারক হাতে চুম্বন দিয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, যে কাজের ইচ্ছা হয় আপনি আমাকে নির্দেশ করবেন। আমি কখনো কোনো কথায় আপনার অবাধ্য হবো না।

সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুবকের এরূপ দৃঢ়তা ও সাহসিকতা দেখে হেসে ওঠেন এবং নেহায়াত পরীক্ষার জন্যেই নির্দেশ করলেন, যাও, তোমার পিতা বারাকে হত্যা করে আসো। তালহা (রা.)-তো এ নির্দেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কোনো মুখের কথা ছিলো না। তিনি তৎক্ষণাত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করার জন্যে রওয়ানা দেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে থামিয়ে বললেন, এটা ছিলো নিছক পরীক্ষা। আল্লাহ তায়ালা আমাকে আত্মীয়তা ছেদনের জন্য প্রেরণ করেননি।

আফসোস! এ বিশ্বস্ত অনুগত রসূলপ্রেমিক যুবককে তার জীবন বেশীদিন সহযোগিতা করেনি। যুবক বয়সেই তার মৃত্যুর পয়গাম এসে যায়। তিনি এমন রোগাক্রান্ত হন যাতে জীবনের আশা আর বাকী থাকেনি। একেবারে শেষ সময়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন তাকে দেখতে যান, তখন তা ছিলো এক দুখজনক নৈরাশ্যের সময়। একজন বিশ্বস্ত রসূলপ্রেমিক ও খাঁটি রসূলসেবক মৃত্যুশয্যায় পড়ে আছেন এবং এ জগত থেকে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। সম্মুখে দন্ডায়মান রয়েছেন জীবন ও সম্পদ থেকে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। এ স্নেহশীল মুরব্বী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একজন নিষ্ঠাবান মৃত্যুপথযাত্রী প্রেমিকের চেহারা দেখছিলেন। তিনি আল্লাহর হুকুম থেকে নিষ্কৃতির কোনো উপায় দেখছিলেন না। অবশেষে ভগ্ন হৃদয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তালহার কাছ থেকে আলাদা হয়ে বললেন, তালহার মৃত্যুর লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে গেছে। সে সম্ভবত আর বেঁচে থাকবে না। তার মৃত্যু ঘটে গেলে তোমরা আমাকে সংবাদ দেবে। আমি এসে তার নামায (জানাযা) পড়বো। আর কাফন দাফনে বিলম্ব করবে না। কেননা, মুসলমানের মৃত দেহ ঘরে ফেলে রাখা সমীচীন নয়।

যুবক আনসার সাহাবী হযরত তালহা বিন বারা (রা.) বনী আমর বিন আওফ গোত্রভুক্ত ছিলেন। মদীনা শহর থেকে তিন মাইল দূরে কোবা মসজিদের পাশে ছিলো এ গোত্রের অধিবাস। মদীনা থেকে কোবা পল্লীতে যাবার পথে ইহুদীদের বসতি ছিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাদের কিছু অসিয়ত নসীহত করে দিনে দিনে মদীনায় ফিরে আসেন।

www.nagorikpathagar.org

যতোই দিন যাচ্ছিলো, ততোই হযরত তালহা (রা.)-এর জীবনের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছিলো। রাত হয়ে গেছে। ওদিকে হযরত তালহা (রা.)-এর জীবনেরও অন্তিম মুহূর্ত সমুপস্থিত।

ধন্য হযরত তালহা (রা.)-এর রসূল প্রেম। না তার নিজের মৃত্যু চিন্তা আছে; আর না আছে প্রিয়জন ও নিকটাত্মীয় স্বজন থেকে চির বিচ্ছিন্নতার কোনো দুশ্চিন্তা। এ কঠিন মুহূর্তেও তার ধ্যান মনোযোগ রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতিই নিবদ্ধ। তার চিন্তা তো একটাই– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিরাপত্তার চিন্তা। শেষ নিশ্বাসের আগে সামান্য চৈতন্য ফিরে আসলে শুশ্রূষা পরিচর্যাকারীদের ডেকে বললেন, দেখো! আমার মৃত্যু হয়ে গেলে তোমরাই জানাযা পড়ে আমাকে দাফন করে দেবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আমার মৃত্যু সংবাদ অবহিত করবে না। কেননা, রাতের বেলা। পথ অনেক দূর। তার আগমন পথে রয়েছে ইহুদীদের বসতি। তারা শক্তিশালী। তারা অহর্নিশি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার ষড়যন্ত্রে থাকে। তাঁকে কষ্ট দেয়ার কোনো সুযোগই তারা হাতছাড়া করে না। হয়তো বা নিজেদের দুষ্কৃতিপূর্ণ স্বভাববশত তারা কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র করবে এবং আমার জন্য রসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার জানাযা পড়াবেন, তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং দোয়া করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার জানাযা পড়া ও দোয়ায় কবর আলোকিত হবে এবং রূহের ওপর রহমত বর্ষিত হবে, একজন সত্যনিষ্ঠ খাঁটি মুসলমানের মৃত্যু পরবর্তীকালের জন্যে এর চাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা আর কি থাকতে পারে? অথচ জ্ঞানী ও বিবেকবান রসূলপ্রেমিক হযরত তালহা (রা.) নিজের এতো বড়ো আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দেয়া পছন্দ করলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তার হেফাযত এবং তাঁকে সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষার ইসলামী ফরয কর্তব্য আদায়েও কোনো ত্রুটি করেননি। এমন হবেই না কেন? তিনি তো সে আনসার দলভুক্ত ছিলেন, যাদের প্রশংসায় আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনে আয়াত নাযিল করেছেন–

'তারা (আনসার) নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ওপর অন্যদের কল্যাণ কামনাকে বেশী অগ্রাধিকার প্রদান করে, তাদের যতো কষ্টই হোক, যতো কঠিন অবস্থারই সম্মুখীন হতে হোক।' *(সূরা হাশর, আয়াত ৯)*

কথাটা অন্যভাবেও বলা যায়, হযরত তালহা (রা.) ব্যক্তিস্বার্থের ওপর জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্তার বিদ্যমান থাকা মুসলমানদের জন্যে হেদায়াত ও বরকতের উপকরণ এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্যে ছিলো রহমত।

সাথী আনসাররা হযরত তালহা (রা.)-এর অন্তিম উপদেশ কার্যকর করেন। রাতে রাতেই হযরত তালহা (রা.)-কে সে অবস্থানে পৌঁছে দেন, যেখানে আরাম অথবা

www.nagorikpathagar.org

কষ্ট–সর্বাবস্থায় কেয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। সেখানকার আরাম ও কষ্টের বিবরণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহুল কিছু শব্দে প্রকাশ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন– 'কবর হয়তো জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা হবে অথবা হবে জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত।'

সকাল বেলা হযরত তালহা (রা.)-এর মহল্লার লোকজন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে তার মৃত্যুকালীন অসিয়ত এবং কাফন দাফন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন।

তালহা (রা.)-এর এ আন্তরিক কল্যাণাকাঙ্ক্ষা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যেও বিপুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তিনি কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে বনী আমর বিন আওফের মহল্লায় শুভ পদার্পণ করেন। এ সংবাদ শুনতে পেয়ে অভ্যাস অনুযায়ী অনেক আনসারই সেখানে একত্রিত হন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত তালহা (রা.)-এর কবরের কাছে যান। উপস্থিত সকলে কাতারবন্দী হয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়ান। তিনি দোয়ার জন্যে হাত তোলেন। এটা এমন এক অবস্থা ছিলো, হযরত তালহা (রা.)-এর দেহ সেখানে না থাকলেও অবশ্যই তার আত্মা অবশ্যই আনন্দে নেচে ওঠেছিলো। দ্বীন দুনিয়ার সরদার দুই হাত তুলে কবরের কাছে দাঁড়ানো, সেখানে এর চাইতে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? পূর্ণ ঈমানের অধিকারী নিষ্ঠাবান মুসলমানরা আমীন বলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। রসূল প্রেমিক তালহা (রা.) নিজের চাইতে অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্যদানের পুরস্কার অবশ্যই লাভ করবেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত তালহা (রা.)-এর কবরের কাছে যে দোয়া করেন, অনুরূপ দোয়া সেদিন পর্যন্ত অন্য কারো জন্যে তিনি করেননি। তিনি যে দোয়া করেন তার অর্থ হচ্ছে– ইয়া আল্লাহ! তালহার সাথে এমন অবস্থায় তুমি সাক্ষাত করো, যেন তুমি তাকে দেখে হাসছো, আর সেও তোমাকে দেখে হাসতে থাকে। অর্থাৎ তুমি তালহার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় তার সাথে মিলিত হও।

নবীকুল সর্দারের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে, সৌভাগ্যবান তালহা (রা.) অবশ্যই রসূল প্রেমের বিনিময় ও পুরস্কারে আল্লাহর সন্তুষ্টির যে নেয়ামত লাভ করেছেন, দুনিয়ার কোনো সম্পদ এবং আরাম আনন্দই তার চাইতে বড়ো হতে পারে না। আমরাও জান্নাতে তালহা (রা.)-এর জন্য করা দোয়ায় শরীক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনের আশা করছি।

আমরা বার বার উচ্চারণ করছি– 'আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হোন তার (তালহা) প্রতি এবং সাহাবায়ে কেরামের সকলের প্রতি। রহমত অবতীর্ণ হোক আমাদের সর্দার ও নবীকুলের সর্দারের প্রতি।'

(এই লেখাটা তৈরী করেছেন মরহুম সাইয়েদ আসগর হোসাইন)

নেককারদের বিদ্যমান থাকায় সৃষ্টিকুলের লাভ

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– 'আল্লাহ তায়ালা যদি একজনকে অন্যজনের দ্বারা প্রতিরোধ না করতেন তা হলে জাগতিক শৃংখলা বিগড়ে যেতো।'

www.nagorikpathagar.org

দুনিয়ার জীবনে যেমন একজন প্রিয়জনের সম্মানে তার শত সহস্র আপন জনের রেয়াত করা হয়, তেমনি আল্লাহ তায়ালাও একজনের জন্যে শত জনের রেয়াত করেন। তাদের তিনি বিপদ মসিবত থেকে বাঁচিয়ে দেন।

হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম ইবনে জরীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.)-এর বর্ণনাক্রমে উদ্ধৃত করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, এক পুণ্যশীল বান্দার কল্যাণে তার প্রতিবেশীদের একশ' ঘর থেকে আল্লাহ তায়ালা বিপদাপদ ও আযাব রোধ করে দেন। *(তাফসীরে ইবনে কাসীর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৬)*

হযরত ইবনে ওমর (রা.) এ হাদীস বর্ণনার পর এ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

হযরত জাবের (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন– নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা একজন নেককার মুসলমানের কল্যাণে তার সন্তান, সন্তানের সন্তান, পরিবারবর্গ এবং প্রতিবেশীদের কল্যাণ সাধন করেন। তারা সর্বদা আল্লাহর হেফাযতে থাকে। *(তাফসীরে ইবনে কাসীর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৭)*

তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ বর্ণনা দুটি উদ্ধৃত করার পর যদিও সেগুলোর বর্ণনাসূত্র দুর্বল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তবে এ ব্যাপারে প্রথম কথা হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হাদীস বিশারদদের পর্যালোচনা মতে 'ফাযায়েলে আমল' সম্পর্কে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হাদীসও গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয়ত একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় উল্লিখিত হাদীস দুটোর সূত্রজনিত দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে তা কিছুটা শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে, আর হাদীস দুটোর আলোচ্য বিষয় কোরআনের উল্লিখিত আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে।

সারকথা, দ্বীনদার মুসলমানের অস্তিত্ব সাধারণ মুসলমানের জন্যে হামেশাই বরকত কল্যাণের কারণ। সাধারণ মুসলমান এর দ্বারা উপকার লাভ করুক বা নাই করুক।

হযরত আবু মোসলেম খাওলানী (র.) ওপর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মোজেযার প্রতিফলন

হযরত আবু মোসলেম খাওলানী (র.) তাবেয়ীদের মধ্যে উচ্চতর সম্মান মর্যাদার অধিকারী ইমাম ছিলেন। তার একটি বিস্ময়কর ঘটনা হাদীস ও নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ হেলইয়ায়ে আবু নোয়াইম, তারীখে ইবনে আসাকের, তারীখে ইবনে কাসীর প্রভৃতিতে হাদীসের বর্ণনাসূত্রের ধারামতে উল্লিখিত হয়েছে। এসব উদ্ধৃতি দেখলে সরওয়ারে কায়েনাত নবীয়ে উম্মী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামগ্রিক গুণ বৈশিষ্ট্যের একটি সুন্দর চিত্র দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে ওঠে। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামকে আল্লাহ তায়ালা যেসব মোজেযা ও গুণ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, সে ধরনের কিছু কিছু গুণ বৈশিষ্ট্য এবং অতিপ্রাকৃতিক বিষয় তিনি মাঝে মাঝে উম্মতে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কারো কারোর ওপর প্রকাশ করে দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

মোসায়লামা কাযযাবের নাম শয়তানের মতোই প্রসিদ্ধ। সম্ভবত অনেক সাধারণ মানুষও তার নাম অবহিত রয়েছে। সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়কালেই নবুওয়তের দাবী করে ঘোষণা করেছিলো, মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়তে আমারও অংশীদারিত্ব রয়েছে। ইয়ামানে মোসায়লামা কাযযাবের মিথ্যা নবুওয়তের ঘোষণা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বেওকুফ ও দুর্ভাগা পথভ্রষ্ট অনেক মানুষ তার দলে ভিড়ে যায়। এমনকি তার মিথ্যা দাবীর প্রচারণা ইয়ামানের আশপাশের এলাকাসমূহেও ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে। সে অত্যন্ত জোরজবরদস্তির সাথে নিজের বাতিল ধর্মমতের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাতে শুরু করে।

একদিন মোসায়লামা কায্যাব হযরত আবু মোসলেম খাওলানী (র.)-কে গ্রেপ্তার করে নিজের সম্মুখে হাযির করে জিজ্ঞেস করলো, আমি আল্লাহর রসূল, তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও। তার জিজ্ঞাসার জবাবে হযরত আবু মোসলেম খাওলানী (র.) বললেন, আমি শুনতে পাই না। মোসায়লামা এবার বললো, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল, তুমি কি একথার সাক্ষ্য দাও। হযরত আবু মোসলেম (র.) অবলিম্বে উত্তর দিলেন, হাঁ, নিসন্দেহে।

মোসায়লামা পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, আমি আল্লাহর রসূল– তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও। আবু মোসলেম (র.) জবাব দিলেন, আমি শুনতে পাই না। মোসায়লামা পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও? হযরত আবু মোসলেম বললেন, হাঁ। এভাবে তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করেও মোসায়লামা অনুরূপ উত্তরই লাভ করে।

এবার মোসায়লামা ক্রোধান্বিত হয়ে লোকদের নির্দেশ দিলো, শুকনা কাষ্ঠখণ্ডের এক বিরাট স্তূপ একত্র করে তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করো এবং আবু মোসলেমকে সে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করো। এ শয়তানের দল নির্দেশ পাওয়ামাত্র জাহান্নামের মতো অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হযরত আবু মোসলেম খাওলানী (র.)-কে সে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে, কিন্তু নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী যে আল্লাহ হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর জন্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে প্রশান্তিদায়ক বাগান এবং শান্তিদায়ক শীতল বানিয়ে দিয়েছিলেন, সে চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সত্তা আজও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্যে আত্মোৎসর্গকারী আবু মোসলেমকে দেখছিলেন। নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী আল্লাহ তায়ালা পুনরায় ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর মোজেযার এক ঝলক জগদ্বাসীকে দেখিয়ে নমরূদের অনুসারীদের সকল প্রচেষ্টা ধূলিতে মিশিয়ে দেন। হযরত আবু মোসলেম (র.) সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদে মোসায়লামার অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসেন। এ দৃশ্য দেখে খোদ মিথ্যুক মোসায়লামার সঙ্গী সাথী অনুসারীদের বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে ওঠে। এ পরিস্থিতিতে হযরত আবু মোসলেম (র.) ইয়ামান ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান, এটাকেই মোসায়লামা তার জন্যে মহা সৌভাগ্যের বিষয় ভাবতে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

মোসায়লামার প্রস্তাব গ্রহণ করে হযরত আবু মোসলেম (র.) ইয়ামান ছেড়ে মদীনাভিমুখে রওয়ানা করেন। মদীনা তাইয়েবায় পৌঁছে তিনি মাসজিদে নববীতে গমন করে খামের পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করেন। তার প্রতি হঠাৎ হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর দৃষ্টি পড়ে যায়। হযরত আবু মোসলেম (র.) নামায থেকে অবসর হলে হযরত ফারূকে আযম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? তিনি জবাব দিলেন, ইয়ামান থেকে। মোসায়লামা কাযযাব একজন মুসলমানকে জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়েছে–এ ঘটনা আগেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো। হযরত ফারূকে আযম (রা.)ও এ ঘটনায় যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছেন এবং প্রকৃত ঘটনা জানতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি আবু মোসলেম (র.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি সে লোক সম্বন্ধে জানেন, যাকে মোসায়লামা কাযযাব জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়েছে?

হযরত আবু মোসলেম (র.) অত্যন্ত আদবের সাথে শুধু নিজের নাম নিয়ে বললেন, সে হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন সাওব, অর্থাৎ আমি স্বয়ং। হযরত ফারূকে আযম (রা.) কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আসলে আপনিই কি সে লোক, যাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো? হযরত আবু মোসলেম (র.) কসম সহকারে নিবেদন করলেন, আমিই সে ঘটনা সংশ্লিষ্ট লোক।

এ জবাব শুনে হযরত ফারূকে আযম (রা.) দাঁড়িয়ে হযরত আবু মোসলেম (র.)-এর সাথে কোলাকুলি করে কাঁদতে থাকেন এবং তাকে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর সমীপে নিয়ে যান। সেখানে হযরত আবু মোসলেম (র.)-কে উভয়ের মাঝখানে বসানো হয়। এ সময় হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আল্লাহ্ তায়ালার শোকর, তিনি আমাকে এমন লোককে স্বচক্ষে দেখার জন্যে জীবিত রেখেছেন, যার সাথে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর মতোই আচরণ করা হয়েছে।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারীরা এ ঘটনাটি চোখ খুলে দেখতে পারে। মোসায়লামা কাযযাবের দাবী তাদের গুরু মির্যা গোলাম আহমদের চাইতে খুব একটা কঠিন কিছু ছিলো না। কেননা, মোসায়লামাও নবুওয়তে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ছিলো না। শুধু মির্যা সাহেবের মতোই নিজের নবুওয়তের স্বীকৃতি চেয়েছিলো। এতদসত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীরা তার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন, চাইলে এ ঘটনা থেকে গোলাম আহমদের অনুগতরা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ পত্র

সুনানে আবু দাউদে সূত্র সহকারে উদ্ধৃত হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর বিন আবুল আযীয (র.)-এর কাছে একখানা পত্র লেখেন, যাতে তাকদীর বিষয়ক কিছু প্রশ্ন ছিলো। জবাবে তিনি যে প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব লেখেন, তার প্রতিটি শব্দ সোনালী অক্ষরে লিখে রাখা ও সর্বক্ষণ জপ করার মতো। চিঠিখানার প্রভাব সৃষ্টিকারী শব্দলহরীও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। এখানে পত্রখানার অনুবাদ পেশ করা হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর প্রশংসা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদের পর–

আমি তোমাকে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা, তাঁর ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য অনুসরণের উপদেশ প্রদান করছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক বিধিবদ্ধ পদ্ধতি চালু করা সত্ত্বেও নব নব উদ্ভাবনকারীরা যা কিছু নতুন করার তা করেছে। তিনি উম্মতকে এ কষ্ট থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি তোমাকে এ বিষয়সমূহ তথা বেদয়াত পরিত্যাগের উপদেশ প্রদান করছি। তুমি সুন্নতের অনুসরণকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরো। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণই আল্লাহর হুকুমে যাবতীয় ধ্বংসকর বিষয় থেকে মুক্তিদানের চাবিকাঠি। ভালোভাবে বুঝে নাও, লোকেরা এমন কোনো বেদয়াতের জন্ম দেয়নি, যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতে অনিষ্ট ও মন্দ দিক নিহিত থাকার প্রমাণ বহন করে না। কেননা, সে সত্তাই সুন্নত পদ্ধতির প্রচলন করেছেন, যিনি আগে থেকেই জানতেন এর বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বনে বিভ্রান্তি, পদস্খলন, আহমকী এবং লৌকিকতা রয়েছে।

সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে সে পথ অবলম্বন করা, যা সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। তারা যে সীমায় থেমে গেছেন, এলেমের সাথেই থেমেছেন। আর যে বিষয় থেকে তারা মানুষকে ফিরিয়ে রেখেছেন, তা একটা দূরদর্শী দৃষ্টির ভিত্তিতেই ফিরিয়ে রেখেছেন। নিসন্দেহে তারা সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা এবং এলমী জটিলতাসমূহ উন্মুক্তকরণে সক্ষম ছিলেন। তারা যে কর্মে নিয়োজিত ছিলেন তাতে তারাই সবচাইতে বেশী মর্যাদা লাভের যোগ্য। অতএব তোমরা যে পথে রয়েছো তাই হেদায়াতের পথ, এটা মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে, তোমরা ফযীলত মর্যাদায় সাহাবায়ে কেরামের চাইতে অগ্রগামী হয়ে গেছো (যা সম্পূর্ণ অসম্ভব)। যদি তোমরা বলো, এসব পথ পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যুগে সৃষ্টি হয়েছে (তাই এসব পথ পদ্ধতি তাদের থেকে বর্ণিত হয়নি), তা হলে বুঝে নাও, এসবের আবিষ্কারক সেসব লোক, যারা সাহাবায়ে কেরামের পথ পদ্ধতির ওপর নেই। এরা সাহাবায়ে কেরামের বাইরে সম্পূর্ণ আলাদা পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। কেননা সাহাবায়ে কেরামই হচ্ছেন (এ উম্মতের) অগ্রবর্তী দল। যাঁরা দ্বীনী বিষয়ে এতো কথা বলে গেছেন এবং তারা এতো সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেছেন যা মানসিক স্বস্তি সুস্থতা দান করার জন্যে যথেষ্ট। অতএব, সাহাবায়ে কেরামের পন্থা পদ্ধতিতে কম বেশী করা কিংবা তাতে কোনো ত্রুটি করার সুযোগ নেই। আর তাদের মাত্রা থেকে অতিরিক্ত কিছু করারও কারো ক্ষমতা এবং যোগ্যতা নেই। অনেক লোক সাহাবায়ে কেরামের অবলম্বিত পথ ও পন্থায় ঘাটতি কমতি সৃষ্টি করেছে। তারা লক্ষ্যস্থল থেকে অনেক দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অনেক লোক তাদের পথ পন্থা থেকে অতিরিক্ত করতে গিয়ে নানা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনী বিষয়ে মধ্যবর্তী এক সরল পদ্ধতির ওপর অবস্থিত ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

উল্লিখিত পত্রে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহকারে বলেছেন, এমন বিষয় থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য, যা এ মানসিকতার সৃষ্টি করে যে, আমরা সে সব ফযীলত মর্যাদা অর্জন করেছি যা আমাদের পূর্ববর্তীরা অর্জন করতে পারেননি। এটা হচ্ছে একটা ভয়াবহ বিভ্রান্তি।

সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাস্বল্পতা সম্পর্কে ফোযায়ল বিন ইয়ায (র.)

আজকাল পৃথিবীতে সংখ্যাধিক্যের অভিমতের ভিত্তিতে রাজত্ব চলছে। মানুষ জাগতিক বিষয়সমূহ অতিক্রম করে দ্বীনী বিষয়সমূহেও এ মৌলনীতির প্রবর্তন ঘটিয়েছে, কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিরা এ বিষয়ে কি অভিমত পোষণ করতেন, তা হযরত ফোযায়ল বিন ইয়ায (র.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি থেকেই সুস্পষ্টরূপে জানা যায়। তার সে উক্তির অর্থ নিম্নরূপ–

তোমরা হেদায়াতের পথের অনুসরণ করো। হেদায়াতের পথে চলার লোক কম হলেও তা তোমাদের জন্যে অনিষ্টকর নয়। গোমরাহীর পথ থেকে আত্মরক্ষা করে চলো। এ ভ্রষ্ট পথে চলে ধ্বংসে নিপতিতদের সংখ্যাধিক্যে কখনো প্রবঞ্চিত হয়ো না।

(কিতাবুল ইতেসাম লিশ শাতেবী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৬)

আল্লামা শাতেবী (র.) বলেন, মাখলুকের ব্যাপারে আল্লাহর রীতি হচ্ছে, বাতিলপন্থীদের মোকাবেলায় সত্যপন্থীদের সংখ্যা সব সময়ই কম থাকে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

'তুমি আকাংখী হলেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনার নয়।'

আল্লাহর তায়ালা আরও বলেন–

'আমার বান্দাদের মাঝে শোকরগোযার মানুষ খুবই কম।'

(কিতাবুল ইতেসাম লিশ শাতেবী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১)

ইমাম আবু হানীফা ও আতা বিন আবী রাবাহর (র.) কথোপকথন

ইবনে বাত্তাল (র.) বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার মক্কা মোকাররামায় তার ও হযরত আতা বিন আবী রাবাহ (র.)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি ইমাম আবু হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথাকার অধিবাসী? তিনি জবাব দিলেন, আমি কুফার অধিবাসী। আতা বিন আবী রাবাহ (র.) বললেন, আচ্ছা আপনি কি সে জনবসতির অধিবাসী, যারা দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করে বিভিন্ন দল সৃষ্টি করেছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) বললেন, হাঁ, আমি সে জনবসতির অধিবাসী যারা দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করে বিভিন্ন দল সৃষ্টি করেছে। এর পর হযরত আতা বিন আবী রাবাহ (র.) জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! আপনি এসব দলের মধ্য থেকে কোন্ দলের অন্তর্ভুক্ত? ইমাম আবু হানীফা (র.) জবাব দিলেন–

আমি সেসব লোকের দলভুক্ত, যারা পূর্ববর্তী নেককার লোকদের কাউকে গালি দেয় না, মন্দ বলে না, তাকদীরের ওপর ঈমান রাখে, কোনো গোনাহের কারণে কাউকে কাফের বলে না।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর জবাবে হযরত আতা বিন আবী রাবাহ (র.) বললেন, আপনি সত্যের পরিচয় পেয়েছেন, এর ওপরই স্থির থাকুন।

(কিতাবুল ইতেসাম লিশ শাতেবী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪)

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.)-এর প্রথম ভাষণ

তাবেয়ীদের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.)। তার কাঁধে যখন খেলাফতের দায়িত্ব আসে, তখন তিনি এক বিরাট জনসমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন। সে ভাষণের একেকটি শব্দ স্মরণ রাখার উপযোগী। নীচে সে ভাষণের অনুবাদ পেশ করা হলো।

আল্লাহর প্রশংসা ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওপর দুরূদের পর–

প্রকাশ থাকে যে, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর আর কোনো নবী নেই, আর না তোমাদের কিতাব (কোরআন)-এর পর আর কোনো আসমানী কিতাব আছে। না তোমাদের সুন্নতের পরে অন্য কোনো সুন্নত আছে। আর না আছে তোমাদের উম্মতের পর আর কোনো উম্মত।

ভালোভাবে বুঝে নাও। হালাল শুধু তাই, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের জবানীতে আমাদের জন্যে হালাল করে দিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত তা হালালই থাকবে। অনুরূপ হারাম তাই, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের মাধ্যমে সরাসরি অথবা ইঙ্গিতে আমাদের জন্যে হারাম ঘোষণা করেছেন।

ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নাও। আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো নতুন বিষয়ের (বেদয়াত) আবিষ্কারক নই; বরং আমি শুধু সুন্নতের অনুসরণকারী। এও জেনে রাখো, আমি কোনো কাযী (ফয়সালাকারী) নই; বরং আমি কোরআন সুন্নাহর বিধান প্রচলনকারীমাত্র। অর্থাৎ আমার কাজ হচ্ছে, আল্লাহর বিধান থেকে যে নির্দেশ সাব্যস্ত হয় শুধু তাই জারি করা।

আরও ভালোভাবে বুঝে নাও, আমি (রাষ্ট্রীয়) কোষাগারের মালিক নই; বরং আমি এর নিছক একজন পাহারাদারমাত্র। মাল সম্পদ যেখানে রাখার মহান আল্লাহর নির্দেশ সেখানেই রেখে দেই। আমি তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তি নই; বরং তোমাদের সকলের চাইতে গুরুদায়িত্ব বহনকারী মানুষ। কোনো সৃষ্টির আনুগত্যে আল্লাহর না-ফরমানী জায়েয নয়। *(কিতাবুল ইতেসাম লিশ শাতেবী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০২)*

আজব উপকারী বিষয়

মালেকী মাযহাবের ফেকাহর প্রসিদ্ধ কিতাব ফয়যুর রহমানের সূত্রে হায়াতুল হায়ওয়ান গ্রন্থে সূত্রে আলোচিত হয়েছে, হযরত আল্লামা ইবনে জাওযী (র.) বলতেন, জুতা পরার সময় কেউ যদি আগে ডান পা এবং খোলার সময় আগে বাম পা ব্যবহার করে, তাহলে সে যকৃতের ব্যথা থেকে নিরাপদ থাকবে। *(ফয়যুর রহমান, পৃষ্ঠা ২৩১)*

www.nagorikpathagar.org

একটি উপকারী মাসয়ালা

ব্যবহার করা না হলেও ঘরে খেল তামাশা গান বাজনার কোনো সামগ্রী রাখা মাকরূহ এবং গোনাহের কাজ, সে সবের ব্যবহার শরীয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয।

এতে বুঝা গেলো, ঘরে এমন কোনো সামগ্রী রাখা সমীচীন নয় যেগুলো দ্বারা ঘরের লোকদের নৈতিক চরিত্র এবং আমল আকীদা ইত্যাদির ওপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। তাই ফকীহরা বাতিলপন্থীদের রচিত গ্রন্থাদিও ঘরে রাখতে নিষেধ করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন, এ মাসয়ালাটি ফতোয়ার কিতাবে কোথাও একবার আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিলো, কিন্তু এ সময় সে কিতাবের হাওয়ালা স্মরণ করতে পারছি না, আর আমার এখন খোঁজাখুঁজির অবসরও নেই।

মোফাস্সেরে কোরআন কাযী বায়যাবী (র.)

কাযী বায়যাবী (র.)– যাঁর রচিত তাফসীর গ্রন্থ 'বায়যাবী' শরীফ ব্যাপকভাবে দ্বীনী মাদ্রাসাসমূহের পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শায়খ তাজুদ্দীন সুবকী (র.) তাবাকাতে শাফেইয়া গ্রন্থে কাযী বায়যাবী সম্পর্কে নিম্নোক্ত মনোজ্ঞ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা কাযী বায়যাবী (র.) তার নিজের সম্মান, মহত্ত্ব ও গুণ বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ প্রদত্ত পরিচিতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির ভিত্তিতে প্রথম প্রথম শিরাযের কাযী (বিচারক) নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু যুগের বিবর্তন এবং সমসাময়িক লেখকদের মধ্যকার বিরোধজনিত কারণে তৎকালীন শাসক হযরত বায়যাবী (র.)-কে শিরাযের কাযীর পদ থেকে পদচ্যুত করেন। কাযীর পদ থেকে বিচ্যুত হবার পর আল্লামা হযরত বায়যাবী (র.) তাবরেজ শহরে উপনীত হন। সেখানে তিনি একদিন জনৈক আলেমের পাঠদান মজলিসে হাযির হয়ে এক পাশে বসে পড়েন। পড়ার সময় শিক্ষক পরীক্ষাস্বরূপ সাধারণ্যে অপরিচিত একটি সুষম প্রশ্ন আলোচনা করেন। তার ধারণা ছিলো, উপস্থিতদের কেউই তা সমাধান করতে পারবে না; বরং সমাধান তো অনেক পরের কথা, উত্থাপিত প্রশ্নের ধরন প্রকৃতিই কেউ বুঝতে সক্ষম হবে না। শিক্ষক উপস্থিত সবাইকে বললেন, সক্ষম হলে তোমরা এ প্রশ্নের সমাধান বলো। নতুবা অন্তত প্রশ্নের ধরন প্রকৃতি সম্পর্কেই কিছু আলোচনা করো।

মজলিসে শরীক সবাই এ প্রশ্নে হয়রান হয়ে পড়ে কি জবাব দেবে? এরই মাঝখানে কাযী বায়যাবী (র.) শিক্ষকের উত্থাপিত সূক্ষ্ম প্রশ্নের জবাব দিতে শুরু করেন। শিক্ষক বললেন, আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমার জবাব শোনবো না, যতোক্ষণ না আমি জেনে নেবো, তুমি প্রশ্নের ধরন প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছো।

শিক্ষকের কথায় কাযী বায়যাবী (র.) প্রশ্নের ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি শিক্ষকের উদ্দেশে বলেন, প্রশ্নের আলোচনায় আপনার চিন্তায় কিছুটা বিভ্রাট ঘটেছে। প্রশ্নটির শুদ্ধ আলোচনা হবে আসলে এ রকম। এর পর তিনি প্রশ্নের সমাধান অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেন। এর পর তিনি নিজের থেকে একটি অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন উত্থাপন করে শিক্ষকের কাছে সমাধান চান। শিক্ষক উত্থাপিত প্রশ্নের

www.nagorikpathagar.org

সমাধানে খুবই হয়রান হয়ে পড়েন। ঘটনাক্রমে এ মজলিসে তৎকালীন শাসনকর্তার একজন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীর মনে কাযী বায়যাবী (র.)-এর সম্মান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় (যদিও তিনি তখন পর্যন্ত কাযী বায়যাবীর পরিচয় জানতেন না)। মন্ত্রী অবিলম্বে তাকে নিজের কাছে নিয়ে সামগ্রিক পরিচয়, অবস্থা ইত্যাদি জিজ্ঞেস করেন। আপনি কে? কোথাকার অধিবাসী? এখানে কি প্রয়োজনে এসেছেন। কাযী বায়যাবী (র.) মন্ত্রীর জিজ্ঞাসার জবাবে নিজের সামগ্রিক পরিচয় বর্ণনা করে বলেন–

আমি বায়যার অধিবাসী। শিরাযের কাযী পদ লাভের আগ্রহ নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। পরিচয় বর্ণনার পর মন্ত্রী তাকে যথেষ্ট সম্মান মর্যাদা প্রদর্শন করেন এবং খেলাত দিয়ে বিদায় করেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, কাযী বায়যাবী (র.) শায়খ মোহাম্মদ বিন কাত্তানী (র.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, তিনি যেন মন্ত্রীর কাছে তাকে শিরাযের কাযী পদে নিয়োগদানের সুপারিশ করেন। হযরত শায়খ মোহাম্মদ কাত্তানী (র.) একজন সর্বজনস্বীকৃত বুযুর্গ ছিলেন। একদিন মন্ত্রীর সাথে দেখা হয়ে গেলে তিনি নিম্নের ভাষায় মন্ত্রীর কাছে কাযী বায়যাবী (র.)-এর সুপারিশ করেন–

এ হচ্ছে একজন পুণ্যকর্মশীল যুবক এবং বিজ্ঞ আলেম। তার নিবেদন হচ্ছে, সে জাহান্নামে আপনার অংশীদার হতে চায়। অর্থাৎ সে চাচ্ছে যেন জাহান্নামে তার এক মোসাল্লার জায়গা মিলে। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এমন বিপজ্জনক যে, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাহান্নামের উপকরণ সাব্যস্ত হয়ে যায়। তাই হযরত শায়খ মোহাম্মদ কাত্তানী (র.) কাযীর পদকে জাহান্নাম আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত কাযী বায়যাবী (র.) এ ধরনের সুপারিশে এতোটাই প্রভাবান্বিত হন যে, নিজের আবেদনই প্রত্যাহার করে নেন এবং তিনি সে থেকে হযরত শায়খ মোহাম্মদ কাত্তানী (র.)-এর খেদমতে অবস্থান করতে লাগলেন। শায়খ মোহাম্মদ কাত্তানী (র.)-এর ইঙ্গিতেই কাযী বায়যাবী (র.) তার তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন, যা সাধারণ বিশেষ সবার কাছে চির আদরণীয় এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে আছে।

মোমেনের দুনিয়া ও কাফেরের দুনিয়া

ইমাম আহমদ (র.) নওফে বাক্কালীর সূত্রে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার দুজন ব্যক্তি মাছ শিকারের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। এ দুই ব্যক্তির একজন মুসলমান আরেকজন কাফের। কাফের জাল ফেলতে তার পূজ্যদের নাম নিতো, যাতে তার জাল কানায় কানায় মাছে ভরে ওঠতো। পক্ষান্তরে মুসলমান ব্যক্তি জাল ফেলতে মহান আল্লাহর নাম নিয়ে ফেলতো, কিন্তু সে কোনো মাছই পেতো না। সূর্য ডোবা পর্যন্ত উভয়েই এভাবে শিকার করতে থাকে। একেবারে শেষের দিকে মুসলমান শিকারীও একটি মাছ পায়, কিন্তু দুর্ভাগ্য আর ব্যর্থতা! এ মাছটিও তার হাত থেকে ছুটে পানিতে লাফিয়ে পড়ে। এমনকি এ গরীব মুসলমান বেচারা সম্পূর্ণ হতাশ নিরাশ অবস্থায় শূন্য হাতে শিকার থেকে প্রত্যাবর্তন করে। পক্ষান্তরে কাফের লোকটি তার থলই কানায় কানায় মাছে ভরে প্রত্যাবর্তন করে।

www.nagorikpathagar.org

এ আজব ও বিরল ঘটনায় মোমেনের সঙ্গী ফেরেশতা অত্যন্ত দুখিত হয়ে আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, হে আমার স্রষ্টা পালনকর্তা, এটা কেমন কথা। তোমার নাম যেকেরকারী মোমেন বান্দা মাছ শিকারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ মনোরথ হয়ে শূন্য হাতে প্রত্যাবর্তন করছে, সে কোনো মাছই পেলো না। আর তোমার কাফের বান্দা তার খলই কানায় কানায় পূর্ণ করে ফিরছে। আল্লাহ্ তায়ালা মোমেনের সঙ্গী ফেরেশতাকে সম্বোধন করে বললেন, হে ফেরেশতা, আসো। এর পর এ মোমেন বান্দার জন্যে জান্নাতে যে আলীশান স্থান প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তা ফেরেশতাকে দেখিয়ে বললেন, এ আলীশান স্থান পেয়েও কি আমার মোমেন বান্দার দুখ-কষ্ট অবশিষ্ট থাকতে পারে, যা দুনিয়ায় মাছ না পাওয়ার ব্যর্থতার কারণে তার ওপর আপতিত হয়েছিলো। এর পর কাফেরের জন্য জাহান্নামে নির্ধারিত নিকৃষ্ট স্থান ফেরেশতাকে দেখিয়ে বললেন, কাফেরকে দুনিয়াতে যা কিছু দেয়া হয়েছে, সেসব কি তাকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারবে? ফেরেশতা জবাব দিলেন– না, তোমার সত্তার কসম করে বলছি হে রব! কখনোই এরূপ হতে পারে না। দুনিয়ার বস্তু সামগ্রী কোনো অবস্থায়ই কাফেরকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। (সূত্রঃ মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম আমগড়ী)

(সকল প্রশংসা পবিত্রতা মহান আল্লাহর। তাঁর কাছে ঈমানের সম্মান মর্যাদা কতো বড়ো। হে মুসলমানরা, তোমরা ঈমানরূপী এ সম্পদের যথাযোগ্য মূল্যায়ন করো। জাগতিক বিপদ মসিবতের কারণে কক্ষনো নিরুৎসাহ, ভগ্নহৃদয় এবং চিন্তাক্লিষ্ট হয়ো না। মহান আল্লাহ তোমাদের জন্যে দুনিয়ার বিনিময়ে জান্নাতে উচ্চ থেকে উচ্চতর বস্তু সামগ্রী প্রস্তুত রেখেছেন। জান্নাতের সেসব বস্তু সামগ্রীর মোকাবেলায় জাগতিক নেয়ামত তো কোনো মর্যাদাই রাখে না।)

নওফে বাক্কালীর সূত্রে হযরত ইমাম আহমদ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, আমি ইয়ামানে এক শিকারীকে দেখেছি, সে নদীর কিনারায় মাছ শিকার করছিলো। তার সাথে একটি ছোট্ট মেয়েও ছিলো। শিকারী কোনো মাছ পেলেই তা মেয়েটির কাছে রেখে নিজে শিকারে মনোযোগ দিতো। একদিকে শিকারী মাছগুলো মেয়েটির কাছে দিতো, অপর দিকে মেয়েটি সেগুলো নদীর পানিতে ছেড়ে দিতো। একবার শিকারী ব্যক্তিটি মাছের পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কোনো মাছই তাতে দেখতে পেলো না। সে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলো, কি কারণে তুমি মাছের সাথে এরূপ আচরণ করলে? মেয়ে বললো, আব্বা! আমি একদিন হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহর যেকেরে অমনোযোগী না হলে কোনো মাছই জালে ফাসে না। তাই আমি এমন বস্তুকে খাদ্যগ্রাস বানানো পছন্দ করি না, যা আল্লাহর যেকের বিমুখ।

মেয়ের জবাবে শিকারী অঝোর ধারে কাঁদতে শুরু করে এবং জাল হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

'এ কাহিনী দুটি আগের যুগে মানুষের মনে আল্লাহর ভয় এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মানবোধ ও প্রেম ভালোবাসা কতোটুকু ছিলো তারই প্রমাণ

www.nagorikpathagar.org

বহন করে। পুরুষ তো পুরুষই, স্ত্রীলোক এবং শিশু কন্যারাও কতোটুকু মোত্তাকী পরহেযগার হতো, এ কাহিনী দুটো তারই প্রমাণ। আজকাল আমাদের এ সমস্যা সংকটবহুল যুগে দিন দিনই দ্বীনদারী পরহেযগারীর আকাল সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এখন শ'য়ের মাঝে একজনও দ্বীনদার নেককার বান্দা দৃষ্টিগোচর হয় না। হে মুসলমানরা! উদ্ধৃত ঘটনা দুটো থেকে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। চলমান যুগের পোকামাকড়ের মতো নিত্য নতুন ফেতনা, সমস্যা সংকট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পূর্বযুগের লোকদের পদাংক অনুসরণে চলার পুরোপুরি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখো। ইনশাআল্লাহ তোমরাও তাদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে।'

কাফের এবং অপরাধীদের সাথে মুসলমানদের সদাচরণ

কাফের এবং বন্দী অপরাধীদের সাথে মুসলমানদের সদাচরণ ও সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলী একত্র করলে বৃহৎ কলেবরের একটি মনোজ্ঞ গ্রন্থ রচিত হবে। এখানে এ পর্যায়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাচ্ছে। ঘটনাটি হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.)-এর।

হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর পুত্র আবদুর রহমান (র.) একবার চার কাফের বন্দীকে হাত পা বেঁধে হত্যা করেন। তখন হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.) এরশাদ করলেন, আমি তো এভাবে মুরগী মারাও জায়েয মনে করি না। *(মোসনাদে আহমদ)*

রোম যুদ্ধের সময় বিপুলসংখ্যক বন্দী বণ্টনের অপেক্ষায় সংশ্লিষ্ট একজন অফিসারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলো। বন্দীদের মাঝে একজন মেয়েলোক অঝোরে কাঁদছিলো। হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.) তার কাছ দিয়ে যেতে মেয়েলোকটিকে কাঁদতে দেখে কারণ জানতে চান। তাকে বলা হলো, মেয়েলোকটির সন্তানকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তিনি অবিলম্বে মেয়েলোকটির ছিনিয়ে নেয়া সন্তান ফেরত দানের ব্যবস্থা করেন।

মা থেকে সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কঠোর শাস্তির কথা উচ্চারণ করেছেন। *(মেশকাত)*

সুফিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিতে বেদয়াত

বেদয়াত কুপ্রথার আবিষ্কতারক ও তার ওপর আমলকারীরা সাধারণত সুফিয়ায়ে কেরাম এবং মাশায়েখে তরীকতদের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের উদ্ভাবিত বেদয়াত ও কুপ্রথাসমূহকে সুফিয়ায়ে কেরাম ও মাশায়েখে তরীকতের সাথে সম্পর্কিত করে পেশ করার চেষ্টা করে। এখনও বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের ধারণা– শরীয়ত ও তরীকত পরস্পর বিরোধী বিষয়। তাদের মতে অনেক বিষয় শরীয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয হলেও তরীকতপন্থীরা সেগুলোকে জায়েয সাব্যস্ত করেন। এটা একটা বিপজ্জনক গোমরাহী। এতে জড়িয়ে পড়লে দ্বীন ও ঈমানের আর কোনো রক্ষা থাকে না। কেননা, একমাত্র শরীয়তই মানুষকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। যখন শরীয়তের

www.nagorikpathagar.org

বিরোধিতা জায়েয মনে করে নেয়া হয়, তখন গোমরাহীর শিকার হওয়া সহজ বিষয়ে পরিণত হয়।

তাই বেদয়াতের অপকারিতা এবং সুন্নতের উপকারিতার তাকিদে সুফিয়ায়ে কেরাম ও মাশায়েখে তরীকতের বাণীসমূহ প্রয়োজনে একত্র করা সমীচীন মনে হয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষ প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা পেতে পারে যে, সুফিয়ায়ে কেরাম এবং মাশায়েখে তরীকত বেদয়াতকে খারাপ জ্ঞান করতেন না, বা তারা সুন্নতের অনুসরণে অমনোযোগী ছিলেন।

হযরত আল্লামা শাতেবী (র.) রচিত গ্রন্থ 'কিতাবুল ইতেসাম' প্রথম খণ্ডের ১০৬তম পৃষ্ঠায় বেদয়াতের অপকারিতা এবং সুন্নতের অনুসরণে সুফিয়ায়ে কেরাম ও মাশায়েখে তরীকতের উক্তি সম্বলিত স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদই স্থাপন করা হয়েছে। এখানে সে পরিচ্ছেদেরই অনুবাদ উপস্থাপিত হচ্ছে।

তরীকতের ইমাম হযরত ফোযায়ল বিন ইয়ায (র.)

হযরত ফোযায়ল বিন ইয়ায (র.) বলেন, বেদয়াতীর কাছে উপবেশনকারীর কখনো জ্ঞান অর্জনের ভাগ্য হয় না।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (র.)

জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (র.)-কে জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআন করীমে দোয়া কবুলের ওয়াদা করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন– 'তোমরা আমার কাছে দোয়া করো, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।' কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে সুদীর্ঘ সময় থেকে আমরা দোয়া করে আসছি, কবুল হচ্ছে না। এর কারণ কি?

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (র.) বললেন, আসলে তোমাদের অন্তর মরে গেছে। মৃত অন্তরের দোয়া কবুল হয় না। আর দশটি কারণে মানুষের অন্তর মরে যায়।

প্রথমত, তোমরা আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছো, অথচ তাঁর হক আদায় করোনি।

দ্বিতীয়ত, তোমরা আল্লাহর কিতাব (কোরআন) পড়েছো, কিন্তু তার ওপর আমল করোনি।

তৃতীয়ত, তোমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেম ভালোবাসার দাবী তো করছো, কিন্তু তাঁর সুন্নত ছেড়ে দিয়েছো।

চতুর্থত, শয়তানের সাথে শত্রুতা পোষণের দাবী করছো, কিন্তু কার্যত তোমরা তার সাথে সহযোগিতা করে যাচ্ছো।

পঞ্চমত, তোমরা নিজেদের জান্নাতের আগ্রহী বলে প্রকাশ করো, কিন্তু জান্নাতের জন্যে কোনো আমল করো না।

এভাবে তিনি আরও পাঁচটি কারণ বর্ণনা করেন। এ ঘটনা আলোচনার কারণ হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (র.) সুন্নত পরিত্যাগকে অন্তরের মৃত্যুর কারণ বলে সাব্যস্ত করছেন।

www.nagorikpathagar.org

হযরত যুননুন মিসরী (র.)

হযরত যুননূন মিসরী (র.) বলেন, আমল আখলাকসহ যাবতীয় বিষয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ আল্লাহর প্রতি প্রেম ভালোবাসার নিদর্শন। তিনি আরও বলেন, মানুষের নষ্টের কারণ ছয়টি,

এক. আখেরাতের আমল সম্পর্কে তাদের সাহস ও নিয়ত দুর্বল হয়ে গেছে।

দুই. তাদের দেহসমূহ প্রবৃত্তির কামনা বাসনা পূরণের লালন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

তিন. তাদের ওপর দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ তারা যুয যুগ ধরে ইহজাগতিক বস্তু সামগ্রীর ব্যবস্থাপন ও সংরক্ষণের ধান্ধায় আটকে পড়েছে। অথচ তাদের আয়ু খুবই অল্প।

চার. তারা মানুষের সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর প্রাধান্য দিয়েছে।

পাঁচ. তারা নিজেদের উদ্ভাবিত বিষয়সমূহের (বেদয়াত) অনুসারী হয়ে পড়েছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নত ছেড়ে দিয়েছে।

ছয়. পূর্ববর্তী মাশায়েখ এবং বুযুর্গদের কারো কোনো পদস্খলন ঘটে থাকলে তারা সে বিষয়কেই নিজেদের মাযহাব (ধর্মমত) বানিয়ে নিয়েছে। তারা এসব মাশায়েখ বুযুর্গদের পদস্খলনজনিত বিষয়ের ওপর আমল করা তাদের প্রতি প্রীতি ভালোবাসা মনে করে বসেছে এবং তাদের অন্য সব ফযীলত মর্যাদা ও গুণ বৈশিষ্ট্য দাফন করে দিয়েছে।

হযরত যুননূন মিসরী (র.) এক লোককে উপদেশ প্রদান করে বললেন, আল্লাহ্ তায়ালার ফরয ওয়াজেবসমূহ গুরুত্ব সহকারে শেখা ও সেসবের ওপর আমল করা এবং তিনি যেসব বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন সেসবের কাছেও না ঘেঁষা অত্যন্ত জরুরী কর্তব্য। কেননা, আল্লাহ তায়ালা তাঁর এবাদতের যে পন্থা পদ্ধতি নিজে শিক্ষা দিয়েছেন তা সে পদ্ধতি থেকে উত্তম, যা তোমরা নিজেদের জন্যে গড়ে নিয়েছো। তোমরা মনে করো– তোমাদের মনগড়া পদ্ধতিতে সম্পাদন করা এবাদতের বেশী বিনিময় রয়েছে। যেমন কিছু কিছু লোক সুন্নতের সাথে সাংঘর্ষিক বৈরাগ্যবাদ অবলম্বন করে থাকে।

সর্বাবস্থায় নিজের প্রভুর নির্দেশের প্রতি দৃষ্টি রাখাই বান্দার জন্যে ফরয। তাঁকেই নিজের যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্তকারী মনে করবে। তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকবে।

আজকাল মানুষ ফরয ওয়াজেবসমূহকে মামুলী বিষয় ভেবে সেগুলোর প্রতি ততোটুকু গুরুত্ব দেয় না যতোটুকু গুরুত্ব দেয়া উচিত। এটা আজ তাদের ঈমানের স্বাদ আস্বাদন এবং আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হযরত বেশর হাফী (র.)

হযরত বেশর হাফী (র.) বলেন, একবার আমি স্বপ্নে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করি। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে বেশর! মহান আল্লাহ সমসাময়িক লোকদের ওপর তোমাকে কেন ফযীলত

www.nagorikpathagar.org

মর্যাদা ও অগ্রগণ্যতা দান করেছেন তা কি তুমি জানো? আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, আমি তা অবহিত নই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, সমসাময়িক লোকদের ওপর তোমার ফযীলত মর্যাদা লাভের কারণ, তুমি আমার সুন্নতের অনুসরণ করে থাকো, নেককার লোকদের সম্মান করো, নিজের ভাইদের কল্যাণ কামনা করো এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়তের প্রতি অগাধ ভালোবাসা পোষণ করো।

হযরত আবু বকর দাক্কাক (র.)

হযরত আবু বকর দাক্কাক (র.) ছিলেন হযরত জোনায়দ বাগদাদী (র.)-এর সমসাময়িক একজন বড়ো আলেম। তিনি বলেন, একবার আমি সে ময়দান অতিক্রম করছিলাম, যে ময়দানে বনী ইসরাঈল আল্লাহর কুদরতে চল্লিশ বছর বন্দী ছিলো। তারা সেখান থেকে বের হতে পারতো না। একে তীহ ময়দান বলা হয়। এ ময়দান অতিক্রমকালে আমার মনে এ কথা জাগলো যে, এলমে হাকীকত হচ্ছে এলমে শরীয়তের বিপরীত। এ সময় হঠাৎ অদৃশ্য থেকে আওয়ায এলো– 'যে হাকীকত শরীয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয় তা সুস্পষ্ট কুফরী।'

হযরত আবু আলী জাওযেজানী (র.)

হযরত আবু আলী জাওযেজানী (র.) বলেন, বান্দার সৌভাগ্যের নিদর্শন হচ্ছে, তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য করা সহজ হবে, তার কাজকর্ম সুন্নত মোতাবেক হবে, তার পুণ্যশীল লোকদের সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য হবে, নিজের বন্ধু বান্ধব ভাই বেরাদরের সাথে সদাচরণের তওফীক লাভ হবে, আল্লাহর সৃষ্টিকুলের জন্যে তার সদাচরণ ব্যাপক হবে, মুসলমানদের জন্যে সমবেদনা তার অভ্যাসে পরিণত হবে এবং সে নিজের সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। অর্থাৎ সে খেয়াল রাখবে যেন তার কোনো সময় অপচয় না হয়।

কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো, সুন্নত অনুসরণের সঠিক পন্থা কি? তিনি বললেন, সুন্নত অনুসরণের সঠিক পন্থা হচ্ছে, বেদয়াত থেকে বেঁচে থাকা, আকীদার সেসব বিষয় ও আহকামের অনুসরণ করা, যেগুলোর ওপর প্রথম যুগের ওলামায়ে ইসলামের এজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের কর্তৃত্ব নেতৃত্বকে অত্যাবশ্যক মনে করা।

হযরত আবু বকর তিরমিযী (র.)

হযরত আবু বকর তিরমিযী (র.) বলেন, সর্বপ্রকার গুণ বৈশিষ্ট্য সহকারে পরিপূর্ণ হিম্মত অর্জন প্রেমিক দল ব্যতীত কারোই অর্জিত হয়নি। আর এ মর্যাদা তাদের লাভ হয়েছে শুধু বেদয়াত পরিহার করে সুন্নতের যথার্থ অনুসরণের কারণে। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে অধিক সাহসী এবং আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী।

'সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় তাসাররুফ (কারামত) এবং তাওয়াজ্জুহ (আত্মিক প্রভাব নিক্ষেপণ)-কে হিম্মত বলা হয়। এর মর্ম হচ্ছে, নিজের চিন্তাশক্তিকে কোনো কাজ হওয়া না হওয়ার প্রতি নিবিষ্ট করা। এখানে হিম্মত দ্বারা সম্ভবত এ অর্থই উদ্দেশ

www.nagorikpathagar.org

করা হয়েছে। তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে তাসাররুফ এবং পারিভাষিক হিম্মতের ব্যবহারিক প্রকাশ সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত নয়। তাই এ স্থানে হিম্মতের আভিধানিক অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ দ্বীনী কাজে তৎপরতা এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করা।'

হযরত আবুল হাসান ওয়াররাক (র.)

হযরত আবুল হাসান ওয়াররাক (র.) বলেন, শুধু আল্লাহর আহকাম পালন এবং তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছার উদ্দেশে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোনো পথ পন্থা অবলম্বন করবে, সে হেদায়াত লাভ করতে গিয়ে গোমরাহ হবে।

হযরত ইবরাহীম বিন শায়বান (র.)

হযরত ইবরাহীম বিন শায়বান (র.) ছিলেন বিখ্যাত দুজন বুযুর্গ হযরত আবু আবদুল্লাহ মাগরেবী ও ইবরাহীম খাওওয়াস (র.)-এর সঙ্গীদের একজন। হযরত ইবরাহীম বিন শায়বান (র.) বেদয়াতের প্রতি কঠোর উন্মাসিক ও বেদয়াতীদের কঠোর সমালোচক ছিলেন। তিনি কিতাব ও সুন্নতের ওপর দৃঢ়ভাবে স্থির এবং পূর্ববর্তী মাশায়েখ ইমামদের কর্মপদ্ধতি অবলম্বনকারী ছিলেন।

এমনকি হযরত আবদুল্লাহ বিন মানাযেল (র.) হযরত ইবরাহীম বিন শায়বান (র.) সম্পর্কে বলেন, তিনি ফকীরদের এবং আদব ও মোয়ামালার অধিকারীদের সবার ওপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রমাণবিশেষের মর্যাদা রাখেন।

হযরত আবু ওমর যুজাজী (র.)

হযরত আবু ওমর যুজাজী (র.) ছিলেন আবেদ যাহেদকুলের প্রসিদ্ধ ইমাম হযরত জোনায়দ বাগদাদী ও হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.)-এর সঙ্গীদের একজন। তিনি বলেন, জাহেলিয়াত যুগে মানুষের রীতি ছিলো, তারা সে সবেরই অনুসরণ করতো যেগুলো তাদের জ্ঞান বিবেক উত্তম ও কল্যাণকর মনে করতো। অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শুভাগমন করেন। তিনি মানুষকে শরীয়তের অনুসরণ করতে বলেন। সুতরাং সে জ্ঞান বিবেকই সুস্থ ও বিশুদ্ধ, যা শরীয়তের উত্তম ও কল্যাণকর বিষয়কে উত্তম এবং শরীয়তের অপছন্দনীয় বিষয়কে অপছন্দনীয় মনে করে।

হযরত আবু ইয়াযীদ বোস্তামী (র.)

হযরত আবু ইয়াযীদ বোস্তামী (র.) বলেন, আমি তিন বছর পর্যন্ত মোজাহাদা (সাধনা) করেছি। তবে এলেম এবং এলেমের অনুসরণ ব্যতীত কোনো মোজাহাদাই আমার কাছে বেশী কঠিন মনে হয়নি। যদি ওলামায়ে কেরামের মতদ্বৈধতা না থাকতো, তাহলে আমি মসিবতে পড়ে যেতাম। নিসন্দেহে ওলামায়ে কেরামের মতদ্বৈধতা রহমত (তবে ঈমান আকীদার প্রশ্নে তা রহমত নয়)। আর শুধু সুন্নত

www.nagorikpathagar.org

অনুসরণের নামই অনুসরণ (কেননা, সুন্নতের এলেম ব্যতীত অন্য কিছুর এলেম এলেম নামের যোগ্যই নয়)।

একবার তিনি এক বুযুর্গের দাফনকাজে অংশ গ্রহণের উদ্দেশে কোথাও গমন করেন। সেখানে তিনি শহরময় আলোচিত এক বুযুর্গের কথা শুনতে পেয়ে এক বন্ধুকে বললেন, চলো, শহরময় আলোচিত এ বুযুর্গের সাথে দেখা করে আসি। হযরত আবু ইয়াযীদ (র.) বন্ধুকে নিয়ে বুযুর্গের গৃহে গমন করেন। এ সময় সে বুযুর্গ ব্যক্তি নামাযের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন। মাসজিদে প্রবেশ করে তিনি কেবলার দিকে ফিরে থুথু ফেলেন। এটা দেখে হযরত আবু ইয়াযীদ (র.) ফিরে আসেন, তাকে সালামও করেননি এবং বললেন, যে লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদবসমূহ থেকে একটি মাত্র আদবই যথাযথরূপে আদায়ে সক্ষম নয়, কিভাবে আশা করা যায় সে লোক একজন ওলীআল্লাহ হবেন?

ইমাম শাতেবী (র.) স্বরচিত গ্রন্থ 'কিতাবুল ইতেসামে' এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, হযরত আবু ইয়াযীদ (র.)-এর এ কথা একটি বড়ো মুলনীতি। এতে বুঝা যাচ্ছে, কোনো সুন্নতত্যাগী ব্যক্তি ওলীআল্লাহর মর্যাদা লাভ করতে পারে না।

এখন ভেবে দেখুন, যারা প্রকাশ্যে সুন্নত ত্যাগ করে বেদয়াতের ওপর হঠকারিতা করে, বুযুর্গী এবং ওলীর মর্যাদার সাথে তাদের কি কোনো দূরতম সম্পর্কও থাকতে পারে?

হযরত আবু মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব সাকাফী (র.)

হযরত আবু মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব সাকাফী (র.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা কেবল মানুষের যথার্থ এবং বিশুদ্ধ আমলই কেবল কবুল করেন। আবার যথার্থ ও বিশুদ্ধ আমলসমূহের মধ্য থেকে কেবল সে আমলই তিনি কবুল করেন যা একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্যেই করা হয়েছে। আবার তাঁর জন্যে একনিষ্ঠভাবে করা আমলসমূহের মধ্য থেকে সে আমলই কবুল করেন যা সুন্নত মোতাবেক করা হয়েছে।

হযরত আবু ইয়াযীদ (র.) বলেন, যদি তোমরা কারো খোলামেলা কারামত দেখতে পাও, এমনকি সে যদি হাওয়ায়ও উড়ে বেড়ায় তবু প্রতারিত হবে না। তাকে বুযুর্গ এবং ওলীআল্লাহ বলে বিশ্বাস করবে না, যতোক্ষণ না তার আদেশ নিষেধ, জায়েয নাজায়েয, শরীয়তের রীতিনীতি ও সীমা সংরক্ষণ এবং শরীয়তের ব্যাপারে তার প্রকৃত অবস্থা কি তা না দেখবে।

হযরত সাহল তস্তরী (র.)

হযরত সাহল তস্তরী (র.) বলেন, যে কাজ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত করা হয়, চাই তা আনুগত্য বা গোনাহ্ আকারেই করা হোক, তা হচ্ছে প্রবৃত্তির বিলাসিতা। আর যে কাজ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও আল্লাহর বিধানের আনুগত্য সহকারে করা হয়, তা প্রবৃত্তির ওপর ভর্ৎসনা এবং কষ্টকর কাজ। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ এবং আল্লাহর বিধানের আনুগত্য কখনো প্রবৃত্তির কাম্য নয়। আর আমাদের

www.nagorikpathagar.org

তরীকা অর্থাৎ তাসাওউফ বা সুলুকের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রবৃত্তির আনুগত্য অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা।

তিনি আরও বলেন, আমাদের সুফিয়ায়ে কেরামের সাতটি মূলনীতি রয়েছে–

এক. আল্লাহর কিতাব (কোরআন) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা।

দুই. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতের যথার্থ অনুসরণ করা।

তিন. হালাল খাওয়া, হালাল পরা এবং বস্তু সামগ্রীর ব্যবহারে খেয়াল রাখা যেন হারাম এবং না-জায়েয কিছু তাতে মিশে না যায়।

চার. মানুষকে কষ্ট থেকে বাঁচানো।

পাঁচ. গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

ছয়. তাওবা করা!

সাত. অন্যের অধিকারসমূহ যথাযথ আদায় করা।

তিনি আরও এরশাদ করেন, মানুষ তিনটি বিষয় থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছে। তা হলো, তওবাকে অত্যাবশ্যক জ্ঞান করা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করা এবং মানুষকে নিজের কষ্ট থেকে রক্ষা করা।

জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, বড়ো মন বা উদারতা কি বস্তু? তিনি বললেন, বড়ো মন হচ্ছে সুন্নতের অনুসরণ।

হযরত আবু সোলায়মান দারানী (র.)

হযরত আবু সোলায়মান দারানী (র.) বলেন, অনেক সময় আমার অন্তরে মারেফত, হাকীকত ও সুফিয়ায়ে কেরামের এলেমের বিশেষ বিশেষ সূক্ষ্ম এবং আজব কিছু বিষয় জাগ্রত হয়। আর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তা যেন চলতেই থাকে, কিন্তু আমি দুইজন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীর সাক্ষ্য ছাড়া তা কবুল করি না। এ ন্যায়নিষ্ঠ দুই সাক্ষী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নত।

হযরত আবু হাফস হাদ্দাদ (র.)

হযরত আবু হাফস হাদ্দাদ (র.) বলেন, যে সব সময় নিজের কর্ম ও অবস্থা, কিতাব এবং সুন্নতের পাল্লায় ওযন করে না, নিজের অন্তরে উদিত হওয়া বিষয়কে মানসিক স্বস্তি লাভের অযোগ্য মনে করে না; তাকে তাসাওউফের পথের পথিক গণ্য করো না।

তাকে বেদয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আহকামে শরীয়তের সীমা লংঘন করা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতে অলসতা অমনোযোগিতা প্রদর্শন করা, প্রবৃত্তির কামনা বাসনা ও অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের অভিমত অনুসরণ করা, পূর্ববর্তী নেককার পুণ্যশীলদের আনুগত্য অনুসরণ পরিহার করা। কখনো কোনো সুফী সহীহ বিষয়ের আনুগত্য ব্যতীত উঁচু মর্যাদা লাভ করতে পারেনি।

www.nagorikpathagar.org

হযরত হামদূন কাস্‌সার (র.)

হযরত হামদূন কাস্‌সার (র.)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, মানুষের আমল পর্যালোচনা করা, তার জন্যে পাকড়াও করা কার জন্যে কখন জায়েয হয়। বললেন, যখন সে বুঝবে, এ পাকড়াও এবং সৎকাজে আদেশ করা আমার ওপর ফরয হয়ে গেছে (সৎকাজে আদেশের পন্থা হলো, যাকে সৎকাজের আদেশ করা হচ্ছে সে আদেশদাতার অধীনস্থ এবং ক্ষমতাধীন হবে, অথবা এতোটা দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে, যাকে সৎকাজের আদেশ করা হচ্ছে সে আমার কথা মানবে)। অথবা কোনো মানুষের বেদয়াতে লিপ্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্তির আশংকা হলে এবং পাকড়াওকারীরও প্রবল ধারণা হতে হবে, আমার বলাতে আমলকারীর জন্যে এটাই নাজাতের কারণ হবে।

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী নেককার পুণ্যশীল লোকদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সে নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি, অপরাধ এবং আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের স্তর থেকে নিজের পেছনে অবস্থানের কথা ঠিক ঠিক বুঝতে পারে।

আল্লামা শাতেবী (র.) বলেন, এ কথার উদ্দেশ্য মানুষকে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করা। কেননা, তারাই আহলে সুন্নত অর্থাৎ সুন্নতের যথার্থ অনুসারী ছিলেন।

হযরত আহমদ বিন আবিল হাওয়ারী (র.)

হযরত আহমদ বিন আবিল হাওয়ারী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সুন্নতের অনুসরণ ব্যতীত কোনো আমল করে, তার আমল বাতিল–অগ্রহণযোগ্য।

হযরত জোনায়দ বাগদাদী (র.)

এক ব্যক্তি হযরত জোনায়দ বাগদাদী (র.) সমীপে আলোচনা করলো, আরেফ তথা সুফীদের জীবনে এমন এক অবস্থা আসে, যখন তারা সব তৎপরতা ও আমল পরিহার করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন। লোকটির কথার জবাবে হযরত জোনায়দ (র.) বললেন, এটা হচ্ছে সেসব লোকের কথা, যারা আমল রহিত হবার কথা বলেন।

তিনি আরও বললেন, আমি যদি এক হাজার বছরও বেঁচে থাকি, তবু স্বেচ্ছায় নেক আমলে অণুকণা পরিমাণ কমতি করবো না। তবে হাঁ, যদি অক্ষম হয়ে যাই তবে সেটা ভিন্ন কথা।

তিনি পুনরায় বলেন, জ্ঞানত আল্লাহ্ তায়ালা পর্যন্ত পৌছার যতো পথ পন্থা হতে পারে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত তা সবই মানুষের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত কেউই আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পারে না। যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের দাবী করে, সে মিথ্যাবাদী। তিনি আরও বলেন, আমাদের মাযহাব কিতাব ও সুন্নতের সাথে সংযুক্ত। যে কোরআন মজীদ হেফয করে না, রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীস লেখে না, তাসাওউফের ব্যাপারে তার অনুসরণ করা উচিত নয়। কেননা, আমাদের এলেম (তাসাওউফ) কিতাব ও সুন্নতের এলেমের সাথে সংযুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

সাথে সাথে এও বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকেও আমার একথা সমর্থিত হয়।

'এখানে কোরআন হেফয দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোরআনের বিধানের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা এবং কোরআন তেলাওয়াত তার ওযীফা বা নিত্যদিনের কাজে পরিণত হওয়া। আর হাদীস লেখার মর্ম হচ্ছে, জরুরী হাদীসসমূহের বিষয়বস্তু সংরক্ষণ করা, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মাশায়েখদের আমল থেকে এমনই প্রকাশিত রয়েছে।'

হযরত আবু ওসমান জায়রী (র.)

হযরত আবু ওসমান জায়রী (র.) বলেন, আল্লাহর সঙ্গ সাহচর্য তিন বস্তু দ্বারাই শুধু হাসিল হতে পারে। এগুলো হচ্ছে, উত্তম রীতিনীতি, আল্লাহর ভয় এবং মোরাকাবা।

সুন্নতের অনুসরণ ও অত্যাবশ্যকরূপে শরীয়তের আমল দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সঙ্গ সাহচর্য হাসিল করা সহজ হয়। আদব, সম্মান ও খেদমতের দ্বারা আওলিয়ায়ে কেরামের সাহচর্য লাভ হয়।

মৃত্যুকালে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে তার পুত্র দুঃখ দুশ্চিন্তার কাঠিন্যের কারণে নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলেন। হযরত আবু ওসমান জায়রী (র.) চক্ষু মেলে বললেন, বৎস! প্রকাশ্য আমলে সুন্নতের বিপরীত কাজ করাটা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছারই নিদর্শন।

তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি কথা ও কর্মে নিজের প্রবৃত্তির ওপর সুন্নতকে বিচারক বানাবে; সেই সত্যিকার অর্থে প্রজ্ঞা সহকারে কথা বলবে। আর যে কথা ও কর্মে নিজের প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে বিচারক বানাবে, সে বেদয়াতের মিশ্রণ দিয়েই কথা বলবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

'যদি তোমরা তার অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করো তবে হেদায়াত পাবে। *(সূরা নূর, আয়াত ৫৪)*

হযরত আবুল হোসাইন নববী (র.)

হযরত আবুল হোসাইন নববী (র.) বলেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে তোমরা যদি কাউকে এমন অবস্থার ওপর দেখো, যা তাকে শরয়ী এলেমের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে মনে হয়, তাহলে তোমরা তার কাছেও যাবে না। বুঝতে হবে তাতে শয়তানের সংমিশ্রণ আছে।

হযরত মোহাম্মদ বিন ফযল বলখী (র.)

হযরত মোহাম্মদ বিন ফযল বলখী (র.) বলেন, চার জিনিসে ইসলামের বিলুপ্তি ঘটে– (১) এলেম অনুযায়ী আমল না করা, (২) এলেমের বিপরীত আমল করা, (৩) যে বিষয়ের এলেম লাভ হয় সে বিষয় হাসিল না করা, (৪) এলেম হাসিলে মানুষের সামনে কোনো প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা।

আল্লামা শাতেবী (র.) বলেন, এ তো হচ্ছে হযরত মোহাম্মদ বিন ফযল বলখী (র.)-এর নিজের কথা। আমাদের যুগের সুফীদের অবস্থা তো এ ধরনেরই হয়ে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

এর পর আল্লামা শাতেবী (র.) বলেন, সে ব্যক্তিই আল্লাহর আদেশ সবচাইতে বেশী পালন করছে, যে আল্লাহর নির্দেশিত বিষয়সমূহের অনুসরণে সবচাইতে বেশী তৎপর এবং যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সবচাইতে বেশী আনুগত্য করে।

হযরত শাহ শুজা কেরমানী (র.)

হযরত শাহ শুজা কেরমানী (র.) বলেন, যে নিজের দৃষ্টিকে গায়রে মাহরাম থেকে সংরক্ষিত রাখবে, প্রবৃত্তিকে সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে বাঁচাবে, আভ্যন্তরীণ দিককে স্থায়ী মোরাকাবা দ্বারা বিনির্মিত করবে, জীবনের প্রকাশ্য দিককে সুন্নতের অনুসরণ দ্বারা সজ্জিত করবে, নিজেকে হালাল খাওয়াতে অভ্যস্ত করবে, এমন ব্যক্তির দূরদর্শিতায় কখনও ভুল হবে না।

হযরত আবু সায়ীদ খাররায (র.)

হযরত আবু সায়ীদ খাররায (র.) বলেন, প্রকাশ্য শরীয়ত যে বাতেনী (আভ্যন্তরীণ) অবস্থার বিরোধী হয়; তাহলে তা বাতিল–অগ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত হবে।

হযরত আবুল আব্বাস বিন আতা (র.)

হযরত আবুল আব্বাস বিন আতা (র.) ছিলেন হযরত জোনায়দ (র.)-এর সমসাময়িক আলেম। তিনি বলেন, যে নিজের ওপর আল্লাহর রীতিনীতিকে আবশ্যক করে নেয়, আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরকে মারেফতের নূরে নূরান্বিত করে দেন। বান্দা জীবনের নির্দেশসমূহ এবং নৈতিকতার কাজে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসারী হওয়ার চাইতে উচ্চতর ও সম্মানিত কোনো স্থান নাই।

তিনি আরও বলেন, আল্লাহর স্মরণ এবং আচার আচরণে আল্লাহ প্রদত্ত আদবের প্রতি অমনোযোগী হওয়াই মূলত সবচাইতে বড়ো অমনোযোগিতা।

হযরত ইবরাহীম খাওওয়াস (র.)

হযরত ইবরাহীম খাওওয়াস (র.) বলেন, বলা ও লেখার সময় রেওয়ায়াত (বর্ণনা)-এর আধিক্যের নাম কিন্তু এলেম নয়; বরং কেবল তিনিই বড়ো আলেম যিনি স্বীয় এলেমের একান্ত অনুগত অনুসারী। যিনি এলেমের ওপর আমল করেন এবং সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করেন– তিনিই বড়ো। যদিও তার এলেম খুবই স্বল্প।

কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, সুস্থতা ও নিরাপত্তা কি বস্তু? তিনি জবাবে যা বলেন তার মর্মার্থ হচ্ছে–

বেদয়াতমুক্ত দ্বীন, বেদয়াতমুক্ত আমল, আর কামনা বাসনার প্রাবল্যমুক্ত প্রবৃত্তিই হচ্ছে আসল সুস্থতা।

তিনি আরও বলেন, (প্রকৃত) ধৈর্য হচ্ছে কিতাব, অর্থাৎ কোরআনের বিধান ও সুন্নতের ওপর দৃঢ়তার সাথে কায়েম থাকা।

www.nagorikpathagar.org

হযরত বেনান হাম্মাল (র.)

হযরত বেনান হাম্মাল (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সুফিয়ায়ে কেরামের অবস্থার মূল কি? তিনি বললেন, সুফিয়ায়ে কেরামের অবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে চারটি। (১) আল্লাহ তায়ালা যে বস্তুর (রেযেক) দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়েছেন তাতে তাঁর ওপর আস্থাবান ও নির্ভরশীল থাকা, (২) দৃঢ়ভাবে আল্লাহর বিধানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা, (৩) নিরর্থক ভাবনা চিন্তা থেকে অন্তরের হেফাযত করা, (৪) সৃষ্টিকুল থেকে বিমুখ হয়ে মনোযোগ শুধু আল্লাহর সত্তার প্রতিই নিবদ্ধ রাখা।

হযরত আবু হামযা বাগদাদী (র.)

হযরত আবু হামযা বাগদাদী (র.) বলেন, যার সত্য পথ জানা হয়ে যায়, তার সে পথে চলাও সহজ হয়। অবস্থা, কর্ম এবং কথায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত উপনীত হবার কোনো পথ নেই।

হযরত আবু এসহাক রাক্কাশী (র.)

হযরত আবু এসহাক রাক্কাশী (র.) বলেন, কেউ আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয়ভাজন কিনা তা জানার নিদর্শন হলো, সে আল্লাহর আনুগত্য এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণকে সর্বকাজের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে কি না– তা দেখা। এর সপক্ষে আল্লাহর ঘোষণা– 'হে রসূল! তুমি বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তা হলে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ভালোবাসবেন।'

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১)

হযরত মোমশাদ দায়নূরী (র.)

হযরত মোমশাদ দায়নূরী (র.) বলেন, মুরীদের আদব বা পালনীয় রীতিনীতির সারকথা হচ্ছে, মাশায়েখে কেরামের সম্মান ও মহত্ত্ব মর্যাদাকে অত্যাবশ্যক মনে করবে এবং তরীকতের অন্য ভাইদের সম্মান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বৈষয়িক উপায় উপকরণের ধান্ধায় পড়বে না। আর নিজের প্রকৃতিতে শরীয়তের আদবসমূহের পুরোপুরি হেফাযত করবে।

হযরত আবু আলী রোযবারী (র.)

হযরত আবু আলী রোযবারী (র.)-এর সাথে কেউ আলোচনা করলো, কোনো কোনো সুফী গান ও বাদ্য বাজনা শোনেন এবং বলেন, এটা আমার জন্যে হালাল। কেননা, আমি এখন এমন এক স্তরে উপনীতি হয়েছি, যে স্তরে উপনীতি হলে অবস্থার পরিবর্তন বৈপরীত্য আমার ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া করে না। হযরত আবু আলী (র.) বললেন, হাঁ, সে সত্যিই উপনীত হয়েছে– এ কথা সে সত্যই বলেছে। তবে আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত উপনীত হয়নি– উপনীত হয়েছে জাহান্নামে।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মানাযেল (র.)

হযরত আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মানাযেল (র.) বলেন, যে শরীয়তের ফরযসমূহের কোনো একটি ফরযও বিনষ্ট করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে

www.nagorikpathagar.org

সুন্নতসমূহের বিনষ্টের কাজে লিপ্ত করে দেন। আর যে ব্যক্তি সুন্নতসমূহের বিনষ্টের কাজে লিপ্ত হয়, সে ত্বরিত বেদয়াতে লিপ্ত হবে।

হযরত বেন্দার ইবনুল হোসাইন (র.)

হযরত বেন্দার ইবনুল হোসাইন (র.) বলেন, বেদয়াতীদের সাহচর্য মানুষের মাঝে সত্যবিমুখতা সৃষ্টি করে।

নৈতিকতা ও সামাজিকতায় ভাষা এবং পোশাকের প্রভাব

আল্লাহ্ তায়ালা যেভাবে প্রত্যেক জড়, উদ্ভিজ্জ এবং লতাগুল্মে বিশেষ বিশেষ প্রভাব প্রতিক্রিয়া গচ্ছিত রেখেছেন, এগুলোর কিছু মানব প্রকৃতির জন্য উপকারী এবং কিছু অপকারী বানিয়েছেন। দাওয়াই, চিকিৎসা ও বাছবিচারে সেসবের প্রতি এ কারণে সবিশেষ লক্ষ্যও রাখা হয়। একইভাবে মানুষের যাবতীয় কর্ম এবং আমলের মাঝেও কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার কিছু কোরআন হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কিছু প্রত্যক্ষ দর্শন ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ভাষা এবং পোশাক উল্লিখিত ধারাক্রমেরই দুটি জিনিস। এ দুটিতে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ বিশেষ প্রভাব প্রতিক্রিয়া নিতিত রেখেছেন। আর অধিকাংশ ইসলামী বিধানে এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা এবং হাজার হাজার প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্য দিয়ে এটা দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, মানুষ যে জাতির ভাষা এবং পোশাক অবলম্বন করে, সে জাতির মানস-চিন্তা এবং নৈতিকতা অতি দ্রুত তার মনে ও কর্মে ছড়িয়ে পড়ে। এ সূক্ষ্ম সংযোগের বাস্তবতা আপনি হৃদয়ঙ্গম করুন আর নাই করুন, কিন্তু এর পরিণাম পরিণতি এতো সুস্পষ্ট এবং খোলামেলা যে, এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

আমাদের পূর্ববর্তীরা এ রহস্য ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। তারা যখন আরব উপদ্বীপ থেকে হেদায়াতের এলেম বহন করে অনারব বিশ্বের প্রতি পা বাড়ান, তখন তারা এ বিষয়টির প্রতি সবিশেষ খেয়াল রেখেছেন। তারা যেমন বিশ্ব মানবের কাছে ইসলামের প্রচার প্রসার ব্যাপক করার চেষ্টা করেছেন, তেমনি আরবী ভাষা, পোশাক আশাক এবং বাহ্যিক চালচলনও ব্যাপকতর করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ফলে স্বল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবীময় তারা নযিরবিহীন সাফল্য অর্জন করেন। এক দিকে তারা যেমন পৃথিবীর ভৌগোলিক মানচিত্র বদলে ফেলেছেন, অন্য দিকে তেমনি সর্বশ্রেণীর মানুষ ও দেশসমূহের ভাষার পরিবর্তনও সাধন করেছেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের অনারব বিশ্বে পদার্পণের আগে মিসরে কিবতী ভাষা, শামে (সিরিয়ায়) রোমক ভাষা, ইরাক ও খোরাসানে ফার্সী ভাষা এবং ইউরোপীয় দেশসূহে বার্বার জাতির ভাষা প্রচলিত ছিলো। ইসলাম প্রবেশের পর স্বল্প কালের মধ্যেই এসব দেশের ভাষাসমূহ এমনভাবে বদলে যায় যে, মানুষ তাদের মাতৃভাষাই বিস্মৃত হয়ে পড়ে এবং স্থানীয় ভাষার নাম নিশানাও সেখানে অবশিষ্ট থাকেনি।

www.nagorikpathagar.org

আরবী ভাষার এরূপ ব্যাপক প্রসারে এ ভাষার মাধুর্য, প্রশস্ততা, সহজবোধ্যতা এবং প্রাঞ্জলতার বিরাট একটা প্রভাব অবশ্যই ছিলো। তবে এও নিসন্দেহ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের কর্মকৌশল এবং বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত অনারব দেশসমূহে বিদ্যমান কায়া সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যাওয়া সম্ভবপর ছিলো না। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীরা পৃথিবীর যে অংশেই অবতরণ করেছেন, সেখানেই তারা তাদের ভাষণ বক্তৃতা আরবী ভাষায় দিয়েছেন। অথচ তারা যাদের লক্ষ্য করে ভাষণ বক্তৃতা দিয়েছেন তারা আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। কোনো দোভাষী দ্বারা নিজেদের ভাষণ বক্তৃতা স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে বুঝাতে সক্ষম থাকা সত্ত্বেও তারা অনুবাদের পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। তারা প্রয়োজনীয় বিধি বিধানসমূহ স্থানীয় ভাষায় লোকদের পর্যন্ত পৌছানোর ব্যবস্থা করে খোতবা শুধু আরবী ভাষার মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যাতে সে জনগোষ্ঠী তাদের স্বয়ং ইমাম ও শাসকের বক্তৃতার ভাবার্থ বুঝতে; আরবী ভাষার সাথে পরিচিত হতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আর বাস্তবে হয়েছেও তাই।

ইসলামের মধ্যপন্থার এক উদাহরণ

অনারব বিশ্বে ইসলাম ও আরবী ভাষা আরবী পোশাক ও বাহ্যিক চালচলনের ব্যাপক প্রচার প্রসারে গৃহীত কর্মকৌশলেও প্রথম যুগের মুসলমানরা নিজেদের স্বতন্ত্র মর্যাদা বৈশিষ্ট্যের পরিচয়বাহী মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এর সীমা সংরক্ষণের প্রতি যথাযথ খেয়াল রেখেছেন, ভিন্ন জাতির মাঝে যার নযির পাওয়া যায় না। তারা চাইতেন যেন যথাসম্ভব ত্বরিত বেগে আরবী ভাষা ব্যাপকতা লাভ করে, কিন্তু এ উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধকরণে তারা সীমা ডিঙ্গাতে দেননি, যাতে জোর জবরদস্তির সুযোগ সৃষ্টি হতে না পারে। তারা পৃথিবীর জাতিসমূহের এমন প্রয়োজনকে আরবী ভাষার ওপর ভিত্তিশীল রাখেননি, যা ব্যতীত জীবন অতিবাহিত করাই কষ্টকর হবে।

খোতবা বুঝা কোনো ফরয ওয়াজেব নয়, তা না বুঝলে কেউ গোনাহগার হবে না। অবশ্য এটা স্থানীয় লোকদের ইমাম বা শাসকের বক্তৃতা বুঝতে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধকরণে একটি মাধ্যম ছিলো। পক্ষান্তরে খৃস্টানরা এ লক্ষ্য অর্জনে মুসলমানদের সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে। তারা ভাষার এ তাৎপর্য সম্পর্কে যখন অবহিত হয়, তখন তারা নিজেদের ভাষা পৃথিবীময় ব্যাপকতর করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা শুরু করে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে তারা মানুষের জীবন সংকীর্ণ করে তোলে। মানুষের ভ্রমণ, গৃহে অবস্থান, পারস্পরিক লেনদেন, বেচাকেনা, জীবিকার্জন সব কিছুই তাদের ভাষা জানার ওপর নির্ভরশীল করে দেয়। যদি তাদের অদৃষ্টের বঞ্চনা ও তাদের ভাষার সংকীর্ণতা কঠোরতা না থাকতো, তা হলে নিসন্দেহে আজ পৃথিবীময় ইংরেজী ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষার নাম নিশানাও থাকতো না।

আল্লাহ তায়ালা ইসলাম এবং আরবী ভাষাকে এ মর্যাদা দান করেছেন যে, যে দেশেই তা প্রবেশ করেছে, সেখানেই স্থানীয় সব ভাষার ব্যবহার প্রচলন রহিত করে দিয়ে সে নিজের স্থান করে নিয়েছে।

প্রখ্যাত ইউরোপীয় পন্ডিত গেস্টাও লীবান আরবী ভাষার বিশ্বজনীনতায় বিস্মিত হয়ে লেখেন–

www.nagorikpathagar.org

আরবী ভাষা সম্পর্কে আমাদের তাই বলতে হয়, যা আমরা আরব ধর্ম (ইসলাম) সম্পর্কে বলেছি। আগে থেকে বিজয়ীরা যেখানে তাদের বিজিত অঞ্চলসমূহে নিজেদের ভাষা চালু করতে সক্ষম হয়নি, আরবরা সে ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে। বিজিত জাতি গোষ্ঠীরা আরবদের ভাষাও গ্রহণ করেছে। আরবী ভাষা ইসলামী দেশসমূহে এতোটুকু প্রসার লাভ করে যে, অল্পদিনের মধ্যেই সেখানকার প্রাচীন ভাষাসমূহ, যেমন সুরইয়ানী, কিবতী, ইউনানী (গ্রীক), বার্বার প্রভৃতি ভাষার স্থান দখল করে নেয়। ইরানেও একটা দীর্ঘ সময়সীমা পর্যন্ত আরবী ভাষা প্রচলিত ছিলো। যদিও পরবর্তীকালে নতুনভাবে স্থানীয় ফার্সী ভাষা আরবী ভাষার স্থান দখল করে, কিন্তু এ সময়ও ওলামায়ে কেরামের লেখার ভাষা ছিলো আরবী। ইরানে প্রায় সকল জ্ঞানগত বিষয় এবং ধর্মীয় গ্রন্থাদি আরবী ভাষায়ই লিখিত হয়েছে। এশিয়ার এ অঞ্চলে আরবী ভাষার সে অবস্থা ছিলো, মধ্যযুগে ইউরোপে ল্যাটিন ভাষার অবস্থা তাই ছিলো। তুর্কী যারা আরবদের রাজ্য জয় করেছে, তারাও আরবদের লিখন পদ্ধতিই গ্রহণ করেছে। আর এ সময় তুর্কীদের দেশে স্বল্প মেধা স্বল্প যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা পর্যন্ত খুব ভালোভাবে এবং সহজে কোরআন মজীদ বুঝতে পারতো।

অবশ্য ইউরোপের ল্যাটিন জাতি গোষ্ঠীসমূহ হচ্ছে একটি উদাহরণ, যেখানে আরবী ভাষা প্রাচীন স্থানীয় ভাষাসমূহের জায়গা দখল করেনি। কিন্তু ইউরোপের ল্যাটিন অঞ্চলেও মুসলমানরা নিজেদের প্রতিপত্তির তিনটি নিদর্শন রেখেছে–মোসিয়েডোজী ও মোসিয়ে ইংলেম্যান মিলে স্পেন এবং পর্তুগাল ভাষার সেসব শব্দ, যেগুলো আরবী ভাষা থেকে এসেছে, সেগুলোর একটা অভিধান তৈরী করে ফেলেন। ফ্রান্সেও আরবী ভাষা নিজের বিরাট প্রভাব রেখেছে।

ফরাসী মনীষী মোসিযে সুদী ইউ অত্যন্ত ঠিক কথাই লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, উদরন ও শোজম্যানদের ভাষাও আরবী শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তাদের নামের ধরন ধারণও আরবীর মতোই। ফরাসী ভাষার এক অভিধান প্রণেতা– যিনি শব্দসমূহের মূলধাতু সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন, ফ্রান্সে আরবদের অবস্থানের প্রভাব না বাকরীতির ওপর পড়েছে, আর না ভাষার ওপর পড়েছে।

এখানে ইউরোপীয় দেশসমূহে আরবী ভাষার যে প্রভাব প্রতিপত্তি ও বিস্তৃতির ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে, তাতেই প্রতীয়মান হয়, শেষোক্ত অভিধান প্রণেতার কথার মূল্য কতোটুকু। অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা, এখনও এমন কিছু শিক্ষিত মানুষ রয়েছেন, যারা এই অভিধান প্রণেতার মতো নিরর্থক আলোচনার পুনরাবৃত্তি করেন।

আলোচ্য ফরাসী অভিধান প্রণেতার নিরর্থক বর্ণনা তো স্বয়ং ইউরোপীয় মনীষী গেস্টাও লীবান প্রকাশ করে দিয়ে তাকে আর খণ্ডনযোগ্য রাখেননি। তবে আমরা গেস্টাও লীবানের সাথে এতোটুকু কথা যোগ করে বলতে চাই, জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার এ কাঙ্গাল অভিধান প্রণেতা হয়তো ইউরোপের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন, নতুবা স্বজাতির অন্যায় পক্ষপাতিত্বের কারণে মানুষকে বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করতে চেয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাস সাক্ষী, ইউরোপীয় দেশসমূহে ইসলাম প্রবেশের পর পঞ্চাশ বছরও অতিবাহিত হতে পারেনি, এরই মাঝে তথাকার সর্বসাধারণ অধিবাসী বার্বার এবং ল্যাটিন ভাষার কবর রচনা করে। ইউরোপীয় দেশসমূহে খৃষ্টান পাদ্রীরা নিজেদের ধর্মের নামায ও এবাদতে পঠিত বিষয়ের অনুবাদ আরবী ভাষায় করে তাদের জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করতেও বাধ্য হয়। *(গাবেরুল আন্দালুস ওয়া হাযেরুহা, পৃষ্ঠা ৩৮)*

সারকথা, মুসলমান শাসকরা ভাষা বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সাথে জনসাধারণের জীবনকে সহজ করার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইউরোপীয় জাতিসমূহের মতো মুসলমান শাসকরা জোর জবরদস্তি করে আরবী ভাষা গ্রহণে কাউকে বাধ্য করেননি। এদিক থেকে ইসলাম যেমন অপরাপর দ্বীনকে রহিত করে দিয়েছে, তেমনি আরবী ভাষাও অপরাপর ভাষাকে রহিত করে দেয়ার একটি স্বীকৃত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

বলতে পারেন? পূর্বযুগের মুসলমানরা আরবী ভাষার প্রচার প্রসারে এ প্রচেষ্টা কেন চালিয়েছেন? এ প্রচেষ্টার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তো প্রকাশ্য এবং সর্বজনবিদিত এবং তা হলো, শাসক শাসিতের মাঝে যোগাযোগ এবং অবাধ সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। তাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিলো, কোরআনের ভাষা মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলে তখন তাদের মাঝে কোরআনী স্বভাব চরিত্র এবং সামাজিকতাও ধীরে ধীরে সৃষ্টি হবে। সুতরাং আরবী ভাষার ব্যাপক প্রসারের ফলে এই উভয় লক্ষ্যই অর্জিত হয়। আজকাল ইউরোপ সব জান্তার গর্বে গর্বিত। তারা নিজেদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, নাগরিকতা ও রাষ্ট্রনীতির মালিক মোখতার বলে মনে করে। নীচের এ উদাহরণের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

ইউরোপীয় দেশসমূহে ইসলামী ভাষা সভ্যতা ও সংস্কৃতি

ইসলাম যখন ইউরোপীয় দেশসমূহে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে এবং স্পেন ও পর্তুগাল ইসলামের প্রাথমিক অবস্থানস্থলে পরিণত হয়, তখন অর্ধ শতাব্দী অতিবাহিত না হতেই স্থানীয় বার্বার ভাষা বিদায় গ্রহণ করে। স্পেন ও পর্তুগাল আরব দেশের একটি পরিবারে পরিণত হয়। শুধু ভাষার ক্ষেত্রেই নয়; বরং ইউরোপের সকল জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাহ্যিক ধরন ধারণ, সভ্যতা সংস্কৃতি ও সামাজিকতায় মুসলমানদের অনুকরণকে গর্বের বিষয় বলে ভাবতে থাকে। শুধু এ দেশ দুটোই নয়; বরং আশপাশের ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সমাজ সভ্যতাও এর নন্দিত প্রভাব প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকেনি।

শায়খ মোহাম্মদ কুর্দ আলী মিসরী– যিনি মিসরে মাজমায়ে এলমীর প্রধান, তিনি নিজের স্পেন সফরের বৃত্তান্তে স্পেন ও পর্তুগালে স্বচক্ষে দেখা ঘটনা এবং এ দুটি দেশের অতীত বর্তমানের একটি তুলনামূলক আলোচনা করে লেখেন–

শুধু সেসব দেশই ইসলামী ভাষা ও সামাজিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি, যেগুলো ইসলামের অধীনস্থ হয়েছে; বরং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দেশসমূহও ইসলামী ভাষা এবং সামাজিকতার প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি। জালালুকা, লিউতিউন ও নারযারিউন

www.nagorikpathagar.org

এলাকার সমঝদার মানুষেরা রীতিমতো আরবী ভাষা শিখতো। তারা মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতি ও সামাজিকতার প্রতি এতোটাই আকৃষ্ট ছিলো যে, নিজেদের ধর্মীয় মূলনীতিসমূহ পরিহার করে মুসলমানদের বাহ্যিক বেশ ভূষা, অভ্যাস আচরণ, রীতিনীতি গ্রহণ করতে শুরু করে এরা মুসলমানদের মতো নিজেদের মেয়েদেরও পর্দায় রাখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। *(গাবেরুল আন্দালুস ওয়া হাযেরুহা, পৃষ্ঠা ৩৯)*

দুখের বিষয়, আজ আমরা কি থেকে কি হয়ে গেলাম, কোথা থেকে কোথায় আমরা উপনীত হলাম! পূর্ববর্তীদের এ অযোগ্য অথর্ব উত্তরাধিকারীরা কিভাবে তাদের সম্মান মর্যাদার নিশানাটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলে অন্যদের গোলামীর জিঞ্জির নিজেদের হাতে গলায় পরে নিলাম। অযোগ্য অথর্ব এ উত্তরসুরিরা তাদের পূর্বসূরিদের স্থাপিত ইমারতের এক একখানা ইট এবং তাদের লাগানো গাছের একেকটি করে শেকড় সমেত উৎপাটিত করেছে। শত আফসোস! যেসব জাতিগোষ্ঠী আমাদের অনুকরণকে নিজেদের জন্যে গর্বের ধন ভাবতো, আজ আমরা তাদের অনুকারী অনুসারীতে পরিণত হয়েছি। আজ আমরা ভিন জাতির বাহ্যিক আচরণ ও বেশভূষা গ্রহণ করেছি, তাদের ভাষা গ্রহণ করেছি। আজ আমরা ইংরেজী ভাষার শব্দোচ্চারণকে গর্বের বিষয় ভাবছি। শুদ্ধ হোক আর না হোক, ভাঙ্গাচোরা অশুদ্ধ উচ্চারণ হলেও ইংরেজী ভাষার শব্দ বটে! সহেব বাহাদুরের অনুকরণের বিনিময় তো কখনো না কখনো মিলবেই! আজ আমরা ইউরোপীয়দের অনুকরণে আমাদের মেয়েদের ঘরের বের করে পুরুষের কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে দাঁড় করিয়েছি।

এ অবস্থা দৃষ্টে স্বাভাবিকভাবে মুখে কবিতার পংক্তি এসে যায়। কবিতার পংক্তিগুলো হচ্ছে–

'নাম লই আমরা সম্মানিতদের, অথচ সর্ববিষয়েই তাদের বিপরীত।

তাদের স্বভাব চরিত্রের নাম নিশানা মিটিয়েছি, স্বহস্তে খুইয়েছি তাদের সব গুণ বৈশিষ্ট্য।

চেহারা সুরতে বেশভূষায় আমরা তাদের বিপরীত,

অথচ সম্মানিতদের উত্তরাধিকারী হবার দাবী করছি।

সবার দৃষ্টিতে তোমরা হীন অপমানিত,

ভুল করেছো তো তোমাদের অপরাধ ক্ষমা হবে?

ইনসাফের সাথে বলো, তোমরাই কি সে সব পূর্বসূরির উত্তরসুরি?

যাদের নামে জগত ছিলো আলোকিত, বিশ্বময় যাদের করুণা ছিলো ব্যাপক।

যাদের অনুকরণকে অন্যেরা জানতো মর্যাদাকর, তারা ছিলো জগদ্বাসীর পছন্দনীয় সম্মানিত।

আজও অপমান অপদস্থতা থেকে যদি তোমাদের থাকে কোনো আশ্রয়,

তা হচ্ছে একমাত্র পূর্বসূরিদের আদর্শের অনুসরণ।'

আমরা মুসলমানরা প্রথমে ভিন জাতির বিশেষত ইউরোপীয়দের ভাষা ও বাহ্যিক বেশ ভূষা গ্রহণ করেছি এবং মনে করেছি, ঈমান ইসলামের সম্পর্ক তো অন্তরের

www.nagorikpathagar.org

সাথে। পোশাক আশাকের সাথে এর কি সম্পর্ক? বাহ্যিক বেশভূষা গ্রহণে সমস্যা কোথায়? কিন্তু অভিজ্ঞতা জানিয়ে দিয়ে গেছে, এটা ছিলো বিজলীর এক প্রবাহ, যা অন্তর ও মস্তিষ্কের ওপর মারাত্মকভাবে ছেয়ে গেছে এবং এরই মাধ্যমে ইংরেজীপনা ও খৃষ্টীয় স্বভাব আচরণ আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে আসন পেতেছে।

একজন মানুষ প্রথমে শুধু ইংরেজী জুতা ব্যবহার করে এবং ভাবে, এতে তো আমি ইংরেজ বনে যাইনি, কিন্তু স্বল্প কালের ব্যবধানে সে দেখতে পাবে, এ ইংরেজী জুতাই তার দেহ থেকে ইসলামী পোশাক পাজামা নামিয়ে টাখনুর নীচ পর্যন্ত প্যান্ট মার্কা পাজামা পরতে তাকে বাধ্য করবে। অতপর এ ইসলাম বিরোধী পাজামা তার দেহ থেকে ইসলামী জামা এবং আবা নামিয়ে দেবে। যখন দেখবে, দেহের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গসহ পার্লামেন্টের সদস্যরা পাশ্চাত্য রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে গেছে, তখন তার রাজার শিরমুকুটকেও বাধ্য হয়ে পার্লামেন্টের অধীনস্থ হতে হবে। ইংরেজী টুপি ইসলামী পাগড়ির স্থান দখল করবে। এবার যখন নিজেই বানোয়াট সাহেব বনে গেলো, তখন আর ঘরোয়া জীবনে প্রচলিত প্রাচীন রীতিনীতি ও রেওয়াজ প্রথা অবশিষ্ট রাখার কোনো দরকার নেই। এ কৃত্রিম সাহেব বাহাদুর এখন আর কোনো বিছানায় বসতে পারে না, দস্তরখানে বসে খেতে পারে না, বার বার নামাযের জন্য অযু করতে পারে না, নামাযে রুকু সাজদা করতে পারে না। ঘরের পুরনো ফার্নিচার বিদায়, পুরনো বেশভূষা বিদায়, রসম রেওয়াজ বিদায়, পবিত্রতা ও এবাদত বিদায়। দেখলেন তো! সামান্য এক জোড়া ইংরেজী জুতার আপদ কোথা থেকে কোথায় আপনাকে উপনীত করেছে এবং কিভাবে তা দ্বীন দুনিয়া সব কিছু বরবাদ করে ছেড়েছে।

প্রকৃতপক্ষে গোনাহের একটা ধারাক্রম রয়েছে। যখন মানুষ একটা গোনাহ করে, তখন দ্বিতীয় আরেকটি গোনাহ আপনা আপনি আগের গোনাহের পিছু নেয়। এক হাদীসে এসেছে, নেক কাজের তাৎক্ষণিক বিনিময় হলো, একটা নেক কাজের পর আরেকটা নেক কাজের তাওফীক মেলে। পক্ষান্তরে গোনাহের তাৎক্ষণিক শাস্তি হলো, এক গোনাহের পর আরেকটি গোনাহে জড়িয়ে পড়তে হয়। *(আদ দাওয়াউস সানী লি-ইবনে কাইয়েম)*

আমরা আজ ইংরেজদের যুলুম অত্যাচার এবং অহংকারপূর্ণ আচরণের অভিযোগ করি। তাদের মন্দ ভাবি এবং মন্দ বলি। তাদের বিরোধিতাও প্রকাশ করি, কিন্তু আফসোস! যেসব অভ্যাস আচরণ, স্বভাব চরিত্র, নৈতিকতা ও সামাজিকতার কারণে তারা ঘৃণার যোগ্য, তা আমাদের রগরেশায় সংক্রমিত হয়ে গেছে। ইংরেজদের হিন্দুস্তানের মাটি থেকে তাড়াতে অনেককেই কর্মতৎপর দেখা যায়, কিন্তু অন্তর ও মস্তিষ্ক থেকে ইংরেজীপনা, হাবভাব, আচার আচরণ এবং হাত ও গলা থেকে তাদের গোলামীর জিঞ্জির নামানোর জন্য কাউকেই তেমন আগ্রহী দেখা যায় না। অথচ ইংরেজকে হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়নের চাইতে ইংরেজীপনা পরিত্যাগ কোনো অংশে কম গুত্বপূর্ণ ছিলো না।

প্রকৃতই যদি আমাদের খৃষ্টান ইংরেজদের প্রতি ঘৃণাবোধ থাকে, তা হলে আমাদের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত আজই ইংরেজদের সর্বপ্রকার বেশভূষা, সামাজিক

www.nagorikpathagar.org

আচার আচরণ পরিত্যাগ করা, তাদের ভাষার ব্যবহারও প্রয়োজন এবং বাধ্যবাধকতার সীমা পর্যন্তই সীমিত রাখা, অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতীত ইংরেজী শব্দ ও ভাষা ব্যবহার না করা। যেসব স্থানে ইংরেজদের পলিসি আমাদের ইংরেজী ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে বাধ্য করে রেখেছে, সেসব ক্ষেত্রেও এ প্রচেষ্টা থাকা কর্তব্য, যেন কোনো হিন্দুস্তানী লোক ইংরেজের পলিসি গ্রহণে বাধ্য হয়ে না পড়ে। প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে যেন রেলওয়ে ও ডাকটিকেট এবং যাবতীয় কাজকারবার আমাদের দেশীয় ভাষায় সাধিত হয়, হিন্দুস্তানী বিচারালয়ের সিদ্ধান্তসমূহ যেন স্থানীয় ভাষায় লিখিত হয়, যাতে আমাদের অন্তর ও মস্তিষ্ক খৃস্টানদের প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে পবিত্র থাকে।

হাফেযে হাদীস আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র.) 'ইকতিদাউস সেরাতিল মুস্তাকীম' নামক স্বরচিত পুস্তিকায় ভাষার প্রভাব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যা বলেছেন তার মর্মার্থ হলো–

কোনো জাতির ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে পড়া মানুষের জ্ঞান বিবেক, নৈতিকতা ও দ্বীনের ওপর সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলে।

দুঃখের বিষয়! আজ মুসলমানদের দৃষ্টি এতোটাই ভাসাভাসা হয়ে গেছে যে, নিজেদের সম্মানিত পূর্বপুরুষের পরীক্ষিত অভিজ্ঞতালব্ধ মূলনীতি এবং তাদের বাতলানো রহস্য তাৎপর্য তাদের বুঝে আসে না। কোরআন হাদীসের বাণী শোনানো হলে মুসলমানদের অন্তর তা গ্রহণের জন্য অবারিত হয় না। পূর্বসূরি পুণ্যশীলদের প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি ও মূলনীতি বাতলানো হলে তা তাদের দৃষ্টিতে গুরুত্ব বহন করে না। তারা ওলামায়ে কেরামকে পরামর্শ দিচ্ছে, আরবী ভাষার যা কিছু প্রভাব প্রতিক্রিয়া এখনও বেঁচে আছে তাও মিটিয়ে ফেলা হোক, জুমুয়ার খোতবা স্থানীয় ভাষায় পড়া হোক। আরবী ভাষার নামও যেন কারো মুখে না আসে। তাই সর্বশেষ আমরা সে জাতির কতিপয় ঘটনা উপস্থাপন করছি, যে জাতির অন্ধ অনুকরণ আমাদের ভাইদের নানা বিপদ মসিবত, অপমান অপদস্থতা ও হীনমন্যতার শিকারে পরিণত করে রেখেছে।

বলতে পারেন, ব্যাপক প্রচার প্রচারণা সত্ত্বেও হিন্দুস্তানে শতকরা কয় জন লোক ইংরেজী জানে? অথচ ইংরেজ নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকৌশলের ভিত্তিতে সব অফিস আদালতের কাগজপত্র, রেলওয়ে ও ডাকটিকেট এবং সব কাজকারবারে ইংরেজী ভাষার প্রচলন করে রেখেছে। তাই স্বদেশী ভাষায় বিজ্ঞ হিন্দুস্তানীরাও আজ ইংরেজদের অফিসসমূহে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়ায়।

আপনি কি ভেবে দেখেছেন? কেন ইংরেজ এ কৌশল গ্রহণ করেছে? হিন্দুস্তানীদের ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় বাধ্যকরণে তাদের উদ্দেশ্য কি ছিলো? চিন্তাশক্তিকে কিছুটা কাজে খাটালে এ কর্মকৌশল গ্রহণের পেছনে ইংরেজদের আসল উদ্দেশ্য একেবারে খোলামেলা হয়ে দেখা দেবে। সে উদ্দেশ্য ছিলো, সাধারণ হিন্দুস্তানী, বিশেষত মুসলমানরা একটা দ্বীনী স্বভাব প্রকৃতির ধারক। মুসলমান কোনো কাফেরের দাসত্ব বরণ করবে, ইসলাম কখনো তাদের এ অনুমতি প্রদান করে না। ইসলাম তো

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানদের কাফের জাতিগোষ্ঠীর বেশভূষা এবং তাদের সামাজিকতা গ্রহণেরও অনুমতি দেয় না। এ কারণেই বর্তমান রাষ্ট্রশক্তি (ইংরেজ) নিজেদের এ কৌশল জাল বিস্তার করে মুসলমানদের ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় বাধ্য করেছে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করতেই মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতি, সামাজিকতা আপনা আপনি বদলে গেছে। সামাজিকতা বদলে যাবার সাথে সাথে মুসলমানদের কাছে তাদের নিজেদের জাতীয় ও দ্বীনী মানমর্যাদা অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হতে থাকে এবং ইংরেজদের সামাজিকতার বেড়ি গলায় পরাকে তারা এখন নিজেদের সৌন্দর্য ভেবে চলেছে।

স্পেনে আরবী ভাষা ও সংস্কৃতি নিশ্চিহ্নকরণ ও গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ

ইউরোপ থেকে আরবী ভাষা সংস্কৃতি ও সামাজিকতা নিশ্চিহ্ন করার পলিসি ইউরোপীয় খৃষ্টানদের আজকের নয়; বরং স্পেনের পতনের পর থেকেই তারা এ জঘন্য কাজটি শুরু করে। ইউরোপীয় দেশসমূহ মুসলমানদের যখন হাতছাড়া হয়ে খৃষ্টানদের কবলে চলে যায়, আর খৃষ্টানরা যখন সর্বপ্রকার জোর জবরদস্তি চালিয়ে মুসলমানদের নিজেদের সমমনা বানানোর শতাব্দীকালের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাফল্যের মুখ দেখতে পায়নি, তখন ইউরোপের জ্ঞানী গুণী অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এর কারণ অনুসন্ধানে লেগে পড়ে। এ উদ্দেশে যথারীতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিশনও গঠিত হয়। কমিশন এ মর্মে রিপোর্ট দেয়–

যদিও আমরা মুসলমানদের নিজেদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেছি, কিন্তু ইসলামী (আরবী) ভাষার মাদ্রসাসমূহে পঠন পাঠন শিক্ষাদান অদ্যাবধি আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। ইসলামী সামাজিকতা এবং সভ্যতা সংস্কৃতিও যথারীতি প্রচলিত রয়েছে। এটাই সবার মনমানসিকতা অধিকার করে আছে। এ কারণেই আমাদের সাথে তাদের কোনো সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে না। তাই যতো দিন পর্যন্ত ইসলামী ভাষা, ইসলামী গ্রন্থ সংগ্রহশালা এবং ইসলামী সামাজিকতা ও সভ্যতা সংস্কৃতি ইউরোপ থেকে নিশেষ করা না হবে, ততোদিন আমরা নিজেদের প্রচেষ্টায় সফলকাম হবো না।

কমিশনের এ রিপোর্ট ১৫০১ খৃষ্টাব্দে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই সরকারগুলো ইউরোপ থেকে ইসলামী নিদর্শনসমূহ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে নিজেদের যাবতীয় সহায় শক্তি ব্যয় করতে শুরু করে। এ বছরই কর্ডোভা ও গ্রানাডা থেকে এমন মুসলমানদের শূন্য হাতে বহিষ্কৃত হতে বাধ্য করা হয়, যাদের সম্পর্কে রাষ্ট্র সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, এরা নিজেদের ভাষা, সামাজিকতা ও সভ্যতা সংস্কৃতি কিছুতেই ত্যাগ করবে না।

১৫১১ খৃষ্টাব্দে কারভেনা কেসিমেন্স দেশের চতুর্দিক থেকে হাতে লেখা ইসলামী গ্রন্থসমূহ গ্রানাডার মাঠে স্তূপ করে। এ ছিলো মুসলিম বিশ্বের ইসলামী মনীষীদের কয়েক শতাব্দীকার অক্লান্ত কষ্টের ফসল, শরীয়তের এলেম, জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শন ও গণিত শাস্ত্রের জ্ঞানভাণ্ডার। অতপর এ যালেম দুরাচার এ বৃহৎ গ্রন্থস্তূপে অগ্নিসংযোগ

www.nagorikpathagar.org

করে । এতেই এ যালেম নিরস্ত হয়নি। সে কোনো ইসলামী গ্রন্থ রাখা আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে এবং কোথাও কোনো ইসলামী গ্রন্থ পাওয়া গেলে তা বাজেয়াপ্ত করার এবং জ্বালিয়ে দেবার সাধারণ নির্দেশ জারি করে। ঐতিহাসিকদের মতে দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেই ইউরোপীয় দেশসমূহ থেকে ইসলামী গ্রন্থের ব্যাপক সংগ্রহশালা নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়।

এ আলোচনা থেকে একদিকে যেমন আপনি ইসলামী শাস্ত্রসমূহের বিশ্বজনীন ব্যাপক প্রচার মানুষকে আকর্ষণের অনুমান করতে পারেন, অপর দিকে ইউরোপীয় খৃস্টানদের মানসিক অন্ধত্ব, হীন প্রকৃতি এবং ইসলামের সাথে শত্রুতা সম্পর্কেও একটা পরিমাপ করতে পারেন। আপনি এও পরিমাপ করতে সক্ষম হবেন, ইউরোপীয় খৃস্টানদের এ মানসিক অন্ধত্ব ও হীন রোষানলের কবলে পতিত এসব জ্ঞান বিজ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের এ বিশাল ভান্ডার বিশ্বের প্রত্যেক জাতির কাজে আজ গুরুত্বপূর্ণ রসদ হয়ে থাকতো। এসব ছিলো হাজার হাজার মুসলিম মনীষী বুদ্ধিজীবী ওলামায়ে কেরামের সমগ্র জীবনের অর্জন, এ ছিলো লক্ষ মতির ভান্ডার। এ হিংস্র নরপশুরা ইসলাম বিদ্বেষের কারণে এ জ্ঞান-ভান্ডারের সঙ্গে কেমন পশুসুলভ আচরণ করলো, তাও আপনি দেখতে পেয়েছেন। খৃস্টান নরপশুদের এ হিংস্র আচরণে খোদ ইউরোপের নিরপেক্ষ খৃস্টানরা পর্যন্ত মাতম করেছে। তাদের মাতমের কারণ এ নয় যে, তারা মুসলমানদের প্রতি করুণাশীল; বরং তাদের মাতমের কারণ, তারাও ইসলামী গ্রন্থসমূহ এবং ইসলামী জ্ঞানভান্ডারের ভীষণ মুখাপেক্ষী ছিলো।

(গাবেরুল আন্দালুস ওয়া হাযেরুহা)

১৫২৬ খৃস্টাব্দে হেস্পানিয়ার শাসক ফিলিপ তার শাসনাধীন এলাকায় নির্দেশ জারি করে, কেউ কোনো আরবী বাক্য উচ্চারণ করতে পারবে না। যেসব লোকের নাম আরবী রীতিতে রাখা হয়েছে সেগুলো বদলে ফেলতে হবে। যারা এ নির্দেশ মানবে না তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। সুতরাং এ আইনের অধীনে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে শূন্য হস্তে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়।

(গাবেরুল আন্দালুস ওয়া হাযেরুহা, পৃষ্ঠা ১৫৬)

সারকথা হচ্ছে, খৃস্টান এবং পাশ্চাত্য জাতি গোষ্ঠীগুলো এ রহস্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত, যার বদৌলত আমাদের পূর্বপুরুষরা মানুষের অন্তরে ইসলাম এবং আরব জাতি ও আরবী ভাষার প্রভাব স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তারা ইসলামী নিদর্শনসমূহ, ইসলামী ভাষা ও সামাজিকতা নির্মূল নিশ্চিহ্ন করার মাঝে নিজেদের সাফল্য নিহিত বলে মনে করে, কিন্তু দুখের বিষয়, ইসলামের নাম লওয়া ব্যক্তিরা আজ এ রহস্য হৃদয়ঙ্গমে অক্ষম; বরং খৃস্টান শাসক ফিলিপ আইনের শক্তিতে নিজের শাসিতদের দিয়ে যে কাজ করিয়েছে, আমাদের সরলপ্রাণ সাদাসিধা মুসলমানরা সানন্দে তা নিজেরাই সম্পাদন করে চলেছে। এ নয় যে, তারা ঘটনাচক্রে এ বিপদে ফেঁসে গেছে; বরং জীবনসংহারী এ হলাহলকে তারা নিজেরাই নিজেদের জন্যে জীবনদায়িনী এবং রোগমুক্তির দাওয়াই মনে করছে।

www.nagorikpathagar.org

ইয়া আল্লাহ! তুমি মুসলমানদের জ্ঞান বিবেক, বুদ্ধিসুদ্ধি দাও, তারা যেন খৃস্টানসহ পাশ্চাত্য জাতি গোষ্ঠীসমূহের কর্মকৌশলের রহস্য অনুধাবনে সক্ষম হয়ে ভিন জাতি গোষ্ঠীর ভাষা, সামাজিকতা, বাহ্যিক বেশভূষা অবলম্বন থেকে বেঁচে থাকে। আজ মুসলমানরা ইংরেজদের শাসক যালেমসুলভ প্রভাব কর্তৃত্ব নিজেদের ওপর থেকে হটাতে মোটেই সক্ষম নয়। তারা অর্থনৈতিক অক্ষমতা ও নানা বাধ্য বাধকতার কারণে ইংরেজ প্রভৃতি জাতি গোষ্ঠীর চাকরি বাকরি ত্যাগ করতে পারছে না, কিন্তু নিজেদের অন্তর, মস্তিক, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে ইংরেজের গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়ে ফেলতে তাদের কি অক্ষমতা রয়েছে? নিজেদের ব্যক্তিগত কাজকারবার আচার আচরণ এবং দৈনন্দিন কাজ কারবারে ইংরেজদের ভাষার ব্যবহার পরিহারে তাদের বাধা কিসের?

আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য এ আবেদন জানানো নয় যে, আপনারা ইংরেজী ভাষা একেবারেই ছেড়ে দিন এবং যেসব সরকারী পদ পদবী লাভ করা ইংরেজী ভাষা জানার ওপর নির্ভরশীল সেগুলো ছেড়ে দিন। আমাদের নিবেদন হচ্ছে, নিষ্প্রয়োজনে অক্ষমতা ব্যতিরেকে নিজেদের কাজকারবারে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করবেন না। দ্বিতীয়ত দেশের সব কাজকারবার স্থানীয় ভাষায় যেন সম্পাদন করা সম্ভব হয়, নিজেদের রাজনৈতিক দাবীতে এ দাবীও শামিল করুন। যদি আমরা এটা করি তা হলে হয়তো দ্বিতীয় পালাও আমাদের খুব কাছেই এসে যাবে, কিন্তু এসব প্রাচীন ধ্যান ধারণা আমি আজ কাকে বলবো আর কেই-বা শুনবে আমার কথা?

জাগতিক মসিবতসমূহ আল্লাহর রহমত না আযাব

কিছু কিছু হাদীস থেকে জানা যায়, দুনিয়ার মসিবতসমূহ আল্লাহর রহমত এবং ফযীলত মর্যাদার বিষয়। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, সবচাইতে বেশী আপদ বিপদ এসেছে আম্বিয়ায়ে কেরামের ওপর, এরপর এসেছে পর্যায়ক্রমে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ওপর।

আবার কোরআনের বহু আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায়, দুনিয়ার বিপদ মসিবতসমূহ আমাদের গোনাহেরই পরিণতি। কোনো কোনো আয়াত ও হাদীসে দুনিয়ার বিপদ মসিবতকে আল্লাহর গযব অসন্তুষ্টির নিদর্শন বলা হয়েছে। তাই ভেবে বিস্মিত হতে হয়, তাহলে প্রকৃত ব্যাপার কি? মানুষ যখন কোনো বিপদে পড়ে তখন সেটা আল্লাহর গযব অসন্তুষ্টি না রহমত, তা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কিভাবে বুঝবে।

কুতবে আলম হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (র.) এ জিজ্ঞাসার একটি উত্তম সমাধান করেছেন, যা আল্লামা ইবনে জাওযী (র.) স্বরচিত 'সেফওয়াতুস সাফওয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার মর্ম নিম্নরূপ–

হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (র.) বলেন, রোগব্যাধি ও বিপদ মসিবতের তিন অবস্থা, কোনো কোনো অবস্থায় তা আল্লাহর আযাব গযব, কোনো কোনো অবস্থায় তা গোনাহের কাফফারা এবং কোনো কোনো অবস্থায় তা মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ। এ অবস্থাগুলো হচ্ছে–

যদি রোগব্যাধি ও বিপদ মসিবতে রোগগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির আল্লাহ্ নির্ধারিত তাকদীরের ওপর ক্রোধ উষ্মা ও আর্ভযোগ সৃষ্টি হয়, তা হলে এ রোগ মসিবত আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

আযাব এবং ক্রোধের নিদর্শন। যদি রোগে মসিবতে ধৈর্য অবলম্বন করে তা হলে এটা হবে গোনাহের কাফফারা; আর যদি ধৈর্যের সাথে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি এবং অন্তরে স্বস্তি অনুভব হয় তা হলে এ বিপদ মসিবত ও রোগব্যাধি হবে মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ।

এ আলোচনা থেকে জানা গেলো, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও আওলিয়ায়ে কেরামের ওপর আপতিত বিপদ মসিবত হচ্ছে তৃতীয় প্রকারের, সর্বসাধারণ ঈমানদারের ওপর আপতিত আপদ মসিবত হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকারের এবং কাফেরদের ওপর আপতিত বিপদ মসিবত প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম প্রকারের বিপদ মসিবত থেকে যেন আল্লাহ তায়ালা সব মুসলমানকে হেফাযতে রাখেন, এটাই কামনা করি।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.)-এর রাত দিন

সম্ভবত এমন কোনো মুসলমান নেই যিনি হযরত আবু হোরায়রা (রা.) সম্পর্কে অবহিত নন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একজন মর্যাদাবান সাহাবী। তার জীবনে রাতগুলো ছিলো এক স্বতন্ত্র মর্যাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

পরিবারে তারা মোট তিন জন ছিলেন। একজন তিনি, একজন তার স্ত্রী, অন্যজন দাসী। তিনি রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে রেখেছিলেন। রাতের প্রথম তৃতীয়াংশে একজন জাগ্রত থেকে এবাদতে মশগুল থাকতেন। প্রথম এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে যিনি এবাদতের উদ্দেশে জাগ্রত রয়েছেন তিনি দ্বিতীয় জনকে উঠিয়ে দিতেন। দ্বিতীয় জনের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে তিনি তৃতীয় জনকে উঠিয়ে দিতেন। এভাবে পালাক্রমে তারা সারা রাত এবাদতে মশগুল থাকতেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.)-এর দিনগুলোও ছিলো এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সেকালে তিনি মারওয়ানের তরফ থেকে প্রাদেশিক কর্মকর্তা ও বিচারক নিযুক্ত ছিলেন। আদালত চলাকালে তিনি মানবসেবা এবং ন্যায়বিচারে মশগুল থাকতেন। আদালতের সময় শেষে উঠে লাকড়ির বোঝা তুলে আনতেন এবং অত্যন্ত নিসংকোচে উদার মনে বলে চলতেন, তোমাদের আমীর বা শাসকের জন্য রাস্তা প্রশস্ত করে দাও। *(সেফওয়াতুস সাফওয়া লে-ইবনে জাওযী-পৃষ্ঠা ১১৫)*

হযরত আহমদ বিন হাম্বল (র.)-এর খাদীসসমূহ

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) মুসলিম উম্মতের চার ইমামের একজন। যার অনুসরণে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছেন। তার ফযীলত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় উম্মতের বড়ো বড়ো আলেমের রচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ রয়েছে। এখানে তার কিছু বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, যা এলেম ও মারেফতের ভান্ডার এবং ঈমানের প্রাণশক্তি উজ্জীবনকারী।

১. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) বলেন, একবার আমি আল্লাহ তায়ালাকে স্বপ্নে দেখি। তখন আমি নিবেদন করলাম, ইয়া আল্লাহ! যেসব আমল বান্দাকে তোমার নিকটবর্তী করে, তন্মধ্যে সর্বোত্তম এবং বেশী উপকারী আমল কোন্‌টি? আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করলেন, কোরআন তেলাওয়াত। আমি নিবেদন করলাম, তোমার নৈকট্য

www.nagorikpathagar.org

অর্জনের এ মহা উপকারিতা কি শুধু কোরআন মজীদ বুঝে তেলাওয়াত করা অবস্থায়, নাকি বুঝা না বুঝা অবস্থার তেলাওয়াতেও পাওয়া যাবে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করলেন, বুঝে তেলাওয়াত করা হোক অথবা না বুঝেই হোক, সর্বাবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত আমার নৈকট্য লাভের মাধ্যম।

(সেফওয়াতুস সাফওয়া লে-ইবনে জাওযী, পৃষ্ঠা ২২৪)

'হাফেযে হাদীস ইবনে হাজার আসকালানী, ইমাম বায়হাকী, শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী, ইমাম ইবনে জাওযী, ইবনে নাসের প্রমুখ উচ্চস্তরের আলেম ও উম্মতের ইমামরা হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর জীবনচরিত এবং তাঁর ফযীলত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।'

(সেফওয়াতুস সাফওয়া, পৃষ্ঠা ৩৩৩)

২. কোনো কিশোর একাকী হাদীস শিক্ষা করতে এলে তিনি তাকে হাদীস পড়াতে অস্বীকার করতেন। যতোক্ষণ অন্য কেউ তার সাথে একত্র না হতো, ততোক্ষণ তিনি তাকে হাদীস পড়াতেন না। তিনি বলতেন, আল্লাহ তায়ালার মহা সম্মানিত নবী হযরত যাকারিয়া (আ.) কুদৃষ্টির বিপদ থেকে রক্ষিত থাকার জন্য বিয়ে করেছিলেন (তবে আমাদের কি ঠিক ঠিকানা আছে! আমাদের তো আরও বেশী করে এমন অবস্থা ও স্থান থেকে আত্মরক্ষা করে চলা উচিত, যেখানে কুদৃষ্টির বিপদে পতিত হবার সামান্যতম আশংকাও রয়েছে)। *(সেফওয়াতুস সাফওয়া)*

'হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.)-এর তাকওয়া ও সাবধানতা ছিলো অনুকরণের মতো। নিজের প্রবৃত্তির ওপর সর্বপ্রকারে শক্তিমান এবং তাকওয়ার উজ্জ্বল প্রতিকৃতি হওয়া সত্ত্বেও কোনো কিশোরকে একাকী হাদীস শিক্ষা দান করতেন না। দুখের বিষয়, আজকাল কুদৃষ্টিজনিত নৈতিক বিপদ মাহামারী আকারে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বসাধারণের তো কথাই নেই, বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করেন না।'

৩. একদিন তিনি তার এক ভাইকে পত্র লেখেন, অতপর হে ভাই, তোমার কি এখনও সে সময় আসেনি যে, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে শুরু করবে? অথচ আমাদের সম্মানিত পূর্বসূরি সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন প্রমুখের অবস্থা ছিলো, বয়স চল্লিশ বছরে উপনীত হলেই তারা সর্বপ্রকার চেনা পরিচয় ও মেলামেশা ছেড়ে দিতেন এবং অনেকেই হয়ে যেতেন জ্ঞানশূন্য, যাতে করে তারা সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাগ্র চিত্তে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন।

(সেফওয়াতুস সাফওয়া, পৃষ্ঠা ২২৬)

৪. তিনি বলতেন, দুটি অভ্যাস এমন যার চিকিৎসা খুবই দুষ্কর। মানুষ থেকে আশা ছেড়ে দেয়া, আর আমলে আল্লাহর জন্য এখলাস (নিষ্ঠা) সৃষ্টি করা।

৫. তিনি বলতেন, যার জ্ঞান বুদ্ধি বাড়ানো হয় তার রেযেক কম করে দেয়া হয়।

৬. তিনি বলতেন, প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়া অন্বেষণ দুনিয়ার লোভের সংজ্ঞায় পড়ে না।

www.nagorikpathagar.org

৭. তিনি বলতেন, যমযমের পানি খোশবুর মতো। শরয়ী ওযর ব্যতীত যেমন খোশবু ফিরিয়ে দেয়া সুন্নতের খেলাফ, তেমনি যমযমের পানি ফিরিয়ে দেয়াও আদবের খেলাফ।

৮. তিনি বলতেন, ঋণ সম্পর্কে যখন হাদীসে বলা হয়েছে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মৃতের দায়িত্বে ঋণ থাকে ততোক্ষণ তার আত্মা ঝুলতে থাকে। ঋণের অবস্থাই যদি এই হয় তা হলে গীবত বা পরনিন্দার কি অবস্থা হবে? ঋণ তো আদায়ের সুযোগ আছে। মৃতের পক্ষ থেকে ওয়ারিসরাও তা আদায় করে দিতে পারে। পক্ষান্তরে গীবতের ঋণ আদায় করা সম্ভব হয় না। আমাদের দায়িত্বে যদি কারো ঋণ থাকে আর সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তা হলে আমরা তা তার ওয়ারিসদের আদায় করে অথবা ক্ষমা করিয়ে দায়িত্বমুক্ত হতে পারি, কিন্তু যদি আমরা কারো গীবত করি এবং যার গীবত করা হয়েছে সে যদি মারা যায়, তাহলে আমরা যদি তার সব ওয়ারিসকে এমনকি সমগ্র দুনিয়ার মানুষকেও রাযি করিয়ে নেই এবং সকলের কাছেও ক্ষমা চেয়ে ফিরি, তবু গীবতের দাবী আমাদের ওপর থেকে রহিত হবে না।

সম্মানিত ইমামের উল্লিখিত উক্তি থেকে বুঝা গেলো, মুসলমানের সম্মান মর্যাদা তার সম্পদের চাইতে বেশী সম্মানযোগ্য।

৯. তিনি বলতেন, হযরত খেযের (আ.) হযরত মূসা (আ.)-কে অসিয়ত করেছিলেন, কখনও কোনো গোনাহগারকে গোনাহের কারণে লজ্জা দেবেন না, তাকে তুচ্ছ নিকৃষ্ট ভাববেন না।

১০. তিনি বলতেন, এলেম হয়তো তোমাকে উপকার দেবে, না হয় তোমার অবশ্যই ক্ষতি করবে। এমন ভেবো না, এলেম দ্বারা উপকার হলো না তো ঠিক, ক্ষতিও তো নেই। যে এলেম উপকার দেয় না তা অবশ্যই ক্ষতিকর।

১১. তিনি বলতেন, এলেম সন্ধানী ছাত্রকে ততোক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানী বুদ্ধিমান বলা যায় না, যতোক্ষণ না সে নিজেকে সকল মুসলমান থেকে ছোট মনে না করবে।

১২. তিনি বলতেন, যদি কেউ তোমার অধিকার হরণ করে এবং মামলা মকদ্দমা ব্যতীত তা উসূলের কোনো আশা না থাকে, তাহলে এ অধিকার ছেড়ে দাও। কেননা, এতেই তোমার দ্বীনের হেফাযত নিহিত রয়েছে।

১৩. তিনি বলতেন, প্রথম যুগে যাদের বদ আমল ভাবা হতো, তারা এ যুগের পুণ্যশীল এবং মোত্তাকীদের চাইতে অনেক উত্তম।

২৪১ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) ইনতেকাল করেন। ইনতেকালের পর ইমাম মোহাম্মদ ইবনে খোযায়মা (র.) তাঁকে স্বপ্নে দেখেন, তিনি আনন্দ স্ফূর্তিতে চলাফেরা করছেন। ইমাম মোহাম্মদ ইবনে খোযায়মা (র.) অবস্থা জিজ্ঞেস করলে বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে মাফ করে দিয়েছেন, তিনি আমাকে সোনার মুকুট এবং সোনার জুতা পরিয়েছেন। আরও বললেন, এ সম্মান পুরস্কার সে স্বাতন্ত্র্য ও সহিষ্ণুতার কারণে, যা তিনি 'খালকে কোরআনের' ফেতনার সময় কাজে লাগিয়েছেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে আহমদ!

www.nagorikpathagar.org

আজ তুমি পুনরায় সেসব শব্দ দ্বারা দোয়া করো, যা তুমি সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে লাভ করেছ, যে শব্দগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তুমি আমার কাছে দোয়া করেছিলে। দোয়াটি হচ্ছে–

ইয়া রাব্বা কুল্লা শাইয়িন আসআলুকা বেকদরাতেকা আলা কুল্লে শাইয়িন ইল্লা তাসআলুনী আন শাইয়িন ওয়াগফেরলী কুল্লা শাইয়িন।

এ দোয়ার পর আল্লাহ তায়ালা বললেন, আহমদ! এই তো সামনেই জান্নাত– যাও, তাতে প্রবেশ করো।

ইয়া ইলাহাল আলামীন! এ সম্মানিত ইমামের সাথে তুমি আমাদের সব মুসলমানকেও মাফ করে দাও।

হযরত ইয়াহইয়া বিন মোআয রাযী (র.)

হযরত ইয়াহইয়া বিন মোয়ায রাযী (র.) বলতেন, মানুষের যাবতীয় বিরোধ মতভেদের মূল হচ্ছে তিনটি। আবার এ তিনটির বিপরীত তিনটি বিষয়ও রয়েছে। যে তিনটি মূলের একটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সে এর বিপরীতটিতে জড়িয়ে পড়ে। সে তিনটি মূল হচ্ছে তাওহীদ, সুন্নত ও এবাদত আনুগত্য। এ তিন মূলের বিপরীত হচ্ছে যথাক্রমে শেরেক, বেদয়াত ও গোনাহ।

হযরত আবুল কাসেম নসরাবাদী (র.)

হযরত আবুল কাসেম নসরাবাদী (র.) বলেন, তাসাওউফের মূল কথা হচ্ছে নিজের জন্যে শুধু কিতাব ও সুন্নত অত্যাবশ্যক করে নেয়া, বেদয়াত ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে বেঁচে থাকা, মাশায়েখে তরীকতের সম্মান মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখা, মানুষের অসুবিধার ওপর নযর রাখা, ওযিফার ওপর আমল করা এবং অবকাশজনিত বিষয়সমূহ পরিহার করা।

মূল গ্রন্থকার বলেন, মাশায়েখে সূফিয়ার চল্লিশের অধিক বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে, জ্ঞানী সমঝদারদের জন্যে তাই যথেষ্ট। এর ওপরই আমরা ক্ষান্ত করছি। নতুবা এ সম্মানিত জামায়াতের মনীষীদের থেকে এ ধরনের যেসব বাণী বর্ণিত রয়েছে, সেগুলো একত্রিত করতে হলে বিরাট এক দফতরের প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা এসব সম্মানিত ব্যক্তির কল্যাণ বরকতের সাথে আমাদেরও সুন্নত অনুসরণের তাওফীক দিন এবং সব ধরনের বেদয়াত থেকে রক্ষা করুন।

হযরত মোহাম্মদ ইবনুল হাসান শায়বানী (র.) সংকলিত গ্রন্থ মাবসূত

হযরত ইমাম মোহাম্মদ ইবনুল হাসান শায়বানী (র.) এ উম্মতের সেসব ইমামদের একজন, যাদের এলেম ও বদান্যতা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে জনশ্রুতির মতো ছড়িয়ে আছে। তার নাম পরিচয় এবং সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে কোনো মুসলমানেরই অনবহিত থাকার কথা নয়। তিনি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র এবং স্বয়ং গবেষক ইমাম ছিলেন। তার সংকলিত মহা মর্যাদাপূর্ণ অসংখ্য গ্রন্থ সর্বদাই মুসলমানদের গর্বের

www.nagorikpathagar.org

ধন বলে বিবেচিত হয়েছে। আর বলতে গেলে তার গ্রন্থসমূহই হানাফী ফেকাহর ভিত্তি। তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত একটি গ্রন্থ হচ্ছে 'মাবসূত'। এটি হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত ছয় খণ্ডে সমাপ্ত একটি বিশাল জ্ঞানভান্ডার।

সম্প্রতি আমার (মুফতী শফী) সম্মানিত ওস্তাদ, শায়খুত তাফসীর ও শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (র.) 'আল মুফতী' নামক সাময়িকীতে ছাপার জন্যে ইমাম মোহাম্মদ (র.) প্রণীত কিতাব 'মাবসূত' সম্পর্কে এক সুন্দর কাহিনী ডাবেল থেকে লেখে পাঠিয়েছেন। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হচ্ছে–

সম্প্রতি শায়খ মোহাম্মদ যাহেদ বিন হাসান আল কাওসারী প্রণীত 'বুলুগুল আমানী ফী সীরাতে মোহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ শায়বানী' কিতাবখানা (মিসরে মুদ্রিত) এক বন্ধু আমার জন্যে হাদিয়া হিসাবে পাঠিয়েছেন। কিতাবখানা অধ্যয়নের সময় একটি ঘটনা আমার নযরে পড়ে। তখনই তা আমার 'আল মুফতী'তে ছাপার কথা মনে আসে। ঘটনাটি লম্বা চওড়া কিছু নয়, তবে অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী। আশা করি ঘটনাটি পড়ে পাঠকরাও আনন্দিত হবেন। ঘটনাটি হলো, ইমাম মোহাম্মদ ইবনুল হাসান শায়বানী (র.) সংকলিত মাবসূত গ্রন্থের আলোচনায় দেড় লাইনের একটি পাঠ, যার অর্থ নিম্নরূপ–

আহলে কিতাবের একজন বড়ো আলেম ইমাম মোহাম্মদ (র.)-এর গ্রন্থ 'মাবসূত' অধ্যয়ন করেন। এ কিতাবের অধ্যয়ন এ আহলে কিতাব আলেম মনীষীর অন্তরে ইসলামের সত্যতার দৃঢ় বিশ্বাস ও ভিত্তি সৃষ্টি করে দেয় এবং তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে বলেন, যখন তোমাদের মোহাম্মদ আসগর (ছোটো মোহাম্মদ) ইমাম মোহাম্মদ ইবনুল হাসানের গ্রন্থের অবস্থাই এমন, তখন তোমাদের মোহাম্মদ আকবর (বড়ো মোহাম্মদ) রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কিতাবের অবস্থা কেমন হবে। *(হযরত মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (র.))*

ফকীহদের মতভেদপূর্ণ বিষয়ে একটি নাকি একাধিক মত সঠিক

ফকীহদের মতভেদপূর্ণ বিষয়ে একটি মতই সঠিক না একাধিক মত– এটি প্রসিদ্ধ একটি এলমী গবেষণার বিষয়। যেসব মাসয়ালায় গবেষক ইমামদের অভিমত বিভিন্ন, এক ইমাম এক বস্তুকে হালাল এবং অন্য ইমাম হারাম বলে অভিহিত করেছেন, আর এ ব্যাপারে জাতিও একমত যে, উভয় ইমামই সত্যপন্থী। প্রত্যেক অনুসারীরই স্ব স্ব ইমামের অভিমত অনুসারে আমল করা জায়েয (বরং কারো কারো মতে ওয়াজেব)। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, কোনো গবেষক ইমামের নিজের গবেষণার আলোকে কোনো জিনিসকে হালাল বা হারাম বলায় আল্লাহর কাছেও কি সে বস্তু হালাল বা হারাম হওয়া অবধারিত হয়ে যায়? অথবা সত্য কি একটাই। এ বিষয়ে শাস্ত্রবিদ ওলামায়ে কেরামের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। দীর্ঘকাল সম্ভবত বছর বিশেক পূর্বে আমার ওস্তাদ, দারুল উলূম দেওবন্দের মোহতামেম হযরত আল্লামা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (র.) এ বিষয়ের ওপর 'হাদইয়ায়ে সুন্নিয়া' নামক একটি পুস্তক রচনা করেন। পুস্তিকাটি তখন মুদ্রিতও হয়েছিলো।

www.nagorikpathagar.org

সম্প্রতি তিনি ইমাম মোহাম্মদ ইবনুল হাসান (র.)-এর ওপর প্রণীত পুস্তিকা 'বুলুগুল আমানী' থেকে এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তকর লেখা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে দান করেছেন। সম্মানিত ওস্তাদের পাঠানো 'বুলুগুল আমানী'র সিদ্ধান্তকর অংশবিশেষ এ গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালার সর্বোত্তম সমাধান বলে আমি মনে করি। তাই আমি (মুফতী শফী) 'হাদইয়ায়ে সুন্নিয়া' পুস্তিকার দ্বিতীয়বার মুদ্রণের অপেক্ষা না করেই 'আল মুফতী' সাময়িকীতে এ লেখার অনুবাদ ছেপে দেয়াই সমীচীন মনে করি, যাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবার সামনে এসে যায় এবং 'হাদইয়ায়ে সুন্নিয়া' পুস্তিকা দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হওয়ার সময় পরিশিষ্ট হিসাবে খুব সহজে এটা সেখানে যুক্ত করে দেয়া যায়। তদুপরি 'বুলুগুল আমানী'র মূল পাঠও এ মাসয়ালায় সমাধানপ্রাপ্তির জন্যে উপকারী সাব্যস্ত হবে। পাঠক এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। এখানে 'বুলুগুল আমানী' থেকে সে অংশের অনুবাদ পেশ করা হচ্ছে।

ইবনে আবিল আওয়াম (র.) ইমাম তাহাবী থেকে, তিনি সোলায়মান বিন শোয়ায়ব লাকসানী থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ইমাম মোহাম্মদ ইবনুল হাসান (র.) আমাদের শ্রুতিলিখন পদ্ধতি শিখিয়েছেন। শ্রুতিলিখনে তিনি বলেছেন, যখন মানুষ কোনো মাসয়ালায় পরস্পর বিরোধী অভিমত পোষণ করে, এক ফকীহ এক জিনিসকে হারাম এবং আরেক ফকীহ হালাল বলেন, আর উভয় ফকীহই এজতেহাদ বা গবেষণাকর্মের অধিকার রাখেন, তখন আল্লাহর কাছে হারাম বা হালাল অভিমতের মধ্য থেকে একটাই সঠিক হয়। আর মোজতাহেদ (গবেষক) হালাল বা হারাম নির্ধারণে নিজ নিজ গবেষণাকর্ম ব্যয় করতে আদিষ্ট হন, যাতে তিনি সে সত্যে উপনীত হতে পারেন যা আল্লাহর কাছেও সত্য। সুতরাং কোনো গবেষক ফকীহ যদি নিজের গবেষণাকর্মে সে সত্যে উপনীত হতে পারেন যা আল্লাহর কাছেও সত্য, তা হলে গবেষণালব্ধ সত্যের ওপর আমল করারও তার জন্যে অনুমতি রয়েছে। আর তিনি যে বিষয়ে আদিষ্ট ছিলেন তাও যথারীতি পালন করলেন, কিন্তু যা আল্লাহর কাছে সত্য বলে নির্ধারিত, গবেষক ফকীহ যদি সে সত্যে পর্যন্ত উপনীত হতে না পারেন, তবে তিনি যে বিষয়ে আদিষ্ট ছিলেন তা তো পালন করেছেন এবং এ জন্যে তিনি সওয়াবের যোগ্য হবেন।

তবে কারো এটা বলা দুরস্ত নয় যে, এক ইমাম এক মেয়েলোককে বিয়ে করা হালাল এবং অন্য ইমাম হারাম বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং আল্লাহর কাছে উভয় অভিমতই ঠিক; বরং এক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে একটাই সঠিক। অবশ্য এরূপ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে ফকীহ দল নিজেরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছেন। কেননা, তারা নিজেদের সাধ্য পরিমাণ গবেষণা চালিয়েছেন, তাই নিজেদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের ওপর আমল করা তাদের জন্যে জায়েয। যদিও উভয় গবেষকের একজন প্রকৃত সত্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু যেহেতু তিনি নিজের প্রচেষ্টা ও শক্তি সামর্থ ব্যয় করেছেন, তাই তিনি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। যদিও বাস্তবতার বিচারে মনে হয় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। কেননা, মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহর কাছে একটাই

www.nagorikpathagar.org

সঠিক। আর এটাই ইমাম আযম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত, এটাই হচ্ছে আমাদের মাযহাব।

ফ্যাশনপূজারী মহিলাদের জন্যে ফ্যাশন আবিষ্কারকদের ফতোয়া

ইসলাম নারীকে যেমন ঘরের সৌন্দর্য সাব্যস্ত করেছে, তেমনি এর চাইতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে যেন নারী রাণী, সন্তানের প্রতিপালনকারী, প্রশিক্ষক, ঘর গৃহস্থালী সম্পর্কিত বিষয়ের ব্যবস্থাপক এবং শালীন চালচলন ও আচরণের প্রতিকৃতি সাব্যস্ত হয়। কোরআন হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং উপদেশমূলক ঘোষণা, মাতৃজাতির কর্মপদ্ধতির নমুনা সব কিছু এ একই উদ্দেশে উপস্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইউরোপ প্রসূত অন্তর ও মস্তিষ্কে ইসলামের শিক্ষা কোনো প্রভাব প্রতিক্রিয়া করে না। অধুনা নারী ফ্যাশনের আবিষ্কারক এবং নারী স্বাধীনতার প্রবক্তা ইউরোপ নারী স্বাধীনতা ও নারীর ফ্যাশন পূজায় মাতাল হয়ে ওঠেছে। তাই এখন ইউরোপের ফতোয়াই দেখুন। এখানে নারী স্বাধীনতা ও নারীর ফ্যাশন পূজায় ইউরোপের জনজীবন কতোটুকু সংকীর্ণ আর উত্ত্যক্ত হয়েছে, এ সম্পর্কে এক ইউরোপীয় প্রবন্ধকারের প্রবন্ধের অনুবাদ উপস্থাপিত হচ্ছে।

'আমি এটা দেখে দেখে বিস্মিত হচ্ছি, ইউরোপের নারী সমাজ কি হতে কি হয়ে গেলো! তারা যাবতীয় মানবীয় বৈশিষ্ট্য পরিহার করেছে, যা বিগত যুগে নারী জাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিত ছিলো। এখন না নারী জাতির মাঝে সে সরলতা আর সাদাসিধা জীবনাচার আছে, আর না আছে প্রীতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের মনোভাব। যুগের বিবর্তনে ইউরোপীয় নারী সমাজও বিবর্তিত হয়ে পড়েছে। তারা স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য ছেড়েছুড়ে এখন বান্ধবীর বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করেছে। নিসন্দেহে বান্ধবীর বৈশিষ্ট্য স্ত্রীর চাইতে বেশী আকর্ষণীয়। এ বৈশিষ্ট্য আমাদের কিছুটা মানসিক আকর্ষণের কারণ তো হতে পারে, কিন্তু নারীর বান্ধবীর গুণ বৈশিষ্ট্য দ্বারা আমরা সামাজিক স্বস্তি শান্তি কখনো অর্জন করতে পারবো না। যদি আমরা সামাজিক স্বস্তি শান্তি কামনা করি, তা হলে আমাদের প্রয়োজন গাম্ভীর্যপূর্ণ গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একজন স্ত্রীর– বান্ধবীর নয়।

বর্তমান কালে স্ত্রী জীবনের যে দিকের ওপরই আপনি দৃষ্টিপাত করুন, শুধু বানোয়াট এবং বাহ্যিক সাজসজ্জাই আপনি দেখতে পাবেন। বর্তমানকালের স্ত্রী আপনাকে অসাধারণ প্রেম প্রীতি ভালোবাসা প্রদর্শন করবে, কিন্তু এ প্রেম প্রীতি ভালোবাসা বাস্তবে কিন্তু তা নয় যা আপনাকে দেখানো হচ্ছে। বর্তমানকালের স্ত্রীদের প্রদর্শিত প্রীতি ভালোবাসা একটা আর্ট বা কলাকৌশলমাত্র, যা দ্বারা স্বামীদের শুধু বোকাই বানানো হয়। স্ত্রীরা স্বামীদের যে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা দেখায়, যদি বাস্তবেই তা হতো, তা হলে ইউরোপে শতকরা একশ' বিয়ের পরিণতিই তালাকে পর্যবসিত হতো না। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমানকালের ইউরোপীয় স্ত্রীদের প্রীতি ভালোবাসায় এক প্রকার আর্ট বা কলাকৌশলে রূপান্তরিত হয়েছে। তারা এখন স্বামীপ্রবরদের সম্মুখে

www.nagorikpathagar.org

একজন সুযোগ্য অভিনেত্রীর মতো তাদের অভিনয়টুকুই করে যাচ্ছে মাত্র। প্রীতি ভালোবাসার এখানে কোনো গুরুত্ব নেই।

দুই একজন নয়, আমি হাজারো নারীকে দেখেছি, যাদের আপনি নিজ নিজ স্বামীর প্রেমে ডুবুডুবু, পাগলপারা দেখতে পাবেন, কিন্তু আমি যখন তাদের ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে গভীর নিরীক্ষণ করি, তখন জানতে পারি, তাদের প্রেম প্রীতি ভালোবাসার সবচাইতে বড়ো অধিকারী স্বামী নয়, অন্য কেউ। এ অন্য কেউ প্রকাশ্যত তো বন্ধু বনে আছে, কিন্তু বাস্তবে সে-ই হয় প্রীতি ভালোবাসা প্রদর্শনকারিণী নারীর মনোযোগ আকর্ষণের আসল কেন্দ্রবিন্দু। এ চিত্র কি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে না যে, ইউরোপীয় স্ত্রীকুল বর্তমানে এক পেশাদার প্রেমিকায় পরিণত হয়েছে।

বর্তমানকালের স্ত্রীদের পোশাকের ওপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, মনে হবে, তাদের পরিহিত পোশাকের উদ্দেশ্য দেহ আচ্ছাদিত করা নয়; বরং দেহকে আরো লোভনীয় ও আরো দৃষ্টি নন্দিত করে তোলা এবং দেহের কিছু অংশ উলঙ্গ করে পুরুষের সুপ্ত অনুভূতিকে উদ্দীপিত করা। একজন পুণ্যবতী স্ত্রী, শুধু স্বামীই যার একমাত্র উদ্দেশ্য, স্বামীর মনোরঞ্জনই যার একমাত্র লক্ষ্য, তার সুপ্ত অনুভূতি উদ্দীপিত করার মতো পোশাকের কি দরকার? পাশ্চাত্যে এ সব কিছু যে উদ্দেশে করা হচ্ছে তা প্রকাশ্য, আর এ উদ্দেশ্য এতোটাই কালো কুৎসিত, যা নারীর অস্তিত্বই নিশেষ করে দিচ্ছে।

সভ্যতা সংস্কৃতি, সামাজিকতা এবং চিত্তবিনোদনের দৃষ্টি থেকেও অনেক কষ্টেই আপনার কোনো একজন স্ত্রী দৃষ্টিগোচর হবে। প্রত্যেক স্ত্রীই আজ প্রেমিকা বনে আছে। প্রত্যেক স্ত্রীরই একান্ত বাসনা, স্বামী যেন তাকে মা হতে বাধ্য না করে। একটুখানি ভেবে দেখুন এর পরিণামটা। নারী যদি মা-ই না হতে চায়, তা হলে তার অস্তিত্বের প্রয়োজনই বা কি? যদি তার অস্তিত্বের অন্য কোনো প্রয়োজন স্বীকার করে নেয়া হয়, তা হলে সে কারণটা কি, যা তাকে মা হতে বারণ করছে? সন্তান জন্মদানে অস্বীকৃতির কারণ একটাই হতে পারে এবং তা হচ্ছে, বর্তমানকালের স্ত্রী একজন প্রেমিকার মতোই দৃষ্টিনন্দিত সুন্দরী কমনীয় হয়ে থাকতে চায়। অথচ একজন স্ত্রীর প্রকৃত সৌন্দর্য হচ্ছে তার মা হওয়া।

ইউরোপের ক্রমবর্ধমান এ সয়লাব প্রতিহত করা প্রত্যেক বিবেকবান মানুষের জন্যেই ফরয–অবশ্য করণীয়। নারীর প্রেমিকাপনা যৌবনে হয়তো ভালোই লাগবে, কিন্তু যৌবনের সীমিত কয়েকটি বছর পার হয়ে গেলে তখন আর কোনো প্রেমিকার দরকার হবে না, তখন দরকার হবে একজন একনিষ্ঠ জীবনসাথীর। দরকার হবে একজন ভালো জীবনসঙ্গিনীর, কিন্তু আমরা বর্তমানে যে অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি, সেখানে একজন ভালো জীবনসাথী, জীবনসঙ্গিনী এখন হারিয়ে যাওয়া বস্তু। এ যুগে ভূমিতে উৎপন্ন পোকামাকড়ের মতো প্রেমিকাপনাসম্পন্ন নারী পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু শালীন ভদ্র পুণ্যবতী স্ত্রী পাওয়া দিনে দিনে অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

www.nagorikpathagar.org

ইউরোপবাসীর হাস্যকর ওয়াকফ

সর্বপ্রকার জনকল্যাণমূলক বিষয়ের মতো ওয়াকফের প্রচলন ও সাংগঠনিক রূপের উদ্ভাবনও করেছে ইসলাম। ইসলাম প্রথম ঘরটিকেই ওয়াকফ বলে অভিহিত করেছে। ঘোষণা করা হয়েছে–

'নিঃসন্দেহে প্রথম ঘর যা সৃষ্টিকুলের জন্যে হেদায়াত।' *(সূরা নেসা, আয়াত ৯৬)*

মানুষ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হবে এবং তার আমলের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখনও যেন তার কাছে সওয়াব পৌছতে পারে, এ উদ্দেশে শরীয়তে ওয়াকফের বিধান রাখা হয়েছে। দুনিয়ার অপরাপর জাতিগোষ্ঠীও ইসলামী শরীয়তের ওয়াকফ বিধানের অনুকরণ করেছে এবং নিজেদের গির্জা, এবাদতখানা ও দর্শনীয় নিদর্শনসমূহের জন্যে ওয়াকফ-এর ব্যবস্থা করেছে। এ সব ওয়াকফের সওয়াব লাভ করা কতোটুকু সম্ভব তা অবশ্যই চিন্তার বিষয়। ওয়াকফ একটি দ্বীনী বিষয়, তাই এর ব্যয় খাত অবশ্যই বিবেক বুদ্ধিসম্মত হওয়া উচিত। ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর মানসিক ভারসাম্যহীনতা এমন রূপ ধারণ করেছে যে, তার কোনো কিছুই বিবেক বুদ্ধির অনুকূল নয়। তাই সেখানে যদি ওয়াকফ করাও হয় তবে তা হয় কুত্তার নামে, বিড়ালের নামে। তাই নিচের ঘটনাটি পড়ুন এবং উপদেশ গ্রহণ করুন। যারা ওহী এবং নবুওয়তের আলোর অনুসরণ করে না, তারা পদে পদে কেমন হোঁচট খায় এবং কিভাবে দুনিয়া আখেরাতে তাদের আমল বরবাদ হয়।

যখন ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ ধনবতী মিসেস এম সি ওহেল রোগাক্রান্ত হয়, তখন সে অসিয়ত করে, তার সমুদয় সম্পদ কুত্তাগুলোর জন্যে রেখে যাবে। মহিলার অসিয়ত মোতাবেক তার যাবতীয় সম্পদের মালিক হবে কতোগুলো কুকুর। এ মহিলার পরিত্যক্ত সম্পদ দ্বারা কুত্তার লালন-পালন এবং বংশবৃদ্ধির কাজ সবই একটি ট্রাস্টের অধীনে চালু রয়েছে। *(আখবারে দ্বীন ও দুনিয়া, দিল্লী, ৪ঠা জুলাই, ১৯৩৭ ইং)*

(বর্তমানে যা ঘটছে তার তুলনায় ৭০ বছর আগেকার ৫ খবরটির কিইবা গুরুত্ব আছে, এখন তো এ ধরনের ঘটনা সেখানে হাজার হাজার ঘটছে। –অনুবাদক)

ইমাম শাফেয়ী (র.) হারুনুর রশীদের দরবারে

ইমাম শাফেয়ী (র.) এলেম অন্বেষণে দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করেছেন। তার ভ্রমণকাহিনী তার কোনো কোনো ছাত্র সংরক্ষণও করেছেন। এ ভ্রমণকালে তিনি একবার বাগদাদেও গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি যখন বাগদাদে প্রবেশ করি তখনই এক গোলাম আমার সঙ্গ নেয় এবং নিতান্ত শালীনতা ও গাম্ভীর্য সহকারে আমাকে জিজ্ঞেস করে,

আপনার নাম কি?

আমি বললাম, মোহাম্মদ।

গোলামটি আমার পিতার নাম জিজ্ঞেস করলে বললাম, ইদরীস।

অতপর সে বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করলে বললাম, শাফেয়ী।

বংশ পরিচয় শাফেয়ী শুনে গোলাম জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি মোত্তালেবী।

www.nagorikpathagar.org

আমি বললাম, হাঁ।

গোলামটি এসব প্রশ্নের উত্তর একখানা ফলকে লেখে নেয়, ফলকটি তার আস্তিনেই ছিলো। এর পর সে আমাকে ছেড়ে চয়ে যায়। আমি বাগদাদের এক মাসজিদে অবস্থান নেই এবং চিন্তা করতে থাকি, গোলামটি কেন আমাকে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো, কেনই বা সে এরূপ অনুসন্ধান করলো এবং এর প্রতিক্রিয়াই বা কি হতে পারে? এসব চিন্তা ভাবনায় অর্ধেক রাত কেটে যাবার পর মাসজিদের দরজায় জোরে করাঘাতের শব্দ শুনতে পাই। এতে মাসজিদে অবস্থানরত সব লোক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। দরজা খোলা হলে আগন্তুক লোকটি ভেতরে প্রবেশ করে খুব অভিনিবেশ সহকারে একেক করে সকলের চেহারা দেখতে থাকে। অবশেষে সে আমার কাছে আসে। আমি বললাম, ভেবো না। তুমি যাকে খুজে ফিরছো, আমিই সে লোক। সে বললো, আমীরুল মোমেনীন (হারূনুর রশীদ) আপনাকে স্মরণ করেছেন। আমি একথা শুনে কোনো প্রকার আগ পাছ না ভেবে অবিলম্বে তার সঙ্গে চললাম।

আমি আমীরুল মোমেনীনকে দেখে সুন্নত মাফিক সালাম করি। তিনি আমার সালামের রীতি পছন্দ করেন এবং অনুভব করেন, দরবারী লোকেরা সালাম দিতে যেসব লৌকিকতা করে তা ভুল। সুন্নতসম্মত সালামদান পদ্ধতি এটাই। তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ধারণা করেন, আপনি বনী হাশেমের লোক? আমি বললাম, আমীরুল মোমেনীন! আপনি যা'ম শব্দ বলবেন না (অধিকাংশ সময় সন্দেহযুক্ত অথবা এমন বিষয় যা মিথ্যা হওয়ার বেশী আশংকা রয়েছে, তা বুঝাতে আরবী ভাষায় 'যা'ম' শব্দ ব্যবহৃত হয়। কেননা, শব্দটি কোরআনে সর্বত্র বাতিল ধারণা বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে)। আমীরুল মোমেনীন এ কথা প্রত্যাহার করে 'তাকুলু' (তুমি বলছো) শব্দটি ব্যবহার করেন। তখন আমি জবাব দিলাম– হাঁ।

আমীরুল মোমেনীন আমার বংশসূত্র জিজ্ঞেস করেন, জবাবে আমি হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত আমার পুরো বংশসূত্র বলে দেই, যা আমার মুখস্থ ছিলো।

আমীরুল মোমেনীন বললেন, কথায় এমন বিশুদ্ধতা ও আলংকারিকতা শুধু বনী আবদুল মোত্তালেবের লোকদেরই হতে পারে। এর পর বললেন, আমি আপনাকে কাযীর (বিচারক) পদ সমর্পণ করতে চাই। বিনিময়ে আমি আমার সমগ্র রাজত্ব এবং ব্যক্তিগত সম্পদের অর্ধাংশ আপনাকে দেবো। সকলের ওপর আপনার ও আমার নির্দেশ নির্ধারিত শর্ত মোতাবেক প্রযোজ্য হবে। আপনার সব নির্দেশের মূল হবে কোরআন হাদীস ও এজমায়ে উম্মত (উম্মতের ঐকমত্য)।

আমি বললাম, আমীরুল মোমেনীন! যদি আপনি ইচ্ছা করেন, আমি সমগ্র ধন সম্পদ ও রাজরাজত্বের বিনিময়ে বিচার বিভাগের এতোটুকু কাজ করবো যে, সকালে বিচারালয়ের দরজা খুলবো এবং সন্ধ্যায় বন্ধ করে দেবো, তা হলেও কেয়ামত পর্যন্ত এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত হবো না। এ কথা শুনে হারূনুর রশীদ কাঁদতে শুরু করেন। বললেন, আচ্ছা! আপনি আমার কিছু হাদিয়া কবুল করুন। আমি বললাম, আপত্তি নেই। তবে নগদ হতে হবে, ওয়াদা যেন না হয়।

www.nagorikpathagar.org

আমীরুল মোমেনীন হারূনুর রশীদ আমাকে এক হাজার দেরহাম প্রদানের নির্দেশ জারি করেন এবং আলাপচারিতার মজলিসেই এ এক হাজার দেরহাম আমি আমার করায়ত্তে নেই। দরবার থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় সেখানকার সেবক পরিচর্যাকারী দলের লোকেরা বললো, আপনার প্রাপ্ত পুরস্কার থেকে আমাদেরও কিছু দিন। যেহেতু আমার কাছে চাওয়া হয়েছে, তাই আমার মনুষ্যত্ববোধ এর চাইতে কমের ওপর তুষ্ট হতে পারেনি যে, তাদের যতো জন ছিলো সকলকে হাদিয়ারূপে প্রাপ্ত সব মাল সমভাগে বন্টন করে দেই। নিজেও একভাগ রাখি, পরিমাণে যা তাদের একজনের সমান। *(রেহলাতুশ শাফেয়ী)*

উম্মতের ইমাম, আলেম এবং পূর্বযুগের ওলামায়ে কেরামের জীবনচরিত পড়ুন। তাঁদের সংসারবিরাগ, আল্লাহর জন্যে সব কিছু ত্যাগ করা, পরিতুষ্টি, শাসকদের ব্যাপারে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ, যে সম্পদে দ্বীনের জন্যে বিপদাশংকা রয়েছে তা থেকে বেঁচে থাকা এবং যা কিছু হালাল পন্থায় মানসিক হীনমন্যতা ব্যতীত লাভ করা যায় তার মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

পূর্বযুগের ওলামায়ে কেরামের কিছু প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি

মানুষের সাথে মেলামেশা ও দূরে থাকার ভারসাম্যপূর্ণ হুকুম

হযরত আকসুম বিন সাইফী (র.) বলেন, মানুষজনের সাথে আচার আচরণে সংকীর্ণতা প্রদর্শন, তাদের সাথে রূঢ়তা শত্রুতার কারণ হয়। পক্ষান্তরে তাদের সাথে খোলামেলা সানন্দ মেলামেশা মন্দ সহচরদেরও একত্র করে দেয়। তাই সংকীর্ণতা ও খোলামেলা সানন্দ মেলামেশার মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা গ্রহণ করা উচিত।

(তাম্বীহুল মুগতাররীন লিশ শা'রানী, পৃষ্ঠা ১৮)

সুন্নতের অনুসরণ হচ্ছে সবচাইতে বড় তাকওয়া

একবার হযরত ফারূকে আযম (রা.) সংবাদ পান, অমুক অঞ্চল থেকে যে কাপড় আসে তাতে অপবিত্র বস্তু ব্যবহৃত হয়। তিনি ঘোষণা করিয়ে দিতে চাইলেন, মানুষ যেন এ কাপড় ব্যবহার না করে। এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, আমীরুল মোমেনীন! এ কাপড় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগেও আসতো এবং সব সাহাবাই এ কাপড় পরিধান করতেন। খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ কাপড় দ্বারা শরীরের সৌন্দর্য বর্ধন করতেন। হযরত ফারূকে আযম (রা.) তৎক্ষণাত নিজের ইচ্ছা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এস্তেগফার করেন। বললেন, যদি এ কাপড় পরিহার করা তাকওয়া হতো, তা হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কখনো তা ব্যবহার করতেন না। *(তাম্বীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা ৭)*

প্রমাণহীন সন্দেহের ওপর আমল করতে বারণ করার কারণ হচ্ছে, ইসলাম যেভাবে মানব সমাজকে পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার নযিরবিহীন শিক্ষা প্রদান করেছে, অনুরূপ সন্দেহ সংশয় থেকেও তাদের রক্ষা করেছে। শুধু প্রচলিত সাধারণ ধারণার ওপর নির্ভর করে প্রাপ্ত কাপড়ের ওপর অপবিত্রতার হুকুম আরোপ করা হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

এ ঘটনার অনুরূপ একবার হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (র.) ছেলেকে বললেন, আমাকে একখানা কাপড় তৈরী করে দাও, যে কাপড় পরে আমি সব সময় প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারি। কেননা, আমি দেখতে পাচ্ছি, মাছিগুলো অপবিত্র বস্তুর ওপর বসে এবং পরে উড়ে এসে আমার কাপড়েও বসে। ছেলে কতোই না উত্তম জবাব দিয়েছে। বললো, আব্বা! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তো এরূপ করেননি; বরং তাঁর একখানা কাপড়ই থাকতো, যা পরেই তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনও পূর্ণ করতেন এবং নামাযও আদায় করতেন। সম্মানিত ইমাম ছেলের কথার মূল্যায়ন করে নিজের খেয়াল পরিত্যাগ করেন।

বিনয়ের মোড়কে অহংকার

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি জনসমাবেশে নিজের দীনতা হীনতা বর্ণনা করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের প্রশংসাই করে। আর প্রবৃত্তির প্রতারণাপূর্ণ কৌশল হচ্ছে, সে মানুষকে দিয়ে নিজের প্রশংসা করিয়ে সন্তুষ্ট হতে চায়। তাই সে নিজেই নিজের দীনতা হীনতা বর্ণনা করার পন্থা আবিষ্কার করেছে। এটাও রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার এক প্রকার।

সন্তানদের শিক্ষাদানের কাজ আল্লাহর হাতে সমর্পণ

হযরত শায়খ আদুল ওয়াহহাব শা'রানী (র.) বলেন, প্রথম দিকে আমার ছেলে আব্দুর রহমানের এলেম শিক্ষার প্রতি তেমন আগ্রহ ছিলো না। এ কারণে আমার মন অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। আমি সব সময় পেরেশান থাকতাম। আল্লাহ তায়ালা আমার মনে এ ভাব জাগ্রত করে দিলেন, আমি যেনো বিষয়টা তাঁর কাছেই সমর্পণ করি। আমি তাই করলাম। সে রাত থেকে আল্লাহর অনুগ্রহে আমার ছেলের এলেম শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আমার বলা ব্যতিরেকে সে নিজে নিজেই এলেম অর্জনে চেষ্টা করতে থাকে এবং এ ব্যাপারে নিজের সহপাঠীদের থেকে সে অগ্রসর হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা খুব বড় একটা কষ্ট থেকে আমাকে শান্তি স্বস্তি দান করলেন। হযরত ইমাম শা'রানী (র.) বলেন, আমি আমার শায়খ হযরত আলী খাওয়াস (র.)-কে বলতে শুনেছি, 'সন্তানের ব্যাপারে মনের মতো প্রশিক্ষণের বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা, অনুপস্থিতিতে তাদের জন্যে দোয়া করা আলেম ও নেককারদের সন্তানদের জন্যে আর কিছুই এতো উপকারী নয়। *(তাম্বীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা ৮)*

নিয়ত সহীহ করা আমল সহীহ করার চাইতে বেশী জরুরী

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, জান্নাতবাসীর জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীর জাহান্নামে প্রবেশ তাদের আমলের কারণে হবে। জান্নাতী জাহান্নামী উভয় দলের চিরকালের জন্যে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে থাকা হবে শুধু নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। কেননা, জান্নাতীদের নিয়ত ছিলো, যদি তারা চিরস্থায়ীভাবে দুনিয়ায় থাকতো তা হলে আল্লাহর এবাদত করতো। পক্ষান্তরে জাহান্নামীদের নিয়ত ছিলো, তারা চিরকাল জীবিত থাকলে কুফুর ও শেরেক করতো। *(তাম্বীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা ৯)*

www.nagorikpathagar.org

কোন্ আমল পরিমাণে অধিক ?

তাওরাতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, আমি যে আমল কবুল করবো তাই অধিক এবং যে আমল ফিরিয়ে দেবো, কবুল করবো না, তাই কম। যদিও দেখতে তা অনেক হয়। *(তাম্বীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা ৯)*

শিক্ষাদান ও ওয়ায কেমন লোকের অধিকার?

হযরত শাদ্দাদ বিন হাকীম (র.) বলেন, যার তিনটি অভ্যাস রয়েছে সে শিক্ষাদান ও ওয়াযের যোগ্য। যার এ তিন অভ্যাস নেই তার শিক্ষাদান ও ওয়ায ছেড়ে দেয়া উচিত।

অভ্যাস তিনটি হচ্ছে– (১) মানুষকে আল্লাহর নে'মতসমূহের কথা স্মরণ করাবে, তাহলে তারা শোকর আদায় করবে, (২) মানুষদের গোনাহ স্মরণ করাবে, তা হলে তারা তাওবা করবে, (৩) তাদের শয়তানের শত্রুতা সম্পর্কে সাবধান করবে, যাতে তারা শয়তানের প্রতারণাপূর্ণ কৌশল থেকে সংরক্ষিত থাকবে।

(তাম্বীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা ১০)

বাগদাদের এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য

বাগদাদ কয়েক শতাব্দীকাল ধরে মুসলমান খলীফা ও রাজরাজড়াদের কেন্দ্রীয় রাজধানী ছিলো। তাই স্বভাবত বাগদাদেই খলীফা, শাসক ও রাজরাজড়াদের মৃত্যু হওয়ার কথা, কিন্তু বাগদাদের এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ মর্যাদাপূর্ণ কেন্দ্রীয় রাজধানীতে কোনো খলীফা, বাদশা বা শাসকের মৃত্যু হয়নি। সবার মৃত্যুই হয়েছে বাগদাদের বাইরে।

বাগদাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা আবু জাফর মনসুরের মৃত্যু হয়েছে হজ্জের সফরে। তাকে মক্কা মোকাররমার হাজূন পাহাড়ের কাছে দাফন করা হয়। খলীফা মাহদী মাসুবযানে, খলীফা হাদী ঈসাবাদে, খলীফা হারূনুর রশীদ তূসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মামুনুর রশীদ রোমের শহর বাযুনদুনে মৃত্যু কবলিত হন। তাদের অধস্তন বংশধরদের মধ্যে যে কয়জন বাদশাহ হয়েছেন, কারো মৃত্যুই কিন্তু বাগদাদে হয়নি; হয়েছে অন্য কোনো শহরে। অবশ্য আমীন সম্পর্কে বলা হয, তিনি বাগদাদে নিহত হয়েছেন। তবে সঠিক অভিমত হচ্ছে, তিনিও খাস বাগদাদ শহরে নিহত হননি। তিনি তখন বাগদাদের বাইরে ছিলেন। এ ঐতিহাসিক বিস্ময়ই বাগদাদী কবি মনসুর নামেরী স্বরচিত দুই পংক্তি কবিতায় প্রকাশ করেছেন। যার অর্থ নিম্নরূপ–

আপনি কি পৃথিবীর দৈর্ঘে প্রস্থে বাগদাদের মতো কোনো শহর দেখেছেন?

নিঃসন্দেহে বাগদাদ হচ্ছে ভূস্বর্গ।

এ শহরের মালিক নির্দেশ করেছেন, কোনো শাসক বাদশাই এ শহরে মরবে না।

নিঃসন্দেহে নিজের সৃষ্টিকুলের মাঝে তিনি যা ইচ্ছা নির্দেশ করেন।

(তারিখে বাগদাদ লিল খতীব, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৮)

(বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হিন্দু এবং অন্যান্য কল্পনাপূজারী জাতিসমূহের মাঝে কোথাও যদি এমনটি হতো যে, মর্যাদাপূর্ণ কেন্দ্রীয় রাজধানীতে কোনো শাসক বা বাদশাহ মারা না

www.nagorikpathagar.org

যেতেন, তাহলে তারা এমন শহরের পূজাপাট শুরু করে দিতো। আল্লাহই জানেন, কল্পনাপূজারী জাতি গোষ্ঠীসমূহ এমন ঐতিহাসিক বিস্ময়কে আশ্রয় দিয়ে কি সব বাতিল বিশ্বাস আর খেয়াল গড়ে নিতো। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরই এ জ্ঞান বিবেক ও বোধশক্তি দান করেছেন। তারা প্রত্যেক বিষয়কেই সীমার মধ্যে রাখে। আলেম দার্শনিকদের ছাড়িয়ে একজন কবিত্ব চিন্তার ধারক ব্যক্তিত্বও ঘোষণা করেছেন, বাগদাদে কোনো খলীফা, শাসক বা রাজা বাদশাহ মৃত্যু কবলিত হন না, এতে বাগদাদের মাটি বা আবহাওয়ার কোনো প্রভাব নেই; বরং এ সবই রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তেই হয়ে থাকে, যাঁর করায়ত্তে সকল প্রাণীর জীবন। তিনিই বাগদাদ শহরকে এমন আজব ফযীলত মর্যাদা দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এক সময় তা বদলে দেবেন এবং জান্নাতী পরিবেশপূর্ণ ভূমিকে মৃত্যুর ঘাটি বানিয়ে দেবেন।

আবু জাফর মনসুর ও রোমক দূতের মধ্যকার আলাপচারিতা

খলীফাতুল মুসলেমীন আবু জাফর মনসুর যখন বাগদাদ শহরের নির্মাণ কাজ শেষ করে এ শহরকে রাজধানী বানান, তখন এক রোমক দূত বাগদাদে আসে। এ রোমক দূত খলীফা আবু জাফর মনসুরকে বললেন, জাহাঁপনা! আপনি এমন এক শহর বানিয়েছেন, যা আপনার পূর্বে কারো দ্বারাই সম্ভব হয়নি, কিন্তু আপনার নির্মিত এ শহরে তিনটি ত্রুটি রয়েছে। প্রথমত, শহর থেকে পানি অনেক দূরে, আর পানি মানুষের সবচাইতে বেশী প্রয়োজনীয় বস্তু। দ্বিতীয়ত, মানব প্রকৃতি সব সময় সবুজ সজীবতা পছন্দ করে, এ শহর নির্মাণে মানব প্রকৃতির এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। এখানে কিছু গাছগাছালি এবং বাগবাগিচার ব্যবস্থা থাকলে সুন্দর হতো। তৃতীয়ত, আপনার প্রজাকুল আপনার সঙ্গে একই শহরে বাস করছে। যে শাসক প্রজাসাধারণের সাথে গুলিয়ে মিলিয়ে বাস করে, তার গোপনীয়তা কখনো গোপন থাকতে পারে না।

মনসুর বললেন, তুমি যা বলেছো তা খুব একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। তোমার প্রথম ত্রুটির জবাব হচ্ছে, প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থা শহরের মাঝেই রয়েছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো বস্তুর চিন্তা করা নিরর্থক। তোমার দ্বিতীয় ত্রুটি– সবুজ সজীবতা ও বাগবাগিচা না থাকা, এর জবাব হচ্ছে, আমরা নিষ্প্রয়োজনে ঘুরে ফিরে বেড়ানো, চিত্তবিনোদন ও খেল তামাশার জন্য সৃষ্টিই হইনি। তোমার তৃতীয় ত্রুটি– আমার গোপনীয়তা ফাস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, এ ব্যাপারে আমার কথা হচ্ছে, আমার গোপনীয়তা বলতে এমন কিছু নেই যা আমাকে প্রজাদের থেকে লুকাতে হবে। আমার প্রজাকুলের সবাই আমার সন্তানদের মতো। তারা আমার গোপনীয়তারও সমভাগী।

মনসুরের চিন্তধারা স্বস্থানে ঠিকই ছিলো। অতপর যুগপরিক্রমা রোমক দূতের পরামর্শের কিছু কিছু কার্যকর করতে বাধ্য করেছে। পরবর্তীতে বাগদাদের সর্বসাধারণ অধিবাসীকে কারখ এলাকায় স্থানান্তর করা হয় এবং দাজলা থেকে দুটি খাল কেটে বাগদাদ শহরে পানি আনা হয়। *(তারীখে বাগদাদ লিল খতীব, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৮)*

www.nagorikpathagar.org

আবু জাফর মানসুরের শাসনকাল পর্যন্ত বাগদাদের কোনো দোকান ঘরের ওপর সরকারী ট্যাক্স ছিলো না। তার পরে মাহদীর শাসনকালে তিনি আবু ওবায়দুল্লাহর পরামর্শক্রমে দোকানের ওপর ট্যাক্স আরোপ করেন।

(তারীখে বাগদাদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৮০)

জনৈক উদারমনা বাগদাদী সাকী

হযরত যুননূন মিসরী (র.)-এর এক দুশমন একবার তার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। এর ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করে বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি হাতকড়া এবং পায়ে জিঞ্জিরবদ্ধ অবস্থায় শাহী মহলের নীচে পড়া ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি চরম পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। চিন্তা করছিলেন কাকে নিজের এ দুরবস্থার কথা বলবেন আর কেইবা তার আবেদন শুনবে। তিনি এরূপ চিন্তায় যখন নিমগ্ন। তখন হঠাৎ করে অত্যন্ত সুন্দর পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি সামনে আসেন। তার হাতে কাচের পেয়ালা আর বগলে পানির মশক। হযরত যুননূন মিসরী (র.) ভাবলেন, এ হয়তো রাজকীয় সাকী হবে। সে আমার কথা কি শুনবে, কিন্তু মানুষজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন, এ কোনো দরবারী লোক নয়; বরং সর্বসাধারণ মানুষকে পানি পান করানোই তার কাজ। তিনি লোকটির কাছে পানি চাইলে সে অত্যন্ত আদব সম্মানের সাথে তাকে পানি পান করতে দেয়। হযরত যুননূন মিসরী (র.) অত্যন্ত খুশী হয়ে তাকে একটি দীনার প্রদান করেন, কিন্তু সে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়।

হযরত যুননূন মিসরী (র.) দীনারটি গ্রহণের জন্য তাকে বার বার অনুরোধ করতে থাকেন। সে বলল, আপনি একজন কয়েদী। কোনো কয়েদী থেকে কিছু লওয়া মানবতা ও মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। হযরত যুননূন মিসরী (র.) এ সাকীর উদার মনস্কতায় বিস্মিত হন। তিনি বলতেন, মানবিকতা উদারতা শিখতে হলে বাগদাদী সাকী থেকে শেখো। *(তারীখে বাগদাদ লিল খতীব)*

ইউরোপবাসীর দৃষ্টিতে ইউরোপীয় সভ্যতা

ইসলাম প্রথম দিন থেকেই মানুষকে সরল সহজ অনাড়ম্বর সামাজিকতা শিখিয়ে আসছে। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের উত্তম জীবনাদর্শ এবং ইসলামের পূর্বযুগের অনুসারীদের কর্মপদ্ধতি সরল সহজ অনাড়ম্বর সামাজিকতার দিকনির্দেশনাই প্রদান করে। যতোদিন পর্যন্ত মুসলমানদের ভাগ্যলিপিতে কল্যাণ নির্ধারিত ছিলো, ততোদিন পর্যন্ত তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং পূর্বযুগের মুসলমানদের কর্মপদ্ধতিরই অনুসারী ছিলো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকাল মুসলমানরা নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে ইউরোপীয় জাতিসমূহের অন্ধ অনুকরণ শুরু করেছে। যাদের সাকুল্য বিদ্যা ও দ্বীন ধর্ম প্রবৃত্তি পূজা এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো স্পৃহা পূরণ, আয়েশ বিলাস সামগ্রীর প্রাচুর্য ঘটানো ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের কোরআন হাদীসের বাণী শোনানো হলেও তারা সেদিকে কর্ণপাত করে না। ইসলামী ইতিহাসের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হলে তাকে সংকীর্ণতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা ভাবে। তাই আমরা এখন নানা ফ্যাশনের আবিষ্কারক

www.nagorikpathagar.org

এবং আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক বাহকদের সত্যায়িত সিদ্ধান্তই উদ্ধৃত করে চলেছি, যা আধুনিক সংস্কৃতির ধারক বাহকরা এর কুফল এবং অনিষ্ট ভোগের পরই প্রচার করেছে।

ইউরোপের অন্ধ অনুসারীদের জন্য ইউরোপের ফতোয়া–

ইংল্যান্ডের স্বাস্থ্য ও জীবন নবায়ন সংস্থা নিজেদের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য কিছু মৌলিক সিদ্ধান্ত করে তা সাধারণ্যে প্রচার করেছে। এগুলো সংস্থার সব সদস্যের কাছেই পৌছানো হয়েছে। ইংল্যান্ডের এ সংস্থার সিদ্ধান্ত করা মূলনীতিসমূহ দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'চশমায়ে হায়াত' নামক সাময়িকীর ১৯৩৮ ইং সনের মার্চ সংখ্যায় ছাপা হয়। তা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় উদ্ধৃত করছি, যা সুস্পষ্ট ইসলামী শিক্ষার অনুরূপ। ইউরোবাসী অনেক হোঁচট খেয়ে এবং নানা ক্ষতির শিকার হয়ে অবশেষে এসব মূলনীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এটা মুসলমানদের জন্যে শিক্ষা যে, বিশ্বের অন্যান্য জাতিসমূহ ইসলামের সৌন্দর্য ও কল্যাণকারিতা হৃদয়ঙ্গম করে ইসলামের দিকে আসছে। আর মুসলমান অন্যদের অন্ধ অনুসরণকেই উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ বলে ভাবছে। আল্লামা রূমী (র.) বলেন– তোমার মাথায় টুকরি ভরা রুটি, অথচ তুমিই এক টুকরা রুটির জন্য এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছো!

ইসলামী সামাজিকতা–রসূল (স.)–এর ঘোষণা

খাদ্য এবং পানীয় ঃ ভাবীকালে আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও হবে যারা বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় দ্রব্য এবং কাপড় একত্র করবে। তারা হবে আমার উম্মতের নিকৃষ্টতম লোক। *(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১১১)*

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, শোয়ার সময় দরজা বন্ধ করে দাও, খাদ্যপাত্র ঢেকে রাখো, পানপাত্রসমূহ এবং মশক ও কলসীর মুখ বন্ধ করে দাও। *(কানযুল ওম্মাল মোসনাদে আহমদ সূত্রে, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩)*

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, শোবার সময় তোমরা বাতি নিভিয়ে শোও। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাধারণ অভ্যাস ছিলো, নিষ্প্রয়োজনে রাতের বেলা বাতি ব্যবহার করতেন না। এমনকি তাহাজ্জুদ নামাযের সময়ও আলো বাতির আবশ্যকতা ভাবা হতো না। হযরত আয়েশা (র.) বলেন, সে যুগে ঘরে চেরাগ বাতি ব্যবহারের এমন রীতি ছিলো না যে, তা ছাড়া কাজই চলবে না। আজকাল আধুনিক সভ্যতা সর্বত্র রাতকে দিন বানিয়ে রেখেছে। এই সভ্যতার অন্ধ অনুসারীরা এবং যারা বিদ্যুতকে সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করে, তারা পশ্চিমাদের কথা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

পোশাক ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ পোশাক ছিলো কোর্তা ও লুঙ্গি। কখনও পোশাক হতো দুখানা চাদর– একখানা গায়ে জড়ানোর জন্যে এবং একখানা পরার জন্যে। কখনও কখনও জুব্বাও তারা ব্যবহার করতেন। সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ পাজামা ব্যবহার করতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পাজামা পছন্দ করেছেন। তাদের এ সব

www.nagorikpathagar.org

পোশাকই হতো ঢিলাঢালা। আঁটসাট পোশাক পরা তাদের পছন্দনীয় ছিলো না। আঁটসাট পোশাক যে ফিরিঙ্গীদের আবিষ্কার, তারাই আজ একে স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর বলছে। অনরূপ রাবার ও রাবারজাত দ্রব্য তাদেরই আবিষ্কৃত গর্বের ধন, যেসব দ্বারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষদের স্বাস্থ্য সুস্থতা বিনষ্ট করার পর এখন তার অনিষ্টকারিতার স্বীকারোক্তি করা হচ্ছে। ইউরোপের অনুসারী প্রগতিবাদীরা দেখুক, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতের বিপরীতে ইউরোপ থেকে তারা কি গ্রহণ করেছে। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতের রিপরীতে ক্ষতিকর এবং দুর্মূল্যের সওদাই খরিদ করেছে, যা আজ স্বয়ং ইউরোপের দৃষ্টিতেই অপছন্দনীয় হয়ে গেছে। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা! উপদেশ গ্রহণ করো। গাঢ় রংয়ের কাপড় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পছন্দনীয় ছিলো না। তিনি এরশাদ করেন– তোমরা সাদা কাপড় ব্যবহারে অভ্যস্ত হও। তোমাদের জীবিতরাও এ কাপড় ব্যবহার করবে এবং মৃতদেরও এ কাপড় দিয়ে কাফন দেবে। সাদা কাপড় হচ্ছে সর্বোত্তম পোশাক। *(কানযুল ওম্মাল, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮, হাকেম, মোসনাদে আহমদ ইত্যাদির সূত্রে)*

সামাজিকতার সাধারণ মূলনীতি

খাদ্য ঃ সাদাসিধা খাদ্য খাবার খাও। বেশী ক্ষুধা লাগার পরই খাও। উত্তেজক খাদ্য খেয়ো না; বরং শুধু শরীরে শক্তি সামর্থ বজায় রাখে এমন খাদ্য খাও। সাধারণভাবে এক ধরনের খাদ্যদ্রব্যই খাও। খাদ্যদ্রব্য ঢেকে রাখো, যাতে রোগজীবাণু, মাটি, ধুলাবালি, মাছি এবং উড়ন্ত পোকামাকড় পড়তে না পারে। খোলা অবস্থায় রাখা খাদ্য খাবে না। বিশেষত সেসব খাদ্য খাবে না যেগুলোর রং, গন্ধ এবং স্বাদ বিগড়ে গেছে।

পানি ঃ পানির পাত্র ঢেকে রাখা কর্তব্য। কোনো পাত্রে দীর্ঘ দিন থেকে পানি রাখা অনুচিত। অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় মৌসুমী পরিবেশ পরিস্থিতিই বলে দেবে, কোন্ পাত্রে কতোদিন পর্যন্ত পানি রাখা স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর।

আলো ঃ অপ্রাকৃতিক কৃত্রিম আলোর ব্যবহার যতো কম করা যায় ততোই উত্তম। বিশেষত রাতে ঘুমাবার সময়।

গোসল ঃ হাত ব্যতীত শরীরের অন্য কোনো স্থানে সাবান ব্যবহার পরিহার করা গেলে তা স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়ক হবে।

পোশাক ঃ জুতা, গ্যাটিস, হাতে পরা সুতা, তাগা, ফিতা এবং এ ধরনের বাধন বস্তু সব সময়ই ঢিলা হওয়া উচিত। যথাসম্ভব তৈলাক্ত কাপড় চোপড় এবং রাবার সামগ্রী পরবে না। ঠান্ডার দিনে এমন কাপড় পরবে যাতে গরম বেশী এবং ওযনে হালকা, গরমের দিনে এমন কোমল কাপড় পরবে যা ঘাম প্রতিরোধ করে না, আর বর্ষার দিনে এমন কাপড় পরবে যা ঘাম শুষে নেয়। এটাই পোশাকের মূলনীতি হওয়া উচিত।

www.nagorikpathagar.org

নগ্নপদ ঃ যতোটুকু নগ্নপদে হাঁটা যায় ততোই উত্তম। আরাম এবং পায়ের হেফাযতের শর্তে যেখানে নগ্নপদে চলাফেরা সম্ভব, অথবা শুধু স্লিপার বা হাইহিল ইত্যাদিতে কাজ চলে, সেখানে বুট জুতা কিংবা স্যু ব্যবহার করবে না।

শয্যা ঃ নরম বিছানা গদি ইত্যাদির ওপর শোয়া স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর, তাই এটা পরিহার করবে। *(চশমায়ে হায়াত, দিল্লী, মার্চ ১৯৩৮ সংখ্যা)*

নগ্নপদে থাকা ঃ জুতা খুলে নগ্নপদে বিছানায় বসাই ইসলামী সামাজিকতা এবং চালচলন রীতি, যা সমগ্র ইসলামী বিশ্বেই প্রচলিত। ইসলামী বিশ্বের সর্বত্রই জুতা সাধারণত চলাফেরার সময় ব্যবহৃত হয়; বরং চলাফেরার সময়ও কখনো কখনো নগ্নপদে চলা দূষণীয় মনে করা হয় না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সামাজিকতা এবং চলাচল রীতি এটাই ছিলো। জুতা শরীরের অপরিহার্য অংশ বানিয়ে নেয়া ইউরোপের নিরর্থক সামাজিকতা এবং চালচলন রীতিরই বৈশিষ্ট্য। ইউরোপই সারা দুনিয়ায় এ নিরর্থক সামাজিকতার প্রচলনকারী। তারাই চেয়ার, টেবিলের রীতি চালু করেছে, যাতে বসা এবং কাজকর্মের সময়ও জুতা খোলা না লাগে। কিছু কিছু নকল সাহেব বাহাদুর তো ঘুমাবার সময়ও জুতা পায়েই আরাম কেদারায় সটান লম্বা হয়ে পড়েন। আল্লাহর শোকর, অনেক ক্ষতি সওয়ার পর ইউরোপ আজ সে মতবাদ ও রীতিনীতির দিকেই ফিরে এসেছে, যা ইসলাম প্রথম স্থাপন করেছিলো। দুখের বিষয়। আমাদের ভাইয়েরা এখনো চোখ খুলে তাকাচ্ছে না। তারা সে সামাজিকতা আর চালচলনকেই গর্ব ও সম্মানের বস্তু বানিয়ে বসে আছে, তিক্ত বিরক্ত হয়ে যা থেকে ইউরোপ আজ তওবা করছে।

শয্যা ঃ ইউরোপ আজ নরম বিছানা গদি ইত্যাদির ওপর শোয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলছে। ইসলামী সামাজিকতা ও চালচলন রীতি শুরু থেকেই এ থেকে দূরে ছিলো। সরওয়ারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিছানা ছিলো চামড়ার এবং খেজুর ছাল ভর্তি। *(তারগীব ওয়া তারহীব, পৃষ্ঠা ১১৫; বোখারীর সূত্রে)*

ইসলামী সামাজিকতা, চালচলন এবং সাদাসিধা অনাড়ম্বর জীবন যেমন মুসলমানদের জাগতিক আরাম আয়েশে নিমজ্জিত হওয়া থেকে প্রতিরোধ করে, তেমনি তা তাদের স্বাস্থ্য সুস্থতা এবং জাগতিক জীবনে আরাম আয়েশেরও ব্যবস্থা করে। যেসব মানুষ আধুনিকতাবাদের পূজায় লিপ্ত, আল্লাহর ওয়াস্তে তারা এবার একটু ভেবে দেখুন। যদি নিজেদের দ্বীনী ফতোয়ায় তারা প্রভাবিত না হন তাহলে অন্তত তাদের ফতোয়াই শুনুন, যাদের আপনারা অন্ধ অনুসারী।

জার্মানীতে নারী স্বাধীনতার হাশর

পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীকে যে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলো, তার পরিণতি আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে, কিন্তু পাশ্চাত্য প্রদত্ত এ নারী স্বধীনতা আর খুব বেশী দিন টিকে থাকতে পারবে না। জার্মানীতে নারী স্বাধীনতার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। নারী স্বাধীনতার জোয়ার যেমন শক্তিশালী ছিলো, ভাটা তার চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী। হিটলার আবার নারীদের ঘরের চার দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ করেছে এবং

www.nagorikpathagar.org

নিষিদ্ধ বৃক্ষের মতো জার্মানীতে নারীদের জন্যে উচ্চ শিক্ষা নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়েছে। জার্মানীর ইচ্ছা, নারী শুধু সন্তান জন্ম দেবে, তার আর কোনো কাজ নেই– ভবিষ্যত যুদ্ধবিগ্রহে যেসব সন্তানদের জার্মানীর প্রয়োজন। এক নাজী লীডার আলফ্রেড রোজবার্গ বলেন, বিবাহিত হোক কি অবিবাহিত, যে নারী সন্তান জন্ম দেয় না, সমাজের জন্য সে নারী এক অভিশাপ। নারীর উচ্চ শিক্ষা যদিও এখনো খোলাখুলি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়নি, কিন্তু যেসব প্রতিবন্ধকতা এ পথে আরোপ করা হয়েছে, তাতে নারীর উচ্চ শিক্ষা লাভ অসম্ভব হয়ে পড়বে। বার্লিন ইউনির্ভাসিটি ইউনিয়নের সভাপতি বলেন, ইউনির্ভাসিটি শুধু পুরুষদের জন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারী শিক্ষার .মৌলিক উদ্দেশ্য তাদের মা হবার জন্যে প্রস্তুত করা। নিছক সংস্কৃতির ধারণায় নারী শিক্ষা আমরা নিষ্ফল বলে মনে করি। নারীর মা হবার জন্য সাদাসিধা সরল সংস্কৃতিরই প্রয়োজন, এর বেশী কিছু নয়। আর এটা তারা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষালয়গুলোতেই লাভ করতে পারে। মধ্যম পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলো নারীর সাধারণ স্বাস্থ্যগত বিষয় এবং ব্যায়ামের ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। সুস্থ ও স্বাস্থ্যবতী মা হওয়ার জন্যে যা একান্ত জরুরী। এসব বিদ্যালয়ে দরকারী এবং উপকারী বিষয়াদি, খাদ্যদ্রব্য রান্না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার রীতিনীতি, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং ব্যায়ামের জরুরী নিয়ম পদ্ধতি শেখানো হয়। আর জার্মানীতে শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য মেয়েদের মনে নাজী নীতিসমূহ যেন স্থায়ী আসন লাভ করে। তাদের যুদ্ধের কার্যকারিতা, রাজ্যের সম্মান উন্নতি এবং হিটলার সম্পর্কে অনুশীলন করানো, বংশ গোত্রের মানসিক এবং সৃষ্টিগত পার্থক্যের চিন্তাধারা জনপ্রিয় করে তোলা।

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাসূচী শেষ করার পর একটি মেয়ে কিছুদিন কোনো পরিবারে গৃহপরিচারিকা, ফার্মের শ্রমিক অথবা বাচ্চাদের ধাত্রী হয়ে ঘরোয়া জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। রাষ্ট্র সরকার সরকারী কোষাগার থেকে ঋণ দিয়ে দিয়ে যুবতী অবিবাহিতা মেয়েদের বিয়ের জন্যে উৎসাহিত উদ্দীপিত করে। যাতে পারিবারিক জীবনে তাদের কোনো কষ্ট অসুবিধা না হয়। এর পর কয়েক বছরে কিস্তিতে কিস্তিতে সরকারী কোষাগার থেকে বিয়ের জন্যে প্রদত্ত ঋণ তারা পরিশোধ করে দেয়। একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সন্তান জন্ম নিলে ঋণের এক চতুর্থাংশ তাদের দায়িত্ব থেকে রহিত হয়ে যায়। এভাবে নারীর বাইরের কাজের সুযোগ হাতছাড়া হয়। এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ইচ্ছা হচ্ছে, সর্বপ্রকার কর্মতৎপরতা থেকে হটিয়ে নারীকে শুধু সাধারণ ঘরোয়া কাজে আবদ্ধ করে দেয়া, যদিও আজকাল মেয়েদের জন্যে সে কাজই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, যেসব কাজের জন্যে পুরুষ অতি দ্রুততার সাথে এগিয়ে আসছে এবং যেসব কাজ তারা খুব সহজেই সম্পাদন করে লাভবান হতে পারে। শিল্প কারখানা, ফার্মে এবং সরকারী অফিস আদালতে, বিভিন্ন সরকারী বিভাগে ছোটো ছোটো চাকরি বাকরির দরজা মেয়েদের জন্যে এখনও অবারিত, কিন্তু এও ততোক্ষণ পর্যন্তই অবারিত থাকবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ সে দিকে মনোনিবেশ করবে না। পুরুষ এদিকে মনোনিবেশ করলে এ সংকীর্ণ ময়দানও পুরুষদের জন্য খালি করে

www.nagorikpathagar.org

দিতে হবে। এখন জার্মনীতে সরকারী বিভাগসমূহ এবং বড়ো বড়ো ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পদসমূহে নারীদের খুব কমই দেখা যায়। তাদের জন্যে ইউনিভর্সিটিসমূহের দরজা একেবারেই বন্ধ। ১৯৩৫ ইং সনে ল' কলেজসমূহে মাত্র সাতটি মেয়েকে ভর্তি হবার সুযোগ দেয়া হয়। তারা চাচ্ছে নারী যেন কোনো সিভিল চাকরিতে আগ্রহী না হয়। আজ সেখানে কোনো স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক কোনো মেয়েলোক নেই। বড়ো বড়ো সব পদ শুধু পুরুষদের জন্যেই নির্ধারিত। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের আগে কোনো নারীর জন্য সরকারী চাকরির সাথে সংশ্লিষ্টতাই জার্মান আইনে নাজায়েয। সব দিক থেকে পুরুষ এবং নারী সমান হলে রাষ্ট্র সরকার পুরুষকেই অগ্রাধিকার দেয়।

রাষ্ট্র সরকার এর কারণস্বরূপ বলে থাকে, মেয়েরা যেন বৈবাহিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এ জন্যেই এরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু জার্মানীর সব পুরুষ যদি বিয়ে শাদী করে নিজ নিজ স্ত্রীর খাওয়াপরার যিম্মাদার হয়ে যায়, তবুও জার্মানীতে অনেক মেয়েই বিয়ে ব্যতীত থেকে যাবে। জার্মানীতে এ সময় নারী শুধু বস্তুগত বিচারেই নির্যাতিতা নয়; বরং নৈতিকতার বিচারেও নির্যাতিতা। জার্মানীর নারীরা তাদের সব চাওয়া পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের জগত চার দেয়ালের মাঝে বিস্তৃত করতে চেয়েছিলো, কিন্তু বর্তমান গভর্নমেন্ট এ ক্ষুদ্র গন্ডিতেও তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছাড়তে ইচ্ছুক নয়। তাই নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনভাবে সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষা দানের অনুমতি তাদের দেয়া হয়নি। নাজী গভর্নমেন্ট নিজেই সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। যাতে প্রথম থেকেই তাদের নাজী মৌলনীতি অনুযায়ী চালাতে পারে। এটা সুস্পষ্ট, এ পদ্ধতি একেবারেই যালেমানা পদ্ধতি। এ পদ্ধতি মা ও তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির নামান্তর, যা নারী সহজে সয়ে নিতে পারে না। হয়তো নারীকে বাইরে চলতে ফিরতে দাও, আর যদি বাইরের জগত থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ করতে চাও, তা হলে গৃহবৃত্তে সন্তানই নারীর কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। নারীই সন্তানের বস্তুগত ও নৈতিক শিক্ষা দীক্ষার একক দায়িত্বশীল।

কখনও কখনও প্রশ্ন ওঠে, জার্মানীতে নারীরা এ ধরনের বন্দিদশায় কিভাবে সন্তুষ্ট থাকতে পারে? জবাবে বলা হয়, এ জীবনের উদ্দেশ্য, অবিবাহিত নারী যেন স্বামীর আকাঙ্ক্ষা করতে শেখে এবং এ জন্যে নানা রকম প্রচার প্রপাগান্ডা চালু করে। আর বিবাহিতা নারী যেন নিজের পারিবারিক জীবনের ওপর পরিতৃপ্ত থাকে এবং বেশী বেশী সন্তান জন্ম দেয়। কিছু দিন এভাবে চললে স্বভাবতই মানসিকতার পরিবর্তন সাধিত হবে।

জার্মান জাতির ওপর বর্তমান সরকারের ভীতিকর প্রভাব এমনভাবে ছায়াপাত করেছে যে, এ কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে আওয়ায তোলার সাহস তাদের নেই। তারা হতাশ নিরাশ অবস্থায় এ তামাশা দেখছে আর ভাবছে, শুধু স্ত্রী এবং মা হওয়ার জন্যেই কি নারীর সৃষ্টি। তাও কেমন স্ত্রী আর কেমন মা? এমন স্ত্রী – যে সন্তান জন্মদানের দায়িত্ব

www.nagorikpathagar.org

সম্পাদন করবে এবং এমন মা যে সন্তানকে স্তন্য দান করবে আর সেবা পরিচর্যা করবে। এ ছাড়া নারী কখনও এমন ধারণা করবে না যে, সে ঘরের রাণী এবং সন্তানের মা।

নারী তার অধিকারের চাইতে অনেক বেশী আদায় করেছে, আর যুগ তা সুদসহ ফিরিয়ে নিয়েছে। *(এসলাহ সাময়িকী, সারায়ে মীর, আযমগড়)*

(স্বরণ রাখা প্রয়োজন, এ রিপোর্ট আজ থেকে প্রায় ৬৫ বছর আগের। বর্তমানে এই অবস্থা পৃথিবীর কোথায়ও নেই। –অনুবাদক)

মিসরীয় আলেমদের দৃষ্টিতে হিন্দুস্তানে হাদীস ও হানাফী মাযহাব

হেজায, ইরাক, মিসর ও শাম (সিরিয়া)-কে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র মনে করা হয়। এরূপ ভাবা যথার্থও বটে। ভৌগোলিক কারণে হিন্দুস্তান এসব ইসলামী জ্ঞান কেন্দ্রসমূহ থেকে যেরূপ আলাদা অবস্থানে অবস্থিত, তাতে ইসলামী শাস্ত্র জ্ঞানে হিন্দুস্তানের কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকারই কথা, কিন্তু আল্লাহর দ্বীনরূপী এ দান কোনো নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ নয়। আল্লাহ তায়ালা যেখানে যে জাতি এবং যে ব্যক্তিকে ইচ্ছা পুরস্কারে সমৃদ্ধ করেন।

আল্লাহর সর্বপ্রথম নবী ও রসূল হযরত আদম (আ.) হিন্দুস্তানের মাটিতে অবতরণ করেছেন। এ সুবাদে প্রথম ওহীও সম্ভবত পৃথিবীর এ অংশেই নাযিল হয়েছে। পৃথিবীর সর্বপ্রথম নবী ও রসূল এবং সর্বপ্রথম মানবের প্রথম অবতরণস্থল ও প্রথম ওহী অবতরণের স্থান হওয়ার মর্যাদায় আল্লাহ তায়ালা হিন্দুস্তানকে ভূষিত করেছেন। অনুরূপ ইসলাম এবং ইসলামী জ্ঞানের বিষয়সমূহের বিশুদ্ধ খেদমতের পরিপূর্ণ নেয়ামত লাভের মর্যাদাও আল্লাহ তায়ালা এ ভূখন্ডকে দান করেছেন। এ ভূখন্ডে ইসলামী জ্ঞানের সেবা চর্চা যেভাবে অতীতে হয়েছে এবং হচ্ছে, ইসলামী বিশ্বে তা নযিরবিহীন। *(হিন্দুস্তান সম্পর্কিত এই উক্তির কোনো ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই। –অনুবাদক)*

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আধুনিক চিন্তাধারা যাকে মূলত অন্ধকারাচ্ছন্নতা বলাই যথার্থ, তার প্রভাবে দ্বীন এবং এলেমের সাথে ব্যাপক জনমানুষের পরিচয় না থাকা, এর অনিবার্য কারণ হিসেবে দ্বীনী এলেম এবং ওলামায়ে কেরামের অভাব দৈনন্দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু এ অবস্থায় হিন্দুস্তান ভূখন্ডে আল্লাহর এমন কিছু নিষ্ঠাবান বান্দা বর্তমানে রয়েছেন, যারা এমন টানাপড়েন এবং অবমূল্যায়নের অবস্থায়ও নিজেদের মূল্যবান সময় দ্বীনী এলেমের সেবা চর্চায় ওয়াকফ করে রেখেছেন এবং দ্বীনী এলেমের বিরাট বিরাট সেবার কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছেন, যা রাষ্ট্র সরকারের পক্ষেও আঞ্জাম দেয়া মুশকিল ছিলো। দ্বীনী এলেমের এসব গরীব নিস্ব সেবকদের এতোটুকু পুঁজিও ছিলো না যে, তারা নিজেদের রচিত গ্রন্থ ছাপাখানা পর্যন্ত পৌছাবেন। কোথাও মরে বেঁচে কোনো প্রকারে রচিত কোনো গ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে গেলেও তার ব্যাপক প্রচার প্রসারের কোনো সুযোগ হয় না। এলেমের এ ভান্ডার তার যোগ্য অধিকারীদের পর্যন্ত পৌছানোও অসম্ভবই থেকে যায়। হিন্দুস্তানী আলেমদের রচিত কোনো গ্রন্থ ঘটনাক্রমে এ অঞ্চলের

www.nagorikpathagar.org

বাইরে মুসলিম বিশ্বে পৌঁছে গেলে আল্লাহওয়ালা ওলামায়ে কেরাম তা কিভাবে গ্রহণ করতেন, তার কিছু নমুনা আপনারা নিম্নের আলোচনায় দেখতে পারেন।

হযরত থানবী (র.) রচিত উপকারী গ্রন্থের সংখ্যা ছোটো বড়ো মিলিয়ে সাতশ'র বেশী। এসব গ্রন্থের কিছু হেজায ও মিসরসহ ইসলামী বিশ্বের কয়েকটি দেশে পৌঁছেছে। স্থানীয় অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম সেসব গ্রন্থকে মহা নেয়ামত এবং গর্বের ধন এলমী খেদমত বলে মনে করেছেন। দীর্ঘ দিন পূর্ব থেকে হযরত থানবী (র.) একটি গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করেছেন। এ গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য হানাফী মাযহাব অনুসারী মুসলমানদের জন্য হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) উদ্ভাবিত প্রতিটি মাসয়ালার সপক্ষে কোরআন হাদীস থেকে প্রমাণসমূহ একত্র করা। দীর্ঘ দিন থেকেই তিনি এ বিরাট কাজ তার বিশিষ্ট প্রিয়জন হযরত মাওলানা যফর আহমদ ওসমানী থানবী (র.)-এর ওপর সমর্পণ করে রেখেছেন। তিনি যা লেখেন তা হযরত থানবী (র.) নিজে পুরোপুরি দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দেন। এটাকে তিনি নিজের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব মনে করে নিয়েছেন। হযরত মাওলানা যফর আহমদ ওসমানী (র.) এ কাজ এমন কষ্ট সাধনা সহকারে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সম্পাদন করছেন, যা আজকাল অত্যন্ত কঠিনই বটে। আল্লাহর শোকর, দ্বীনী এলেমের এ মর্যাদাপূর্ণ এলমী খেদমত পনেরো খন্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে দশ খন্ড মুদ্রিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট খন্ডগুলোর মুদ্রণ কাজ চলছে। এটি হানাফী মাযহাবের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তকরী, হাদীসের মূল পাঠের ব্যাখ্যা, বর্ণনাসূত্র সম্পর্কিত আলোচনা এবং হাদীসের মূলনীতির নিরিখে হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থে পরিণত হয়েছে, যার কোনো নযির নেই।

এ গ্রন্থখানার কয়েক খন্ড মিসরে পৌঁছেছে। মিসরের সর্বজন পরিচিত প্রসিদ্ধ আলেম, গ্রন্থকার হযরত আল্লামা যাহেদ কাওসারী (র.) নিম্নলিখিত প্রবন্ধে আলোচিত গ্রন্থটি সম্বন্ধে তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অনুরূপ তাফসীর ও হাদীসের শায়খ, আমার ওস্তাদ হযরত মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (র.) সম্প্রতি এলমে হাদীসের এক মহা মর্যাদাপূর্ণ সেবাকর্ম সম্পাদন করেছেন, এ যুগে এমন একটা বৃহৎ কর্ম সম্পাদন তো দূরের কথা, চিন্তা করাটাও কঠিন। হাদীস গ্রন্থ সহীহ মুসলিম শরীফের কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ এ পর্যন্ত রচিত হয়নি, প্রয়োজন পূরণে যা যথেষ্ট হতে পারে। ইমাম নববী (র.) প্রণীত সহীহ মসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থখানা অত্যন্ত উত্তম এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু প্রথমত আল্লামা নববী (র.) নিজে শাফেয়ী মাযহাব অনুসারী। তাই তিনি শাফেয়ী মাযহাবের মূলনীতিতেই এ ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, এতে হানাফী মাযহাব অনুসারীদের পরিতৃপ্তি লাভ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত অনেক স্থান এমন রয়েছে যা আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যার দাবী করে।

হানাফী মাযহাব অনুসারীদের জন্যে মুসলিম শরীফের একখানা বিস্তারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ হযরত মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (র.) অর্ধেকের বেশী সম্পন্ন করে ফেলেছেন। এখনও কাজ চালু রয়েছে। এ গ্রন্থের তিন খন্ড এ পর্যন্ত মুদ্রিত

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। হযরত আল্লামা কাওসারী (র.) নিজের প্রবন্ধে মুসলিম শরীফের আলোচ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ সম্পর্কেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। অনুরূপ যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও হাদীসশাস্ত্রবিদ হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র.) প্রণীত 'সুনানে আবী দাউদ' শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'বযলুল মাজহুদ' দীর্ঘ দিন হয় মুদ্রিত হয়ে বের হয়েছে। যার নিজের গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মুখাপেক্ষী নয়। হযরত আল্লামা যাহেদ কাওসারী (র.) নিজের প্রবন্ধে আল্লামা শাওক নীমুবী (র.) প্রণীত 'কিতাবু আসারিস সুনান' এবং অন্যান্য হিন্দুস্তানী আলেমের এলমে হাদীসের খেদমত সম্পর্কেও পান্ডিত্যপূর্ণ পর্যালোচনা করেছেন। আল্লামা কাওসারী (র.)-এর প্রবন্ধটি হিন্দুস্তানী ওলামায়ে কেরামের এলমে হাদীসের খেদমত সম্পর্কে একজন সুবিজ্ঞ প্রসিদ্ধ আলেমের সত্যায়নপত্র এবং গর্বের বিষয় হওয়া ছাড়াও ফেকাহ ও হাদীস শাস্ত্রের স্বতন্ত্র ইতিহাস, প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে ফেকাহ ও হাদীসের যে এলমী সেবাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ চিত্র। এটি হাদীসশাস্ত্রবিদ আলেম ও হাদীস শিক্ষার্থীদের জন্যে উপকারী জ্ঞানের ভান্ডার। এখানে হযরত আল্লামা কাওসারী (র.)-এর পত্রের অনুবাদ পেশ করা হচ্ছে।

বিধিবিধান সম্পর্কিত হাদীসসমূহের চর্চা

যে ফেকাহ শাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক রাখবে, তার জন্যে সেসব হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের বাণী এবং তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের উক্তিসমূহ জানার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা জরুরী, যা তার মৌল ও শাখা বিধানসমূহ সম্পর্কে করা হয়েছে। তা হলে সে একটা যৌক্তিক প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সুস্পষ্ট বর্ণিত বিধান (নস)-এর বিপরীতে কেয়াস বা অনুমানের ওপর নির্ভরতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। আর এজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন মাসয়ালাসমূহে এজমা (ঐকমত্য)-এর বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে। কেননা যেসব বিষয়ে কেয়াস জায়েয এবং যেসব বিষয়ে জায়েয নয়, অনুরূপ যেসব মাসয়ালায় মতবিরোধ জায়েয এবং যেসব মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালায় পরস্পরের মাঝে পার্থক্য করা একমাত্র বিধান বর্ণিত হবার স্থান এবং সেসব মাসয়ালা উদ্ভাবনের কারণসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ববর্তী ফকীহদের থেকে যে বিধান বর্ণিত হয়েছে সেসব সম্পর্কে গভীর জানাশোনার অধিকারী, এমন লোকই নিজেকে বিধানের প্রয়োগস্থলে কেয়াস এবং ঐকমত্যজনিত বিষয়ের বিরোধিতা থেকে রক্ষা করতে পারে। এ কারণেই এ উম্মতের ওলামায়ে কেরাম এবং দ্বীনী পথপ্রদর্শকরা প্রতি যুগে সেসব আয়াত ও হাদীস একত্রীকরণে গভীর প্রচেষ্টা করেছেন এবং সেসবের সূত্র ও মূল পাঠ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর হাদীসের ওপর আমল সম্পর্কে নিজ নিজ রুচি ও চিন্তাধারা এবং আইনী মতামত অনুসরণের কাজে মশগুল থেকেছেন। এক দেশের মানুষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অলসতা অমনোযোগিতা প্রদর্শন করলে সমকালেই অন্য কোনো ইসলামী দেশের আলেম সমাজ এ কাজের জন্য দাঁড়িয়ে গেছেন। আব্বাসী শাসন যখন উন্নতির শীর্ষদেশে অবস্থান করেছিলো, তখন ইরাকের আলেম সমাজ শরয়ী ও বুদ্ধিবৃত্তিক

www.nagorikpathagar.org

এলেম বিশেষত এলমে হাদীস ও ফেকাহচর্চা এবং প্রচার প্রসারে সবার চেয়ে বেশী অংশ নিয়েছেন। আব্বাসী শাসন অবসানের সাথে সাথে এলমে হাদীস ও এলমে ফেকাহর চর্চা এবং প্রচার প্রসার প্রচেষ্টারও অবসান ঘটে। ইরাকী আলেম সমাজের প্রচেষ্টার সে এলমী নিদর্শন যা অদ্যাবধি গ্রন্থসমূহের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়ে আছে, তাই আমাদের জন্যে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আব্বাসী শাসন যুগের অবসান এবং ইরাকের পরে আল্লাহর এ নেয়ামত মিসরের অংশে পড়ে, যা বারজিয়া শাসনে সমভাবে চলতে থাকে।

কালের করালগ্রাস থেকে বেঁচে যাওয়া আব্বাসী এবং মিসরীয় শাসন যুগের নিদর্শনসমূহ এবং আমীর ওমারা ও রাজরাজড়াদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহ অদ্যাবধি আমাদের সামনে বিদ্যমান থেকে নিজেদের সগর্ব অতীতের ঘোষণা দিয়ে চলেছে। আমরা সব সময় ইতিহাস গ্রন্থসমূহের এসব স্বনামধন্য প্রশংসাযোগ্য মানব সমাজের মহৎ কর্মপ্রচেষ্টার ভান্ডারসমূহ অধ্যয়ন করে চলেছি। যা মিসরের সমকালীন শাসকরা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও এলমে হাদীসের প্রচার প্রসারে নিয়োগ করেছেন। এসব বাদশাহ ও শাসকরা শুধু রাজক্ষমতা এবং রাজত্বের মালিকই ছিলেন না; বরং তাদের অনেকে বিজ্ঞ পারদর্শী আলেমও ছিলেন। তাই দেখা যাচ্ছে, মিসরের শাসক তাহের ইয়ারফুক ইমাম আকমালুদ্দীন বাবারকী (র.) থেকে এলমে ফেকাহ শিক্ষা করেছেন এবং সহীহাইন (বোখারী মুসলিম) গ্রন্থদ্বয়ের হাদীস বর্ণনায় একদল মোহাদ্দেসের সাথে অংশ নিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, তিনি সমকালে সনদের মর্যাদাসম্পন্ন ইবনে আবিল মাজদের মতো হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আলেমকে এ জন্যে মিসরে নিয়ে আসেন, যাতে মিসরীয় আলেম এবং হাদীসের ছাত্ররা তার থেকে উপকৃত হতে পারেন এবং এ শাস্ত্রে তাদের সনদ বা বর্ণনাসূত্র উচ্চে উপনীত হয়।

অনুরূপ মিসরের সুলতান মোয়াইয়েদ হাফেয সিরাজুদ্দীন বালকেনী থেকে সহীহ বোখারী শরীফ বর্ণনার মর্যাদা সংরক্ষণ করতেন; বরং শ্রেষ্ঠ হাফেযে হাদীস ইবনে হাজার সুলতান মোয়াইয়েদ থেকে অনেক হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাকে নিজের ওস্তাদদের দলভুক্ত গণ্য করেছেন, যা তার রচিত 'মো'জামুল মেফহারস' গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। সুলতান মোয়াইয়েদই 'আল মাসায়েলুশ শরীফা ফী আদিল্লাতি মাযহাবে ইমাম আবী হানিফা' গ্রন্থের প্রণেতা শামসুদ্দীন দায়রীকে এলমী উপকারিতা লাভের উদ্দেশে মিসরে আহবান করে আনেন। অনুরূপ মিসরের সুলতান যাহের ইমাম ইবনুল জুমরীর কাছে সহীহ বোখারী অধ্যয়ন করেছেন এবং ফেকাহ ও হাদীস শাস্ত্রের বড়ো বড়ো ইমামদের দূর দেশ থেকে মিসরে আহ্বান করে এনেছেন। যাতে মিসরের ওলামায়ে কেরাম ও বিদ্যার্থী তাদের থেকে সেহাহ সেত্তাহ গ্রন্থসমূহের উচ্চ সনদ (বর্ণনাসূত্র) লাভ করতে পারেন। তিনি মিসরের রাজকীয় কেল্লা ওলামায়ে কেরামের আলোচনা পর্যালোচনা ও গবেষণা মজলিস অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন, যাতে সর্বসাধারণ মানুষের মনে ওলামায়ে কেরামের সম্মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সুলতান ও আমীরদের এ বিশেষ দৃষ্টিদান এবং গুরুত্ব প্রদানের কারণে সপ্তম শতাব্দী থেকে নবম

www.nagorikpathagar.org

শতাব্দী পর্যন্ত তিনশ' বছরব্যাপী মিসর হাদীস, ফেকাহ ও আরবী সাহিত্য নিবাসে পরিণত হয়েছিলো।

মিসরের বিভিন্ন এলমী বিষয়ের ইমাম এবং সম্মানিত ওলামায়ে কেরামের কার্যক্রমের সোনালী অধ্যায় আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিশেষ মর্যাদায় দেদীপ্যমান। তাদের মধ্যে এমন সব ব্যক্তিত্বও রয়েছেন যারা বিভিন্ন এলমী বিষয়ে অনেক উপকারী গ্রন্থের রচয়িতা। সে কারণে তারা শুধু মিসরেরই গর্বের সম্পদ নন; বরং তাদের ইসলামের গৌরব বলে মনে করা হয়। ধ্বংসের করালগ্রাস থেকে রক্ষা পেয়ে বিশ্বের এলমী ভান্ডারে মিসরীয় আলেমদের মর্যাদাপূর্ণ কর্মকান্ডের স্মারকরূপে যা কিছু সঞ্চিত আছে, তা আমাদের মিসরের স্থায়ী অহংকারের সংবাদ দেয়। হাদীস, ফেকাহ ও ইতিহাস বিষয়ে তাদের রচনার সংখ্যাও অগণিত। মিসরে এলেম চর্চার এ বিশেষ ব্যবস্থা ও গুরুত্ব দশম হিজরী শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এ শতাব্দীর প্রথম দিকে বারজিয়া শাসনের অবসান ঘটার সাথে সাথে এলেম চর্চা এবং ইসলামী এলমী বিষয়সমূহের চর্চার এ বিশেষ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে; বরং বারজিয়া শাসনের অবসানে এলেম চর্চাকারীরা প্রকম্পিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এ সময় মিসর এলেম চর্চার এ বরকতময় খেদমত অন্য দেশসমূহের দায়িত্বে অর্পণ করে। এমনটি আল্লাহর রীতিও বটে– একের পরে একজন আল্লাহর নেয়ামতসমূহের উত্তরাধিকারী হয়। সপ্তম ও অষ্টম হিজরী শতাব্দীর মিসরীয় আলেম সমাজের সাথে দশম হিজরী শতাব্দীর আলেম সমাজের তুলনা করলে আপনারা দেখতে পাবেন, এ শতাব্দীতে মিসরীয় আলেম সমাজ কতো বড়ো বিপদের শিকার হয়েছেন। যখন এলমে হাদীসের চর্চা মিসর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে অন্যান্য দেশের মাঝে বন্টিত হয়, তখন হিন্দুস্তান এ এলমী উত্তরাধিকারের সবচাইতে বিরাট অংশ লাভ করে। তখন থেকে হিন্দুস্তানী আলেম সমাজ সম্পূর্ণরূপে এলমে হাদীসের খেদমতে নিমগ্ন হন। অথচ এর আগে হিন্দুস্তানী আলেম সমাজের পুরো মনোযোগ মাকুলাত (তর্কশাস্ত্র, দর্শন)-এর প্রতি নিবদ্ধ ছিলো। আমরা যদি হিন্দুস্তানী আলেম সমাজের এ সাহসিকতা সংকল্প এবং বিরাট খেদমতের বিষয়টা উত্তমরূপে অধ্যয়ন করি, যা তারা এ সময় অর্জন করেছেন, তা হলে এক বিস্ময়ের জগত পরিদৃষ্ট হবে।

হিন্দুস্তান এলমে হাদীসের উত্তরাধিকার লাভের পর এখানকার ওলামায়ে কেরাম উসূলে হাদীস (হাদীসের মূলনীতি শাস্ত্র) সেহাহ সেত্তাহর ওপর তাদের কতো কতো পার্শ্বটীকা এবং উপকারী ব্যাখ্যা গ্রন্থ, বিধি বিধান সম্পর্কিত হাদীসসমূহের ওপর তাদের কতো কতো উপকারী গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং ইলাল (হাদীসের আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম ত্রুটি, যা কেবল একজন শাস্ত্রাভিজ্ঞই উদঘাটন করতে পারেন) ও বর্ণনাকারীদের সমালোচনায় তাদের কতো উজ্জ্বল অবদান, অনুরূপ বিভিন্ন এলমী বিষয়ে তাদের রচিত উপকারী গ্রন্থসমূহ গণনা করেও শেষ করা যাবে না। আমরা আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি, হিন্দুস্তানী আলেম সমাজের এলমে হাদীস চর্চার এ ধারা ফলে ফুলে সুশোভিত হোক এবং সত্যপন্থীদের এ কর্মধারা সব সময়ের জন্যে অব্যাহত থাকুক। আল্লাহ তায়ালা

www.nagorikpathagar.org

তাদের আরও বেশী তাওফীক দান করুন, যাতে তারা আরও বেশী বেশী উপকারী গ্রন্থ রচনায় সক্ষম হন। আল্লাহর দরবারে আমরা এ দোয়াও করছি, যেন তিনি নতুন করে অন্যান্য মুসলিম দেশেও এ ধারা চালু করে দেন।

বিধি বিধান সম্পর্কিত হাদীসসমূহের ওপর পূর্বসূরিদের সর্বোত্তম গ্রন্থ মোসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, ইমাম তাহাভী রচিত গ্রন্থসমূহ, বিশেষত মায়ানিল আসার, ইবনে মোনযের রচিত গ্রন্থসমূহ, বিশেষত ইশরাফ, ইমাম জাসসাস রচিত শরহে মোখতাসার তাহাভী ও মোখতাসার কারখী, মোখতাসার জামে' কবীর, ইমাম ইবনে আবদুল বার রচিত গ্রন্থসমূহ, আবুল হাসান ইবনে যামতান রচিত তামহীদ ও এস্তেযকার, আল্লামা আবদুল হক রচিত কুতুবে আহকাম, কিতাবুল ওয়াহম ওয়াল ঈহাম, ইমাম বায়হাকী ও ইমাম নববী রচিত গ্রন্থসমূহ, ইবনে দাকীকুল ঈদ রচিত গ্রন্থসমূহ যেমন ইলহাম ওয়া ইলসাম, শরহে উমদাহ প্রভৃতি, আল্লামা আবু মুহাম্মদ ইবনুল মুনজী রচিত আল লোবাব ফিল জামেয়ে বাইনাস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব, কুতুবুদ্দীন হালাবী রচিত আল এহতেমাম বিতালখীসিল এলহাম– এতে সেসব ভুলও শুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, যা ইবনে দাকীকুল ঈদ থেকে হাদীস চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে সংঘটিত হয়েছে। এ গ্রন্থে আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ যিনি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তাকে রেখে অন্য লোকের প্রতি সম্পর্কিত করেছেন। অনুরূপ আল্লামা ইবনুল জাওযী রচিত আততাহকীক, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রচিত আল মুনতাকা, ইবনুল হাদী রচিত আত তানকীহ এবং ইতিহাস গ্রন্থসমূহ। হাদীস শাস্ত্র বিষয়ক এসব গ্রন্থের মাঝে সবচাইতে উপকারী এবং হাদীসের বিষয়বস্তুর ওপর পরিব্যাপ্ত হাফেয জামালুদ্দীন যায়লাঈ রচিত নসবুর রায়াহ, জামালুদ্দীন মালতী রচিত কিতাবুল মোতাসার, ইবনে হাজার প্রণীত গ্রন্থ বিশেষত ফাতহুল বারী ও তালখীসুল জোবায়র, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী প্রণীত গ্রন্থসমূহ বিশেষত উমদাতুল কারী এবং শরহে মায়ানিল আসার ও শরহে হেদায়া, আল্লামা কাসেম প্রণীত গ্রন্থসমূহ বিশেষত তাখরীজে আহাদীসে এখতিয়ার ব্যতীত আরও অগণিত গ্রন্থ, যা দশম হিজরী শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রণীত হয়েছে।

এ যুগের পরেই হিন্দুস্তানী আলেম সমাজের যুগ শুরু হয়। এলমে হাদীস ও হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ে শেষের তিন শতাব্দীতে হিন্দুস্তানী ওলামায়ে কেরামের রেখে যাওয়া এলমী নিদর্শন উপকরণ ও রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অগণিত এবং অনুমান বহির্ভূত। সেহাহ সেত্তাহর ওপর হিন্দুস্তানী ওলামায়ে কেরামের রচিত ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ ও পার্শ্বটীকা হাদীস শাস্ত্রে তাদের এলমী প্রশস্ততার প্রমাণ বহন করে। হিন্দুস্তানী আলেম সমাজ রচিত ফাতহুল মোলহেম ফী শরহে মোসলেম, বযলুল মাজহুদ ফী সুনানে আবী দাউদ, আল আরফুশ শাযী ফী সুনানিত তিরমিযী প্রভৃতি গ্রন্থ দেখুন। এসব গ্রন্থে মতভেদপূর্ণ মাসয়ালাসমূহের সন্তোষজনক বর্ণনা গ্রন্থিত রয়েছে।

হিন্দুস্তানী কোনো কোনো আলেম বিধি বিধান সম্পর্কিত হাদীসসমূহ অত্যন্ত বিস্ময়কর অভিনব পদ্ধতিতে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। সেসব গ্রন্থে বিধি বিধান সম্পর্কিত সব হাদীস হাদীসের সব উৎস গ্রন্থ থেকে নির্বাচন করে অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভাজন করে

www.nagorikpathagar.org

একত্র করা হয়েছে, সাথে সাথে সব হাদীসেরই শব্দের ও বর্ণনাসূত্রের সবলতা দুর্বলতার ওপর আলোচনা করা হয়েছে। সেসব গ্রন্থের মধ্যে হিন্দুস্তানী মোহাদ্দেস আল্লামা যহীর হাসান (শাওক) নীমুবী (র.)–এর গ্রন্থসমূহ, বিশেষত আসারুস সুনানের ওপর দৃষ্টি ফেলুন। গ্রন্থটি দুই খন্ডে সংকলিত হয়েছে। এ খন্ড দুটোতে তাহারাত (পবিত্রতা) ও সালাত (নামায) সম্পর্কিত হাদীসসমূহ এক জায়গায় ফকীহদের মতভেদ এবং অভিমত সম্পর্কে দলীলসমূহ উল্লেখ করার সাথে সাথে মোহাদ্দেসসুলভ সর্বোত্তম আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। তার ইচ্ছা ছিলো, এভাবে ফেকাহ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ এক জায়গায় একত্র করে গ্রন্থ প্রণয়ন করবেন, কিন্তু মৃত্যু তার এ সংকল্প বাস্তবে রূপদানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লামা নীমুবী (র.) রচিত আসারুস সুনান গ্রন্থখানা হিন্দুস্তান প্রেসে মুদ্রিত হয়, কিন্তু তা সবই এ গ্রন্থের মর্যাদা অনুধাবনকারী ওলামায়ে কেরামরে হাতে হাতে চলে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের পূর্বে গ্রন্থের কোনো কপি সংগ্রহ করাও এখন খুবই কঠিন বিষয় হয়ে পড়েছে।

অনুরূপ একজন হিন্দুস্তানী আলেম শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)– যাঁর রচিত ছোটো বড়ো গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচশ'য়ে উপনীত হয়েছে, তিনিও হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং এহইয়াউস সুনান ও আসারুস সুনান নামে হাদীস বিষয়ক দুখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। উল্লিখিত গ্রন্থ দুটো হাদীস বিষয়ক উত্তম গ্রন্থ হওয়ার জন্য এর সাথে হযরত থানবী (র.)–এর সংশ্লিষ্টতাই যথেষ্ট। এ গ্রন্থ দুটোও হিন্দুস্তানে মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে এর একটি কপি সংগ্রহ করাও দুষ্কর বটে। কেননা, হযরত থানবী (র.)–এর গ্রন্থসমূহ ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য। গ্রন্থদুটোর অত্যাগ্রহী পাঠকদের আধিক্যহেতু মুদ্রিত হয়ে বের হবার সাথে সাথেই সব কপি নি:শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে আল্লামা থানবী (র.)–এর বয়স প্রায় নব্বই বছর হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা এ সম্মানিত আলেমে রাব্বানীর সুস্থ জীবন আরও বর্ধিত করুন এ দোয়াই করছি। কেননা, তার পবিত্র সত্তা বিদ্যমান থাকা সমগ্র হিন্দুস্তানের জন্যে বিরাট বরকতের বিষয়। হিন্দুস্তানী আলেম সমাজে তার এক বিশেষ মর্যাদার আসন রয়েছে। এ কারণে বিশেষ ও সর্বসাধারণ মানুষের ভাষায় তিনি হাকীমুল উম্মত নামে প্রসিদ্ধ। হযরত থানবী (র.)– তার ভাগিনা ও ছাত্র হযরত মাওলানা যফর আহমদ ওসামানীকে নির্দেশ করেছেন তিনি যেন বর্তমানকালে প্রাপ্য হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে হানাফী মাযহাব অনুসারীদের দলীল প্রমাণ সংক্রান্ত হাদীসমূহ ফেকাহর পদ্ধতিতে একত্র করে হানাফী মাযহাব অনুসারীদের দালীলিক পূর্ণতা সাধন করেন। তার আরও নির্দেশ রয়েছে, যেন প্রত্যেক হাদীসের ওপর মূলনীতি শাস্ত্রের আলোকে সমালোচনা পর্যালোচনা করা হয়। মাওলানা যফর আহমদ ওসমানী নিজেও একজন হাদীস সমালোচক ও স্বনামধন্য ফকীহ। তিনি হযরত থানবীর নির্দেশক্রমে প্রায় বিশ বছর পর্যন্ত এমনভাবে কাজে নিমগ্ন রয়েছেন যে, আজকাল কোনো বিষয়ে এর চাইতে নিমগ্নতা সম্ভবই নয়। এমনকি হযরত মাওলানা যফর আহমদ ওসামানী তার ওপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব খুব সুন্দরভাবে সমাপ্ত করেছেন। এ গ্রন্থখানা বিশ

www.nagorikpathagar.org

খন্ডেসমাপ্ত হয়েছে। এর নাম রাখা হয়েছে এলাউস সুনান। স্বতন্ত্র এক খন্ডে এ গ্রন্থের ভূমিকা লেখা হয়েছে, যা উসূলে হাদীস (হাদীসের মূলনীতি) বিষয়ক এক বিস্ময়কর দুর্লভ গ্রন্থ। সত্য বলতে আমি (আল্লামা কাওসারী) তার এ একত্রিতকরণ ও সামগ্রিকীকরণ এবং সব হাদীসের মতন (মূল পাঠ) ও সনদ (বর্ণনাসূত্র) সম্পর্কে মোহাদ্দেসসুলভ আলোচনায় অভিভূত হয়েছি। হাদীস শাস্ত্রের দাবীও তার গৃহীত এ পদ্ধতির অনুরূপ ছিলো। এ গ্রন্থে কোথাও লৌকিকতা করে নিজের মাযহাবের পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি; বরং গ্রন্থের সর্বত্রই আলোচনা পর্যালোচনায় ন্যায়বিচারবোধকেই উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে। গ্রন্থ প্রণয়নে এরূপ বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনে আমার মাঝে অনুরূপ কর্মের ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষের সাহসিকতা আর বীর বাহাদুরদের সংগ্রাম এমনটাই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তায়ালা নিরাপত্তা ও সুস্থতার সাথে তাকে দীর্ঘায়ু দান করুন। তাকে অনুরূপ আরও উপকারী গ্রন্থ প্রণয়নের তাওফীক দিন। আলোচ্য গ্রন্থখানার দশ খন্ড মুদ্রিত হয়ে বের হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম খন্ডের সব কপি শেষ হয়ে গেছে।

অবশিষ্ট খণ্ডগুলোর মুদ্রণ কাজ অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছে। যদি মিসরের বড়ো মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত মালিকদের কেউ একজন এ কাজে এগিয়ে আসতেন এবং সম্মানিত গ্রন্থকার থেকে এর একখণ্ড এনে ভালো মিসরী টাইপে ছেপে দিতেন, তবে একটা বড়ো কাজ হতো। কোনো সম্মানিত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান মালিক যদি এ মহৎ কর্ম সম্পাদন করেন, তবে তা এলমে হাদীসের এক গ্রহণযোগ্য খেদমত বলে পরিগণিত হবে এবং তিনি এ কাজে একটা শূন্যস্থান পূরণের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

হিন্দুস্তানী নামকরা আলেমদের মধ্যে যারা বিধি বিধান সম্পর্কিত হাদীসসমূহের চর্চায় নিবেদিত রয়েছেন, তাদের মধ্যে মুফতী মাহদী হাসান শাহজাহানপুরী একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। আল্লাহ তায়ালা তাকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন। তিনি হযরত ইমাম মোহাম্মদ (র.) প্রণীত 'কেতাবুল আসার' গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতির মাঝে তার মতো আরও লোক সৃষ্টি করুন।

এ আলোচনা হিন্দুস্তানী ওলামায়ে কেরামের এলমে হাদীস চর্চার এক সংক্ষিপ্ত স্মারকনামা। উৎসাহী ব্যক্তিদের এমন কাজে আরো আগ্রহ উৎসাহ প্রদর্শন করা উচিত।

মুতার রণাঙ্গণে হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)-এর ভাষণ

শাম (সিরিয়া) দেশের সীমানা সংলগ্ন বায়তুল মাকদেস থেকে প্রায় দুই মনযিল দূরে অবস্থিত বালকা শহরের এক জায়গার নাম মূতা। নবুওয়ত যুগে রোমক এবং মুসলমানদের মাঝে সর্ববৃহৎ যুদ্ধ এ স্থানেই সংঘটিত হয়েছে। এ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মাত্র তিন হাজার মুসলমানের এক যোদ্ধা দল হযরত যায়দ বিন হারেসা (রা.)-এর নেতৃত্বে রওয়ানা করিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহর এ বাহিনী মায়াবেন ভূমিতে উপনীত হবার পর জানা গেলো, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস এক লাখ সশস্ত্র সৈন্য সমভিব্যহারে যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করছে। উপরন্তু লাখম ও জুযাম

www.nagorikpathagar.org

প্রভৃতি গোত্রের আরো এক লাখ সৈন্যের সম্মিলিত শক্তিশালী বাহিনী রোম সম্রাটের সাহায্যার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হয়েছে। এখন প্রকারান্তরে তিন হাজার নিরস্ত্র মুসলিম সৈন্যের দুই লাখ সশস্ত্র অস্ত্রসজ্জিত যোদ্ধা বাহিনীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পালা পড়েছে। এ সময় মুসলিম বাহিনী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কেউ বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দূত পাঠিয়ে অবহিত করা হোক, হয়তো আমাদের জন্য সাহায্যকারী দল পাঠানো হবে, অথবা যা নির্দেশ হবে তাই কার্যকর করা হবে। হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)-ও মুসলিম বাহিনীতে ছিলেন। তিনি মুসলমান যোদ্ধাদের চাঞ্চল্য, দ্বিধা দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এতে তিনি সুস্পষ্ট করে দেন, সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধ এবং ইসলামী জেহাদের মাঝে আসমান-যমীনের পার্থক্য। মুসলমান কখনো সংখ্যাধিক্য এবং সাজ সরঞ্জামের ওপর নির্ভর করে জেহাদ করে না। এখানে মূতার রণাঙ্গণে হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) প্রদত্ত ভাষণের অনুবাদ উদ্ধৃত করা হলো,

'হে আমার জাতি! আল্লাহর শপথ, যে বিষয় এখন তোমরা অপছন্দ করছো, তা তো হচ্ছে সে বিষয়, যা লাভের উদ্দেশে তোমরা ঘর থেকে বের হয়েছিলে এবং তা হচ্ছে শহীদী জীবন প্রাপ্তি। আমরা তো সাজ-সরঞ্জাম, পার্থিব শক্তি অথবা সংখ্যাধিক্যের ভরসায় কখনো মানুষের সাথে যুদ্ধ লড়ি না; বরং শুধু সে দ্বীনের ভরসায়ই আমরা মানুষের সাথে যুদ্ধ লড়ে থাকি, যে দ্বীনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সম্মান মর্যাদা দান করেছেন।

সুতরাং হে আমার প্রিয় ভায়েরা! তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও। অবশ্যই তোমরা বিজয় অথবা শহীদী জীবন– এ দুটি কল্যাণের একটি লাভ করবে।'

হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) প্রদত্ত উল্লিখিত ভাষণ মুসলিম বাহিনীর মাঝে নব-প্রাণের সঞ্চার করে তাদের বিস্মৃত পাঠ স্মরণ করিয়ে দেয় এবং মুষ্টিমেয় তিন হাজার সংখ্যাবিশিষ্ট মুসলিম বাহিনী দুই লাখ সেনাবিশিষ্ট বিশাল রোমক বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ ঐতিহাসিক যুদ্ধের পরিণতি যা প্রকাশ পেয়েছে তাও জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করেছে। যুদ্ধ জেহাদ, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে দ্বীন, স্থৈর্য, গাম্ভীর্য এবং শরীয়ত অনুসরণের যে কি প্রভাব, তা আজকাল আমাদের আধুনিকতাবাদী জ্ঞানপ্রবরদের হৃদয়ঙ্গম হওয়ার কথা নয়, কিন্তু যেসব সম্মানিত ব্যক্তিত্ব সর্বাগ্রে ইসলামে প্রবিষ্ট হয়েছেন এবং ময়দানে অবতরণ করেছেন, যারা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালন এবং ইসলামী রাজনীতির প্রথম শিক্ষক ছিলেন, যারা কয়েক সপ্তাহে– কয়েক মাসে জগতের মানচিত্র পাল্টে দিয়েছেন, তারা নিজেদের লব্ধ অভিজ্ঞতার সুবাদে মূতার রণাংগনে সংঘটিত অসম্ভব অবিশ্বাস্য ঘটনার মূলতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন এবং তারা নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ সে মূলতত্ত্বেরই প্রচার করতেন।

আজও যদি মুসলমানরা সজাগ হয়ে ইংরেজ ও হিন্দুদের নিরর্থক রাষ্ট্র পরিচালন পদ্ধতির গলার বেড়ি ছুঁড়ে ফেলে নিরেট নির্ভেজাল একটি ইসলামী রাষ্ট্র সরকার পরিচালন পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি দিতো এবং সেসব সুবিজ্ঞ পারদর্শী রাষ্ট্রনীতিবিদদের

www.nagorikpathagar.org

পদাংক অনুসরণ করতো, যাদের সফল রাষ্ট্র পরিচালননীতির শক্তিমত্তা দৃঢ়তা প্রাচ্য প্রতীচ্যসহ ইউরোপ ও এশিয়ায় স্বীকৃত।

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মোজেযা

ফাযালা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কাবা শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। ফাযালা ইবনে ওমায়র মালূহও তাওয়াফ শুরু করেছেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো, অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে শহীদ করে দেবেন। তার মনের কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। তাওয়াফ করতে করতে ফাযালা তাঁর কাছে এসে পড়েন। তিনি ফাযালাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি ফাযালা? ফাযালা নিবেদন করলেন, নিসন্দেহে, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার নামই ফাযালা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মনে কি ভাবনা পোষণ করছো? ফাযালা কথাবার্তার ধারা পাল্টানোর উদ্দেশে বললেন– না, কিছুই নয়। আমি তো আল্লাহ্‌র যেকেরে রত ছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বীয় দয়ালু স্বভাবহেতু তাঁর অন্তরের রহস্য প্রকাশ না করে এরশাদ করলেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। সাথে সাথে নিজের হস্ত মোবারক ফাযালার বক্ষের ওপর রেখে দেন। ফাযালা বলেন, আল্লাহর শপথ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নিজের বরকতময় হাত আমার বক্ষের ওপর থেকে উঠিয়ে নিলেন, তখন আমার অন্তরে কোনো বস্তুই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে প্রিয় ছিলো না। ফাযালা অনতিবিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর সেই ফাযালা– যিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে হেরেম শরীফে প্রবেশ করেছিলেন, তিনিই রসূলের মহব্বতে বন্দী হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মাত্র একবারের সাক্ষাতেই সে গভীর প্রভাব মনে ধারণ করে ফিরে গেলেন, যার ফলে কুফুর ও জাহেলিয়াতের তামাম অভ্যাস আচরণ, রীতিনীতি একেবারে পরিত্যক্ত হয়ে গেলো। ফাযালা স্বগৃহে ফিরে এসেছেন। এখানে এক রমণীর সাথে তার সাক্ষাত হয়, যার সাথে তার জানাশোনা ও পরিচয়ের সম্পর্ক ছিলো। যে রমণীর কাছে তিনি গমনাগমন করতেন– এ রমণী তার সাথে কিছু আলাপ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। এ সময় ফাযালা কিন্তু গভীরভাবে আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং এতোদিনের সব প্রীতি ভালোবাসা, প্রবৃত্তির কামনা বাসনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চরণতলে কোরবানী দিয়ে এসেছেন। তিনি তখন রমণীটির প্রবৃত্তির ইচ্ছার প্রত্যুত্তরে মাত্র কয়েক ছত্র কবিতা আবৃত্তি করেন। যার মর্মার্থ নিম্নরূপ–

'প্রিয়া বললো, এসো, কথা বলবো, আমি বললাম, আর কখনোই নয়, আল্লাহ তায়ালা এবং ইসলাম এ থেকে নিষেধ করেন।'

মক্কা বিজয়ের দিন যদি তুমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর গোত্রের লোকদের দেখতে, যখন মূর্তি প্রতিমাসমূহ ভাংগা হচ্ছিলো, তা হলে তুমি দেখতে, আল্লাহর দ্বীন সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং শেরেক ও কুফুরের চেহারার ওপর অন্ধকার ছেয়ে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ! আল্লাহ!! কি প্রভাব প্রতিক্রিয়া আর ফয়য নিহিত ছিলো এ দৃষ্টিতে। জীবনভর চেষ্টা সাধনা করেও যা অর্জিত হতে পারে না, তা মাত্র একবার দৃষ্টি নিক্ষেপের ফলেই তা সম্ভব হলো। *(আসরুল উয়ুন ঃ ইবনে সাইয়্যোদিন নাস)*

একজন কবি বলেন–

অন্তরে স্থির হয়ে গেছে মহাপ্রলয়ের দিনের অস্থিরতা, তার দৃষ্টির সম্মুখে দুচার দিনই তো মাত্র অবস্থান করেছিলাম।

নবুওয়তের এক বিস্ময়কর ঘটনা

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতেকাল পরবর্তী মোজেযা

এখানে যে ঘটনাটি বর্ণিত হচ্ছে, তা কোনো স্বপ্নদৃষ্ট বা রূপকথা নয়– এটা সত্য ঘটনা। যা হাদীস শাস্ত্রের বর্ণনাসূত্রের রীতিমাফিক বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নবম হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব আল্লামা আবদুল আযীয মক্কী (র.) স্বরচিত পুস্তিকায় ফয়যুল জূদ আলা হাদীসে শীবাতনী হুদ পুস্তিকায় আরেফ বিল্লাহ হযরত সাইয়েদ ইয়াফেয়ী রচিত 'নাশরুল মাহাসেন' গ্রন্থে সূত্রে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। হযরত ইয়াফেয়ী (র.) বলেন, এ ঘটনা বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে আমার কাছে পৌঁছেছে এবং সমকালে এ ঘটনাটি অনেক প্রসিদ্ধিও লাভ করেছিলো।

ঘটনাটি হচ্ছে, আরেফ বিল্লাহ শায়খ ইবনুয যাগাব ইয়ামানী (র.)-এর সব সময়ের অভ্যাস ছিলো, তিনি ভ্রমণ থেকে এসে সর্বপ্রথম হজ্জ আদায় করতেন। অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রওযা যেয়ারতের উদ্দেশে হাযির হতেন। দরবারে উপস্থিতির সময় তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তার দুই সঙ্গী হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারূক (রা.) সম্পর্কে প্রেমপূর্ণ কাসীদা রচনা করে পবিত্র রওযা মোবারকের সামনে আবৃত্তি করতেন।

একবার হযরত ইবনুয যাগাব ইয়ামানী (র.) অভ্যাস অনুযায়ী কাসীদা আবৃত্তি করে অবসর হলে এক রাফেযী *(হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে যারা খারাপ ধারণা পোষণ করে)* তার খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, আপনি আজ আমার দাওয়াত কবুল করুন। তিনি বিনয় এবং সুন্নতের অনুসরণে রাফেযী লোকটির দাওয়াত কবুল করেন। দাওয়াতকারী লোকটি রাফেযী এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারূক (রা.)-এর প্রশংসা স্তুতি করায় সে ক্ষিপ্ত হয়েছে, এটা তিনি জানতেন না। তিনি ওয়াদামাফিক দাওয়াতকারী রাফেযীর ঘরে পদার্পণ করেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করতেই গৃহস্বামী রাফেযী তার দুই হাবশী ক্রীতদাসকে ইংগিত করে– যাদের সে আগেভাগেই তাদের করণীয় বুঝিয়ে রেখেছিলো। মনিবের ইংগিত পেতেই ক্রীতদাসরা এ ওলীআল্লাহর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার জিভ কেটে ফেলে। এর পর দুর্ভাগা রাফেযী লোকটি বলল, যাও! এ কর্তিত জিভ আবু বকর ও ওমরের কাছে নিয়ে যাও, তুমি যাদের প্রশংসা স্তুতি করে থাকো, তারা তোমার কর্তিত জিভ জোড়া লাগিয়ে দেবে।

www.nagorikpathagar.org

সম্মানিত শায়খ কর্তিত জিভটি হাতে নিয়ে পবিত্র রওযা অভিমুখে দৌড়ে যান এবং রওযা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ঘটনা ব্যক্ত করে কান্নাকাটি করেন। রাতে তিনি স্বপ্নে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতলাভে ধন্য হন। তাঁর সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং ওমর ফারূক (রা.)-ও রয়েছেন। এ ঘটনার কারণে তারাও চিন্তাযুক্ত ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শায়খ ইবনুয যাগাব ইয়ামানী (র.)-এর হাত থেকে কর্তিত জিভখানা নিজের হাতে নেন এবং শায়খকে কাছে টেনে কর্তিত জিভখানা তার মুখে স্বস্থানে রেখে দেন।

এ স্বপ্ন দেখার পর হযরত শায়খ জাগ্রত হয়ে দেখতে পান, তার জিভ একেবারে সুস্থাবস্থায় স্বস্থানে লেগে রয়েছে। নবুওয়তের দরবারের এ সুস্পষ্ট মোজেযা দেখে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তী বছর তিনি যথারীতি রওযা মোবারকের সম্মুখে প্রশংসাসূচক কাসীদা আবৃত্তি করে অবসর হচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি দাওয়াত কবুলের আবেদন জানায়। শায়খও আল্লাহর ওপর ভরসা করে এ দাওয়াত কবুল করেন এবং দাওয়াতকারীর সাথেই গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, এটা তো তার গত বছরের সেই ঘর। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনি ঘরে প্রবেশ করেন। দাওয়াতকারী সসম্মানে তাকে বসান এবং অত্যন্ত সুস্বাদু উপাদেয় খাবার পরিবেশন করেন। খাওয়া দাওয়া শেষে দাওয়াতকারী হযরত শায়খকে পার্শ্ববর্তী এক কামরায় নিয়ে যায়। সেখানে একটি বানর বসা রয়েছে। গৃহস্বামী হযরত শায়খকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জানেন কি, এ বানর কে? শায়খ জবাব দিলেন, না তো! আমি এর সম্পর্কে কিছুই জানি না। গৃহস্বামী বললো, এ সে ব্যক্তি যে আপনার জিভ কেটেছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাকে বানরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। এ বানর আমার পিতা, আর আমি তার ছেলে।

সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রকাশ্য মোজেযাসমূহের সামনে আলোচ্য ঘটনা কোনো বড়ো কিছু নয়। তবে এ থেকে প্রমাণিত হয়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেমন তাঁর পবিত্র রওযা মোবারকে জীবিত রয়েছেন, তেমিন তাঁর মোজেযাসমূহের ধারাক্রমও চলমান রয়েছে। এ রকম ঘটনা একটি দুটি নয়; বরং উম্মতের সর্বস্তরের মানুষ এ ধরনের হাজার হাজার ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছেন।

আরেক বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত আবু আবদুল্লাহিল জালা (র.) বর্ণনা করেন, এক বছর আমি অত্যন্ত দারিদ্রপীড়িত এবং নিরন্ন অভুক্ত ছিলাম। ঘটনাক্রমে মদীনা তাইয়েবায় উপস্থিতির সৌভাগ্য হয়। আমি রওযা মোবারকের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সালামের পরে নিবেদন করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম! আমি নিরন্ন অভুক্ত এবং আজ আমি আপনার মেহমান। একথা বলে রওযা মোবারকের সম্মুখ থেকে অবসর হয়ে এসে শুয়ে পড়ি। স্বপ্নে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতলাভে ধন্য হই। তিনি স্বহস্তে আমাকে একটি রুটি দান করেন। আমি স্বপ্নঘোরেই সে রুটি খেতে শুরু করি। কিছু অংশ খেতেই আমার চোখ খুলে যায়। দেখতে পেলাম, রুটির বাকি অংশ তখনও আমার হাতে রয়েছে। *(ফয়যুল জূদ)*

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বময় ইসলাম কিভাবে বিস্তার লাভ করছে?

ইসলাম বিদ্বেষী ইসলাম বিরোধী ইউরোপীয় এবং হিন্দু ঐতিহাসিকরা সরলপ্রাণ সাধারণ মানুষকে এ বলে বিভ্রান্ত করছে যে, ইসলাম বিশ্বময় যে এতো বিস্তার লাভ করেছে, এর কারণ ইসলামের সৌন্দর্য নয়; বরং মুসলমানদের জোর জবরদস্তি। শক্তি প্রয়োগের ফলেই ইসলাম বিশ্বময় এতোটুকু বিস্তৃতি লাভ করেছে। তরবারির জোরে মানুষকে মুসলমান বানানো হয়েছে। এ এক মাথামুন্ডুহীন নিরর্থক কথা, যা ইসলাম বিদ্বেষী ইসলাম বিরোধীরা গেয়ে চলেছেন। যদিও তাদের মধ্য থেকেই কিছু প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তি এরূপ মাথামুন্ডুহীন নিরর্থক অভিযোগ যথেষ্ট খন্ডন করেছেন, কিন্তু বিষয়টি ইতিহাসের আলোকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশের জন্যে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, হিন্দুস্তানের গর্বের ধন, দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন মোহতামেম হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান ওসমানী (র.)-এর একটি দীর্ঘ লেখা দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত 'আল-কাসেম' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। সর্বজনপ্রিয় হওয়ার কারণে পরবর্তীতে তা 'এশাআতে ইসলাম' নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও মুদ্রিত হয়।

এ বিষয়ের অপর দিক হচ্ছে, ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে কখনো শক্তি প্রয়োগ বা জোর জবরদস্তি করা হয়নি, কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট প্রবৃত্তিপূজারী অমুসলিমরা সর্বদাই ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ এবং জোর জবরদস্তির অস্ত্রই ব্যবহার করে চলেছে। অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণে বাধাদান এবং মুসলমানদের ইসলাম পরিত্যাগ করানোর উদ্দেশে কি সব বর্বরোচিত এবং লজ্জাকর উপায় উপকরণ অবলম্বন করা হয়েছে, তা আজও ইতিহাসের পাতায় বিধৃত রয়েছে।

আমি একজন নও-মুসলিম ডক্টর খালেদ শেলড্রকের বক্তৃতা এখানে উপস্থাপন করছি। *(মাসিক আল মুফতী, দেওবন্দ)*

ডক্টর খালেদ শেলড্রক কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন?

প্রখ্যাত ইংরেজ নও-মুসলিম আল্লামা খালেদ শেলড্রক মিসরীয় যুবকদের সংগঠন 'জমিয়তে শোব্বানুল মুসলিমীন, কায়রো'র অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত এক বৃহৎ সুধী সমাবেশে যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন তা এখানে পেশ করা হচ্ছে। ডক্টর খালেদ শেলড্রকের ভাষণ থেকে এ সত্য পরিস্ফুট হয় যে, ইউরোপে ইসলামের প্রচার কাদিয়ানী মোবাল্লেগ (প্রচারক)-দের চেষ্টা সাধনার কাছে কিছুমাত্র দায়বদ্ধ নয়; বরং শিক্ষিত ইউরোপীয়রা নিজেদের অধ্যয়নের ভিত্তিতে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে।

ডক্টর খালেদ তার ভাষণের শুরুতে বলেন, আমি কালেমা তাইয়েবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ দ্বারাই আমার ভাষণ শুরু করতে চাই। আমার সুপ্ত প্রেরণার দাবীও তাই। আমি যথেষ্ট চিন্তা ভাবনার পর ইসলাম গ্রহণ করেছি। আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন, আমি দ্বীন ইসলামের শিক্ষা প্রথম তার অনুসারী সহযোগীদের গ্রন্থ থেকে নয়; বরং ইসলাম বিরোধীদের বই পুস্তক থেকেই লাভ করেছি।

আমি বৃটিশ পিতামাতার ঘরে জন্ম লাভ করেছি। তারা ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের সাথে সম্পর্কিত। আমার আব্বা আমাকে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের একজন পাদ্রীরূপে দেখতে

www.nagorikpathagar.org

আগ্রহী ছিলেন। তাই আমাকে ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং ধর্মীয় বিষয়বস্তু আলোচনারত দেখলে আমার আব্বা খুশী হতেন। আমি একথা বিবৃত করা সমীচীন মনে করছি যে, যদিও বৃটেনের মানুষরা প্রকাশ্যত খৃস্টবাদের অনুসারী, কিন্তু তাদের শতকরা নব্বই জনই খৃস্টবাদের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। আর আমি জোর গলায় নিজের সম্পর্কে ঘোষণা করছি, জীবনে একটি দিনের জন্যেও আমি খৃস্টবাদের অনুমানসর্বস্ব মূলনীতির প্রবক্তা হইনি। আপনারা জানেন, এক একক সত্তা আল্লাহ তায়ালা তিন সত্তার সমষ্টি– খৃস্টবাদের ভিত্তি উল্লিখিত ধর্ম বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত হয়েছে, আর এটা এমন এক বিশ্বাস, যা গ্রহণ করতে জ্ঞান বিবেক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। পিতা-পুত্র সর্বদা সর্বকালে সর্বাবস্থায় বর্তমান থাকবেন, এটা কি করে সম্ভব! যখনই পিতার অস্তিত্ব ধারণা করা হবে, তার সাথে পুত্রের অস্তিত্ব মেনে নেয়াও অত্যাবশ্যক। এটা এক দুর্বোধ্য বিশ্বাস। হুশ জ্ঞানসম্পন্ন কোনো মানুষ তা মেনে নিতে পারেন না। এতদসত্ত্বেও খৃস্ট বিশ্বাস ত্রিত্ববাদের ওপর আড়ি ধরে আছে, তা যতোই বোধের অগম্য হোক।

আপনারা এও অবগত আছেন, খৃস্টানরা ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হযরত ঈসা মাসীহ আলাইহিস সালামের জন্ম দিবস উদযাপন করে। অথচ তারা নিজেদের ধারণা বিশ্বাসের সপক্ষে ঈসা মাসীহ আলাইহিস সালামের সমকালীন অথবা নিকটবর্তী যুগের কোনো ব্যক্তিত্বের সূত্র উপস্থাপনে অক্ষম। মূলত এটা একজন পোপের মস্তিষ্কপ্রসূত, যার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই; বরং অংকশাস্ত্রের মূলনীতি খৃস্টানদের এ ধারণা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ ব্যাপারে আসল কথা হচ্ছে, ২৫শে ডিসেম্বর ছিলো প্রাচীন কালের প্রতিমা পূজারীদের এক পবিত্র সম্মানিত দিন। এরা ছিলো সূর্য দেবতার পূজারী। তাই যখন তাদের সূর্য দেবতা শীতকালীন বিবর্তন নিশেষ করে নেয়, তখন তারা এর আগের দিন আনন্দোৎসব উদযাপন করতো এবং এ দিনকে নিজেদের দেবতার জন্মদিন বলে মানতো। যে সূর্য দেবতা তাদের ধারণা বিশ্বাসমতে সমগ্র জীবন জগতের অস্তিত্বলাভের উৎসমূল এবং সূর্য দেবতা সম্পর্কে এ বিশ্বাসকেই খৃস্টানরা ঈসা মাসীহ আলাইহিস সালামের জন্মদিনের বিশ্বাসে পরিবর্তন করে দেয় এবং প্রতিমাপূজারীদের প্রাচীন রীতি প্রথা মোতাবেক ২৫শে ডিসেম্বরকে ঈদ (আনন্দোৎসব)-এর দিন বলে সাব্যস্ত করে। অথচ তাদের কাছে কোনো জ্ঞানগত বা ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, যা দ্বারা তারা ২৫শে ডিসেম্বরকে হযরত ঈসা মাসীহ আলাইহিস সালামের জন্মদিন প্রমাণ করতে সক্ষম। অনুরূপ প্রাচীনকালের প্রতিমা পূজারীরা মধ্য বসন্ত ঋতুর আগের দিন আনন্দোৎসব উদযাপন করতো। কেননা, তারা বিশ্বাস করতো, আজ তাদের সূর্য দেবতা সে অন্ধকারের ওপর বিজয়ী হয়েছে, যা তার পথপরিক্রমায় প্রতিবন্ধক হয়ে পড়েছিলো। সূর্য দেবতা অন্ধকারের ওপর বিজয়ী হবার ফলে এখন তার শক্তি এবং আলোক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব, প্রাচীনকালের প্রতিমা পূজারীদের অনুকরণে যেমন খৃস্টানরা ঈসা মাসীহ আলাইহিস সালামের জন্মদিনে পরিবর্তন সাধন করে সে দিনকে আনন্দোৎসব উদযাপনের দিন বলে মেনে নিয়েছে, তেমনি তারা মধ্য বসন্ত ঋতুকে হযরত ঈসা মাসীহ আলাইহিস সালামের শক্তি লাভের দিন সাব্যস্ত করে সেদিনকে ঈদুল কেয়ামাহ (ইস্টার-ডে) বানিয়ে নিয়েছে। যা

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন প্রতিমা পূজারীদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের সূর্য দেবতার শক্তি লাভের দিন।

পিতা-পুত্রের খৃস্ট বিশ্বাসও একদম প্রাচীন প্রতিমা পূজারীদের ধর্ম বিশ্বাস থেকে গৃহীত। এর প্রমাণ হচ্ছে, বুদ্ধ মতের অনুসারীরা বুদ্ধের শিশুকালের ছবি তার মা মায়ার সাথে যেভাবে যে ঢংয়ে নির্মাণ করে, ঈসা মাসীহ আলাইহিস সালামের শিশুকালের অনুরূপ ছবিই তার মা মারইয়ামের সাথে গির্জাসমূহে আমরা ক্ষোদিত দেখতে পাই।

প্রকৃতপক্ষে খৃস্টানরা হযরত ঈসা মাসীহ আলাইহিস সালামের যে ব্যক্তিত্বের দাবীদার, তার কোনো ঐতিহাসিক মর্যাদা নেই। যদি কোনো সমালোচক পর্যালোচক জ্ঞানগত পদ্ধতিতে এ বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা পর্যালোচনা করে, তবে তাকে রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাপ্ত হযরত ঈসা মাসীহ আলাইহিস সালামের প্রতিকৃতি থেকেই আপনারা আমার উক্তির সত্যতা অনুমান করতে পারেন। আপনি অষ্ট্রিয়ার গির্জাসমূহে হযরত ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামের প্রতিকৃতি এক রকম দেখতে পাবেন তো ইটালীর গির্জাসমূহে দেখতে পাবেন অন্য রকম। গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা ভাবনার পরও আপনি ঈসা মাসীহ আলাইহিস সালামের এ সব কাল্পনিক প্রতিকৃতি থেকে তার আসল প্রতিকৃতি সম্পর্কে ধারণালাভে সক্ষম হবেন না।

ইসলামের বিরুদ্ধে খৃস্টবাদের বিভ্রান্তিমূলক প্রোপাগাণ্ডা

সারকথা হচ্ছে, খৃস্টানদের বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে খৃস্টবাদের মূলনীতি এবং ঈসা মাসীহ আলাইহিস সালামের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে বুনিয়াদী বিরোধ রয়েছে। খৃস্টবাদের এসব জটিলতা আমাকে অন্যান্য ধর্মমত সম্পর্কে অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ করেছে। একারণেই বিশ্বে প্রচলিত যাবতীয় ধর্মমত সম্পর্কে ইংল্যান্ডের লাইব্রেরীসমূহে যতো গ্রন্থ আমি পেয়েছি, আমি সেগুলো অধ্যয়ন করতে শুরু করি। ইংল্যান্ডের লাইব্রেরীসমূহে আমি বিশ্বের প্রত্যেক ধর্মমত সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীই পেয়েছি, যেসব থেকে সংশ্লিষ্ট ধর্মমত সম্পর্কে যথেষ্ট অবগতি লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু লাইব্রেরীসমূহে ইসলাম সম্পর্কে যতো গ্রন্থ দেখি, সেসব গ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কে ভর্ৎসনা তিরস্কার ব্যতীত আর কোনো আলোচনাই নেই। এসব গ্রন্থে আলোচ্য যাবতীয় বিষয়ের সারনির্যাস হচ্ছে, ইসলাম স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মমত নয়; বরং তা নিছক খৃস্ট সাহিত্য থেকে গৃহীত কতিপয় উক্তির সমষ্টিমাত্র।

ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে স্বভাবতই আমার মনে জাগলো, ইসলাম বাস্তবেই যদি এমন অন্তঃসারশূন্য অবাস্তব ভিত্তিহীন ধর্মমত হবে, যেমন আমার পঠিত গ্রন্থাবলী থেকে পরিস্ফুট হয়, তা হলে ইসলাম সম্পর্কে এতো বিরূপ প্রশ্ন কেন, কেন এতো ভর্ৎসনা তিরস্কার, আর কেনই বা ইসলামের মোকাবেলা ও প্রতিরোধে এতো শক্তি ক্ষয় করা হচ্ছে। আমার অন্তরে এ ধারণা বিশ্বাস স্থায়ী হয়ে যায় যে, যদি দ্বীন ইসলামের তরফ থেকে তাদের ভয়ের কারণ না থাকতো এবং ইসলামের জীবনশক্তি সম্পর্কে এরা ভীত শংকিত না হতো, তাহলে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়,

www.nagorikpathagar.org

তা সম্পর্কে তর্ক বিতর্কে এবং তার দুর্নাম রটনায় এতো সাধ্য সাধনা ও পরিশ্রম সহ্য করতো না। তাই আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেই, ইসলাম সম্পর্কিত যতো গ্রন্থ আমি পাবো, তা সবই একেক করে দেখবো।

আপত্তিপূর্ণ প্রশ্ন যারা উত্থাপন করেন তাদের তরফ থেকে ইসলামের কোনো শংকা নেই। এরা যদি বিদ্বেষী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে, তবু এ থেকেই ইসলামের শক্তি ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে এবং এ দ্বারা ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের রাস্তা সৃষ্টি হবে। কবির ভাষায়– কুফুরের আচরণে আল্লাহর নূর হাসছে, এ প্রদীপ মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করা যাবে না।

যখন আমার হেদায়াত লাভের সৌভাগ্য হয় এবং আমি অন্তরের পর্দার আড়াল থেকে আওয়ায আসতে শুনি– আমি মুসলমান, তখন আমি যথারীতি মুসলমানদের দলে শামিল হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করি। এ সময় এক ব্যক্তি আমাকে জানালেন, ইসলামী খেলাফতের রাজধানী শহরে একটি মাসজিদ আছে, যার নাম আয়া সূফিয়া, তা ইসলামের কেন্দ্র। তখন আমি সে মাসজিদের ঠিকানায় নিজের সার্বিক অবস্থা লিখে পাঠাই। আমার পত্র কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছলে ডাক বিভাগ তা সুলতান আবদুল হামীদের সমীপে পাঠিয়ে দেয়। সুলতানের সেক্রেটারী জবাবী পত্রে আমাকে লিখে পাঠালেন, আপনি প্রখ্যাত ইংরেজ নও-মুসলিম ব্যারিস্টার শেখ আবদুল্লাহ কোয়েলামের সাথে সাক্ষাত করুন। আপনারা বুঝতেই পারেন, এমন একজন ইংরেজ নও-মুসলিমের সাথে সাক্ষাত করতে পেরে আমি কতোটা আনন্দিত হয়েছি, যার কাছে আমি খোলামেলাভাবে অন্তরের সব গোপন কথা বলতে পারবো এবং স্বাধীনভাবে নিজের চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারবো। আর আবদুল্লাহ কোয়েলাম ছিলেন সে ব্যক্তিত্ব, যার একক প্রচেষ্টায় ইংল্যান্ডে পাঁচশ'র অধিক ইংরেজ ইসলাম গ্রহণ করেছে।

এ সময় আমার ইচ্ছা হয় আমার আব্বাকে ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত করতে। সুতরাং আমি বিষয়টা তাকে অবহিত করি। আমি এখানে এ বাস্তবতা প্রকাশ সমীচীন মনে করছি যে, খৃষ্টবাদকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোয় আমার আব্বা মোটেও ততোটুকু দুখিত হননি, যতোটুকু দুঃখিত হয়েছেন আমার ইসলাম গ্রহণে। আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদে আমার আব্বার অন্তরে সাংঘাতিক আঘাত লাগে। এতে তিনি এবং তার বংশীয়রা সাংঘাতিক রকম দুখ ভারাক্রান্ত হন। সম্ভবত তাদের বলা কওয়ায়, অনুরোধ উপরোধে আমার পুনরায় খৃষ্টবাদ গ্রহণই তাদের এ দুখভার কিছুটা লাঘব করতে পারতো, কিন্তু আমি অত্যন্ত সানন্দে ঘোষণা করছি, আমি ইসলামের আঁচল ধারণ করেছি আজ পঁয়তাল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আজ আমি ইসলাম গ্রহণকালের তুলনায় ইসলামের মৌলনীতিসমূহের ওপর অনেক গুণ বেশী বিশ্বাসী এবং আমি ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের একজন স্বীকৃতিদানকারী। আমি ওলীআল্লাহ হওয়ার দাবী তো করছি না, তবে অবশ্য পালনীয় ইসলামের ফরযসমূহ আদায়ে আমি কোনো প্রকার ত্রুটিও করি না।

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানদের কর্মক্ষেত্রে দ্বীনের নমুনা হওয়া কর্তব্য

আমি পরিপূর্ণ প্রত্যয় পোষণ করি, একদিন সমগ্র জগত ইসলামের ঝান্ডাতলে আশ্রয় নেবে, কিন্তু তা ইসলাম অনুসারীদের ইসলামের যথার্থ নমুনা হওয়ার এবং ইসলামের মূলনীতিসমূহ কার্যকরভাবে জগদ্বাসীর সম্মুখে উপস্থাপনের ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন ইসলামী দেশ সফরকালে আমি এটা অনুধাবন করেছি, যেসব দেশে মুসলমান সংখ্যাগুরু, সেখানে তাদের ওপর দুর্বলতা, সাহসহীনতা এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা বেশী। আর যেসব দেশে তারা সংখ্যালঘু, সেখানে তারা দ্বীনের মূলনীতিসমূহের অনুসরণে এবং দ্বীনের বিধি-বিধানসমূহের ওপর আমলের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অগ্রসর। যদি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমান নিজেদের দ্বীনের অনুসরণ করে এবং তাদের জীবনধারায়, জীবনাচরণে ইসলামের মাহাত্ম্য মর্যাদা ফুটিয়ে ওঠাতে পারে, তাহলে এটা ইসলামের একটা আমলী তাবলীগ হবে। যা বিশ্বের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীকে ইসলামের মূলনীতিসমূহের প্রতি উৎসাহী করবে।

অমুসলিমরা যখন মুসলমানদের ইসলামের বিধি বিধান বিরোধী কাজ করতে দেখে, তখন তারা মুসলমানদের কর্মের আয়নায় ইসলামের বিবর্তিত রূপ দেখে ইসলামের প্রতি উন্নাসিক এবং বিদ্বিষ্ট হয়ে যায়। এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার; বরং আমি তো বলি, এ অবস্থায় যদি অমুসলিমদের বলা হয়, মুসলমানরা যা কিছু করছে, ইসলামের বিধান এর বিপরীত, তখনও অমুসলিমরা বলতে পারে, যদি ইসলামের বিধি বিধানে কোনো সৌন্দর্য নিহিত থাকতো, তাহলে ইসলামের অনুসারীরাই সর্বাগ্রে তা কার্যকর করতো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি কোনো মুসলমান অমুসলিমদের কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করে এবং সেখানে তার সামনে মদ পরিবেশন করা হয়, আর মুসলমান নিজের মানসিক উদারতা প্রশস্ততা প্রকাশ করার জন্যে মদ গ্রহণ করে, তা হলে তার এ কাজ অমুসলমানদের জন্যে প্রমাণ সাব্যস্ত হবে যে, এ মুসলমান লোকটি নিজের দ্বীনী শিক্ষার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। তা না হলে সে নিজে সর্বাগ্রে তা আমল করতো এবং নিজের আমলে অন্যদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হতো। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানই নিজের দ্বীনের মোবাল্লেগ-প্রচারক হতে পারেন- যদি তিনি ইসলামী রীতিনীতি, আচার আচরণ, স্বভাবচরিত্র এবং ইসলামী আইন বিধানের যথাযথ সংরক্ষণ করেন। সে ব্যক্তি ইসলাম প্রচারের প্রতিবন্ধকও হতে পারে, যদি তিনি এ বিষয়সমূহে শৈথিল্য ও উদাসীনতা প্রদর্শন করেন।

কোরআন করীম নিছক দ্বীনী বিধিবিধানসমূহের বর্ণনাসমষ্টিই নয়; বরং কোরআন মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন এবং পার্থিব জীবনের উত্তম পথপ্রদর্শক। এ বাস্তবতা আমি তখনই অনুধাবন করি, যখন আমি ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন শুরু করেছি। অথচ আমার অধ্যয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো সেসব অনুবাদ পঠন সামগ্রীর মাধ্যমে, যেসব অনুবাদ কর্মে ইসলামের পবিত্র শিক্ষাকে মসীলিপ্ত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম ব্যতিরেকে এমন কোনো দ্বীন নেই, যেখানে সর্বপ্রকার এবাদত মহান আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট এবং নির্ভেজাল তাওহীদের ঘোষণা করা হয়। খৃষ্টবাদ তো তার অনুসারীদের চেহারা তাদের স্বহস্ত নির্মিত প্রভুদের সামনে অবনত করায়। এ প্রকাশ্য সুস্পষ্ট শেরেকের সাথে ইসলামের সে সমুজ্জ্বল তাওহীদবাদের কি তুলনা হতে পারে, যে তাওহীদবাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে কোরআন কারীমের সূরা এখলাসে। বলা হয়েছে,

'বলো, আল্লাহ এক একক। আল্লাহ পরাজ্মুখ। তিনি কাউকে জন্ম দেননি– না কেউ তাঁর থেকে জন্ম নিয়েছে, আর না তাঁর সমকক্ষ কেউ রয়েছে।' (সূরা এখলাছ)

এটা নিসন্দেহ, কোরআন করীম যে আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করতে বান্দাদের পথ প্রদর্শন করেছে, সে আল্লাহ সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি ও কলুষমুক্ত এবং সর্বপ্রকার উত্তম গুণ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যখন মানুষ মূর্খতা অজ্ঞতা এবং তার শৈশবকাল অতিক্রম করছিলো, তখন তারা হাত এবং তুলি নির্মিত মাবুদদের নিয়ে খেলতো। দুঃখের বিষয়, আজকে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দেও মানুষের মধ্যে তার শৈশবে মূর্খতা অজ্ঞতা আহমকি ও বোকামি পরিদৃষ্ট হচ্ছে। স্রষ্টার চিন্তা-চেতনা, ধ্যান ধারণা সম্পর্কিত মানব জাতির শৈশবকালীন পদস্খলনের তামাশা আজও আপনারা গির্জাসমূহে দেখতে পারেন, কিন্তু মানব জাতির যৌবনকালের দৃশ্য পরিদৃষ্ট হবে মাসজিদসমূহে। যেখানে না ছবি আছে, আর না আছে প্রতিকৃতি, যা এবাদতকারীদের অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য সত্তার দিকে ধাবিত করে। অথচ এক একক লা শরীক আল্লাহ তায়ালাই যাবতীয় উত্তম গুণ বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রবিন্দু। তিনিই মানুষের সর্বপ্রকার এবাদতপ্রাপ্তির যথাযোগ্য অধিকারী। মানব জাতিকে এ সর্বোচ্চ মর্যাদায় উপনীত করার দায়িত্ব মহান পথপ্রদর্শক, সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওপর ন্যস্ত। যিনি মূর্তি প্রতিমাসমূহ ভেংগেছেন, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য শেরেকের সর্বপ্রকার প্রাচীন নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন এবং মানব জাতিকে অপমান অপদস্থতার স্তর থেকে বের করে সম্মানের সর্বোচ্চ স্তরে স্থাপন করেছেন, যা সর্বদিক থেকেই মানব জাতির মর্যাদার নিরিখে যথাযোগ্য ছিলো।

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আপনি ভূমন্ডলের যে কোনো দেশে গমন করবেন, যেখানেই মুসলমান বসবাসরত রয়েছে, সেখানেই আপনি নিজেকে অপরিচিত বলে অনুভব করবেন না; বরং আপনি সেখানে প্রিয়জনের স্থলে প্রিয়জন আর ভাইয়ের স্থলে ভাইই লাভ করবেন। অতএব, হে সমাবেশে অবস্থানকারীরা ভাইয়েরা! আমাদের না বলশেভিজমের প্রয়োজন আছে আর না কমিউনিজমের।

ইসলামী সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব

দুনিয়ার ধর্মমতসমূহ যেসব সৌন্দর্য আর গুণ বৈশিষ্ট্যের দাবীদার, তা আমাদের দ্বীন ইসলামে পরিপূর্ণরূপেই বর্তমান রয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব মন্দ বিষয় দ্বারা অন্যান্য ধর্মমত কলুষিত, মসীলিপ্ত, আমাদের দ্বীন ইসলাম সেসব থেকে মুক্ত পবিত্র। ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং একটি কর্মপদ্ধতি। যা সর্বকালে সর্বদেশে মানব

www.nagorikpathagar.org

সমাজের সফলতার দায়িত্বশীল। এর দ্বারাই সর্বাগ্রে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সাথে মানুষের পরিচিতি ঘটেছে। এ এক সামষ্টিক জাতি সত্তা, যা ব্যক্তিস্বার্থবোধ ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এর সদস্যরা জন্ম এবং ভৌগোলিক বিরোধের সাথে অপরিচিত। এ সামষ্টিক জাতিসত্তা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এমন শক্তিশালী জিঞ্জিরে আবদ্ধ, যাকে কখনো ধনাঢ্যতা, নিস্বতা এবং এ ধরনের অন্যান্য অস্থায়ী কার্যকারণ ছিন্ন করতে পারে না। আমি যখন দ্বীন ইসলামের এ মূলনীতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করি, তখনই আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, ইসলাম তার অন্তর্নিহিত এসব শক্তি ও সৌন্দর্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সকল নভোমন্ডলীয় ও ভূমন্ডলীয় শরীয়ত থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ফলে আমি আগে থেকে আরও বেশী করে দ্বীন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হই। দ্বীন ইসলামের আরেকটি বৈশিষ্ট্য আমাকে বেশী আকৃষ্ট করেছে এবং সে বৈশিষ্টের কারণে আমার অন্তরে ইসলামের সম্মান, মর্যাদা, গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলামে মদ হারাম– অবৈধ হওয়ার বিষয়টি। এটি দ্বীন ইসলামের একক সৌন্দর্য বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য ধর্মমত সম্পর্কিত গ্রন্থগুলো এর আলোচনা শূন্য; বরং আমরা তো খৃষ্টবাদে এ উম্মুল খাবায়েস– সকল অপকর্ম অপবিত্রতার মূল মদের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতেই দেখতে পাই। উদাহরণত সেন্ট পল শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছেন, যেন সে নিজের উদরের সুস্থতার জন্যে সামান্য পরিমাণে মদ পান করে। পানিভর্তি পাত্রসমূহ মদে পরিণত হয়ে যাবার ঘটনাও এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। আমি এও স্বীকার করি, কোনো কোনো খৃষ্ট ধর্মনেতাকে মদ থেকে আত্মরক্ষার হেদায়াত দান করতেও দেখা যায়, কিন্তু আমরা তো তাদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের সেসব সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহ থেকেও চোখ বন্ধ করে রাখতে পারি না, যেখানে সুস্পষ্টরূপে মদ পান করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আপনিই বলুন, আমরা কোন্‌টা মানবো আর কোন্‌টা ছাড়বো? ব্যক্তি বিশেষের লেখা না পবিত্র ধর্ম গ্রন্থসমূহের উৎসাহদানের কথা?

কিছু দিন আগে আমেরিকা মদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধাভিযান শুরু করেছিলো, কিন্তু আধুনিক সভ্যতার যাবতীয় উপায় উপকরণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের এ অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, এ অভিযান থেকে তাদের পিছু হটতে হয়েছে। আমেরিকার মদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধাভিযান আর মহাসংস্কারক রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মদ নির্মূলকরণের সাথে কি কোনো তুলনা হতে পারে? রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের জন্যে জীবনদানকারীদের বললেন, তোমাদের মালিক প্রভু আল্লাহ তায়ালা মদ হারাম ঘোষণা করেছেন, তখন তারা নির্দ্বিধায় মদের সব পাত্র উল্টে ফেলে দেন। মদের সর্বপ্রকার পাত্র ভেঙ্গে ফেলেন। সড়কসমূহের ওপর মদের নদী বয়ে যায়। ইউরোপ আমেরিকার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়– যাদের পথনির্দেশ এবং উপদেশের কারণে আমেরিকায় কিছু দিনের জন্যে মদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়েছিলো, তারা মুখে নাই বা স্বীকার করুন, কিন্তু তাদের অন্তর অবশ্যই মানব সমাজের সংস্কার ও পরিশুদ্ধকরণে আরবের মোহাম্মদ

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুপ্রভাব এবং তাঁর পথনির্দেশনার সাফল্য স্বীকার করে চলেছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান আমাদের বলছে, শূকরের গোশত মানব স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। শূকরের গোশতে এক বিশেষ ধরনের রোগজীবাণু পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, অগ্নিতাপ এ রোগজীবাণুগুলোর ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া করতে এবং এর ক্ষতি দূরীভূত করতে সক্ষম হয় না। যদিও খৃষ্টানদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থসমূহ শূকরের গোশত ভক্ষণ করতে বারণ করে, কিন্তু খৃষ্টানরা ব্যাপক হারে শূকরের মাংস ভক্ষণ করে থাকে। তারা শূকরের মাংস সম্পর্কে চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং নিজেদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থসমূহের নিষেধাজ্ঞার প্রতি কোনো পরোয়া করে না। পক্ষান্তরে মুসলমানরা দ্বীন ইসলামের নিষেধাজ্ঞানুযায়ী তা থেকে সযতনে আত্মরক্ষা করে চলে। দুনিয়ার কোথাও মুসলমানরা শূকরের মাংস ভক্ষণ করে না।

নিসন্দেহে খৃষ্টানরা এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত রয়েছে, তাদের কাছে যে ইঞ্জীল রয়েছে, তা হযরত ঈসা মাসীহ আলাইহিস সালামের পরে লেখা হয়েছে, আর যেহেতু তাদের সেসব মৌলিক বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহেরও জ্ঞান রয়েছে, যা তাদের ধর্ম গ্রন্থসমূহে অধিক হারে পাওয়া যায়, এ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং অবগতিই তাদের নিজেদের ধর্মবিধানসমূহের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শনে সাহসী করে তোলে, কিন্তু মুসলমানদের পূর্ণ প্রত্যয় রয়েছে, আজ যে কোরআন তাদের কাছে রয়েছে, অবিকল তাই কোরআনবাহক মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল করা হয়েছিলো। তাঁর ওপর নাযিল করা কোরআন এবং বর্তমানে মুসলমানদের কাছে থাকা কোরআনে এক বিন্দু বিসর্গও পার্থক্য নেই।

বিশ্বাসগত বাস্তবতা

খৃষ্টবাদের সব আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে অবগতি লাভের পর যখন আমি দ্বীন ইসলামের আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে যথাযথ পর্যালোচনা চালাই, তখন আমি ইসলামের সকল আকীদা বিশ্বাসকে জ্ঞান বিবেকের অনুকূল পাই। নির্ভেজাল তাওহীদবাদে বিশ্বাস, যা ইসলামের স্বতন্ত্র গর্ব, তা হচ্ছে বিশুদ্ধতম একটি বিশ্বাস। যে সম্পর্কে মানব জাতি অবগতি লাভ করেছে। ইসলামের তাওহীদী আকীদা বিশ্বাস ইলাহ– এবাদতের যোগ্য মহান সত্তার একত্ব, পালনকর্তার একত্ব এবং স্বয়ং জীবন ও জগত স্রষ্টার একত্বের সর্বপ্রকার নিখুঁত নির্ভেজাল গুণ বৈশিষ্ট্য প্রমাণে পরিপূর্ণ। সাথে সাথে ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত সকল নবী রসূলেরও সত্যায়ন করে।

মুসলমানরা যে একে অন্যকে সালাম করে, তা কেমন হৃদয়গ্রাহী ব্যবস্থা। এ সালামের মর্মার্থ কেমন সুন্দর আর সালামদান পদ্ধতিই বা কেমন মনোহারী। বিশেষত সালামদানকালে মানুষের অংগ প্রত্যংগের ইঙ্গিত! সুতরাং মুসলমানদের সালাম পদ্ধতির সাথে এ্যাটলী কেস্ট সালামের এবং দুনিয়ার অন্য সব জাতিগোষ্ঠী বা দলের সালাম দান পদ্ধতির কি কোনো তুলনা হতে পারে? কোনো কোনো ইউরোপিয়ান অভিযোগ করে– ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে। এটা একটা নীচুস্তরের মিথ্যাচার।

www.nagorikpathagar.org

অভিযোগ উত্থাপক স্বয়ং অবগত রয়েছে, তার অভিযোগ কতো বিভ্রান্তিকর, নির্জলা মিথ্যাচার এবং অযৌক্তিক। এ অভিযোগ একদিকে ইতিহাসের সুস্পষ্ট বর্ণনার বিপরীত, অন্য দিকে ইসলামী মূলনীতিরও বিরোধী। যদি ইসলাম তরবারির জোরেই বিস্তার লাভ করতো, তা হলে অদ্যাবধি ইসলামী দেশসমূহে যেসব গির্জা, দেবালয় এবং অনৈসলামী রীতিপ্রথা বিদ্যমান, যা ইসলামের যৌবনকাল থেকে তার প্রকৃত আদলে চলে আসছে, সেসবের কি কোনো অস্তিত্ব থাকতো? তদুপরি কোরআন করীমের সুস্পষ্ট ঘোষণার পর ইউরোপিয়ানদের এ নিরর্থক নির্জলা মিথ্যাচারপূর্ণ গলাবাজির কি কোনো গ্রহণযোগ্যতা অবশিষ্ট থাকতে পারে। কোরআন বলছে–

'দ্বীনে কোনো জবরদস্তি নেই।' তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন। হে নবী! তুমি কাফেরদের ওপর দারোগা নও।

(সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৫৬)

তরবারির ধারবলে ধর্মমত প্রচার তো স্বয়ং ইউরোপীয়দেরই কর্মপন্থা। ধর্মের নামে স্পেনের মুসলমানদের ওপর যে যুলুম অত্যাচার অবিচার চালানো হয়েছে, সেসবের আলোচনায় ইতিহাস গ্রন্থসমূহ রঞ্জিত আর খৃস্টানদের চেহারা কালিমাযুক্ত। ইউরোপিয়ানরা নিজেরাই স্বীকার করে, শার্লেমান যখন জার্মানীতে প্রবেশ করে তখন সে নির্দেশ জারি করে, যে ব্যক্তি খৃস্ট ধর্মমত কবুল করবে না, তাকে তরবারির আঘাতে উড়িয়ে দেয়া হবে। যদি কোনো ধর্মমত তরবারির শক্তিতে বিস্তার লাভ করে থাকে তা ইসলাম নয়; বরং তা অন্য কোনো ধর্মমত।

মুসলিম ভায়েরা, অনেক সময় হয়ে গেলো। এ বিষয়বস্তুর ওপর আপনাদের সামনে আমি যা কিছু বলতে চেয়েছিলাম, তার সব বলা হয়নি। আমি পুনরায় আপনাদের সম্মুখে ঘোষণা করছি, ইসলাম সম্পর্কে আমার জানাশোনা, জ্ঞান যতোই বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততোই আমার অন্তরে ইসলামের সম্মান মর্যাদা এবং বিশ্বাসও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি এ দাবী করছি না যে, আমার ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, তবে প্রয়োজনীয় ইসলামী জ্ঞান দ্বারা আমি অবশ্যই পরিতৃপ্ত হয়েছি। হযরত খালেদ সাইফুল্লাহ বিন ওলীদ (রা.) ইসলামী বিজয়াভিযানসমূহে যে ভদ্রতা, বীরত্বপূর্ণ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তার বিজয়াভিযানসমূহের ফলে ইসলামের যে দিনে দিনে উন্নতি হয়েছে, যেহেতু আমার অন্তরে তার গৃহীত কর্মপদ্ধতি এবং তার ফলাফলের যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে, তাই আমি সে মোজাহেদের নামে নিজের নামকরণ পছন্দ করেছি।

হে মুসলিম যুবকদল! আমার আলোচনা সমাপ্তির আগে আমি তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই, তোমাদের ওপর ইসলামের তরফ থেকে অনেক বড়ো দায়িত্ব অর্পিত হয়ে রয়েছে। সে দায়িত্ব সম্পাদনে তোমাদের জীবনবাজি রেখে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আমার মতো ইসলামের সেবকরা এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি। ইসলামের উন্নতি অগ্রগতি এবং ব্যাপক প্রচার প্রসারে তোমরা অনেক কিছু করতে পারো। সুতরাং সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা অবলম্বনে তোমরা কোনো প্রকার ত্রুটি অবহেলা করবে না। তা হলেই এ

www.nagorikpathagar.org

সংগঠন– জমিয়তে শোব্বানুল মুসলেমীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফল হবে। আর এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যে মুসলমানদের সেবা পরিচর্যা, তাও অর্জিত হবে। তোমরা সংগঠনের দায়িত্বশীলদের ভরসায় থাকবে না। তাদের অনেক অফিসিয়াল কাজকর্ম ও দায়িত্ব রয়েছে। তাই আসল কাজ তোমাদের যুবকদেরই করতে হবে। যদি তোমরা মিলেমিশে একাত্ম হয়ে তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনে তৎপর হও, তাহলে এ মর্যাদাপূর্ণ সংগঠনটি উন্নতি অগ্রগতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হবে। এ সময় আমি তোমাদের সাথে সেভাবেই কথা বলছি, যেভাবে এক বন্ধু আরেক বন্ধুর সাথে কথা বলে। আমি জানি, একজন বক্তার নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে তার বক্তব্য শেষ করা উচিত, কিন্তু বন্ধুসুলভ কথোপকথন এমনিই এ বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়। এক ভাই তার আরেক ভাইকে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারে। তোমরা অভিনিবেশ সহকারে আমার কথাগুলো শুনেছো বলে তোমাদের শুকরিয়া আদায় করছি। সাথে সাথে অনুবাদকেরও শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি এ কাজে প্রভূত কষ্ট স্বীকার করেছেন। আমার দুঃখ, আমি আরবী ভাষায় তোমাদের সম্বোধন করতে পারলাম না।

কাফেরদের জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থান

[আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)-এর আলোচনা থেকে গৃহীত। দারুল উলুম দেওবন্দের মোহতামেম হযরত মাওলানা কারী তৈয়ব (র.)-এর লেখনীতে 'আন নূর' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছে। আন নূর থেকে এ পুস্তকে তা আনা হয়েছে।]

প্রশ্ন ঃ হাফেয ইবনে কাইয়েম (র.) 'শেফাউল আলীল ওয়া হাবিউল আরওয়াহ' নামক পুস্তিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের বিপরীতে জাহান্নাম বিলুপ্ত হবার দাবী করেছেন। এতে কাফেরদের জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থানের ব্যাপারটা তো তাহলে অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। এটা সরাসরি সুস্পষ্ট বর্ণনার বিরোধী। এ বিষয়টি প্রয়োজনীয় দ্বীনী বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, তাই এখানে কোনো প্রকার সদর্থ করারও সুযোগ নেই। যদিও হাফেয ইবনে কাইয়েম (র.) কিছু কিছু হাদীস দ্বারা নিজের অভিমতের সপক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হাদীসসমূহ সাধারণভাবে দুর্বল বর্ণনাসূত্রের ওপর নির্ভরশীল। এগুলো কোনোটাই সমালোচনার বাইরে নয়। সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং তার প্রকাশ্য প্রমাণের বিপরীতে তা টিকতে পারে না। অবশ্য জাহান্নামের চিরস্থায়িত্বের ব্যাপারটি কিছুটা মানসিক দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করতে পারে, তা হচ্ছে তার উপস্থাপিত একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ। এর সারকথা হচ্ছে, শাস্তিদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধমক প্রদান। তাহলে অপরাধী শাস্তি ভোগের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়বে এবং ভবিষ্যতের জন্যে তাওবা করে অপরাধ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করবে।

এটা প্রকাশ্য যে, জাহান্নামীদের যখন জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে, তখন এমন কঠোর শাস্তির চাইতে ভীতিকর এবং অপরাধীকে ধমকদানের উপকরণ আর কি হতে পারে? তদুপরি জাহান্নামের কঠিন শাস্তির চাইতে আর এমন কোন্ শাস্তি রয়েছে যা তাওবার কারণ হতে পারে? তাই অপরাধীরা সেখানে নিক্ষিপ্ত হবার পরেই ভবিষ্যতে

www.nagorikpathagar.org

দৃঢ়তার সাথে কুফরী থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করবে, যা কোরআন করীমের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে প্রকাশিত হয়। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

'হে আমাদের মালিক, তুমি আজ আমাদের এ (আগুন) থেকে বের করে নাও, আমরা যদি দ্বিতীয় বারও (দুনিয়ায়) ফিরে গিয়ে সীমালংঘন করি, তাহলে অবশ্যই আমরা যালেম হিসেবে পরিঘনিত হবো।' *(সূরা মোমেনূন, আয়াত ১০৭)*

'যদি তুমি (সে দৃশ্য) দেখতে– যখন অপরাধীরা নিজেদের মালিকের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে (এবং বলতে থাকবে), হে আমাদের মালিক, আমরা (তো আজ সবকিছুই) দেখলাম এবং (তোমার সিদ্ধান্তের কথাও) শোনলাম, অতএব তুমি আমাদের আরেকবার (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, (এখন) আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস (অর্জিত) হয়েছে।' *(সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা, আয়াত ১২)*

'(আযাবের কষ্টে) তারা সেখানে আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের মালিক, তুমি (আজ) আমাদের এ (আযাব থেকে) বের করে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, (আগে) যা কিছু করতাম তা আর করবো না।' *(সূরা ফাতের, আয়াত ৩৭)*

যেহেতু শাস্তির উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে, অপরাধীরা তাওবা করেছে এবং ভবিষ্যতে অপরাধ থেকে আত্মরক্ষার অঙ্গীকার করেছে, তাই আযাব অবশিষ্ট থাকার বুদ্ধিবৃত্তিক এবং যৌক্তিক কোনো কারণ আর অবশিষ্ট থাকছে না। তাই জাহান্নাম নিশেষ হওয়া এবং চিরস্থায়ী না থাকা যুক্তিসংগত মনে হয়েছে। হাফেয ইবনে কাইয়েম (র.)-এর এ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই অনেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত ত্যাগ করে জাহান্নাম নিশেষ হয়ে যাওয়ার এবং চিরস্থায়ী না থাকার অভিমত গ্রহণ করেছেন। এর কি জবাব হতে পারে?

উত্তর ঃ শাস্তি ভোগ করা অথবা শাস্তি ভোগের ভীতিজনক অবস্থায় অপরাধীদের ওয়াদা অংগীকার দুভাবে হতে পারে। একটি প্রকৃত অংগীকার, যার সম্পর্ক অন্তরের সাথে, যাতে প্রকৃতই অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার দৃঢ় সংকল্প থাকে। আরেক প্রকার অংগীকার হয়ে থাকে তাৎক্ষণিক অবস্থা সামাল দেয়ার জন্যে। অর্থাৎ এ অংগীকার আন্তরিক নয় এবং তাতে অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার দৃঢ় সংকল্পও নেই; বরং উপস্থিত বিপদ মসিবত থেকে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশে মিথ্যা অংগীকার করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, আপাতত জান তো বাঁচানো যাক, ভবিষ্যতে দেখা যাবে। যেসব কাফেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে তাদের অংগীকার দ্বিতীয় প্রকারভুক্ত। যা নিছক মিথ্যা এবং সাময়িক বিপদ মসিবত থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই। কোরআন করীমে কাফেরদের সাময়িক বিপদ প্রতিরোধ উদ্দেশে মিথ্যা অংগীকারের কথা সুস্পষ্ট শব্দে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

'তুমি যদি (সত্যিই তাদের) দেখতে পেতে যখন এই (হতভাগ্য) ব্যক্তিদের (জ্বলন্ত) আগুনের পাশে এনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা (চীৎকার করে) বলবে, হায়! যদি আমাদের আবার (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে আমরা (আর কখনো) আমাদের মালিকের আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না এবং আমরা

www.nagorikpathagar.org

(অবশ্যই) ঈমানদার লোকদের দলে শামিল হয়ে যেতাম। এর আগে যা কিছু তারা গোপন করে আসছিলো (আজ) তা তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেলো; (আসলে) যদি তাদের আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠানোও হয়, তবু তারা তাই করে বেড়াবে যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিলো, তারা (আসলেই) মিথ্যাবাদী।

(সূরা আল আনয়াম, আয়াত ২৭-২৮)

যদি প্রশ্ন করা হয়, এ সময়ের অংগীকার অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার দৃঢ় সংকল্পজনিত হবে না- এটা কিভাবে জানা যাবে। এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে- 'ইন্নাহুম লাকাযেবূন' আয়াতাংশ। অর্থাৎ নিশ্চয়ই এরা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। কেননা, ভবিষ্যতের কোনো স্বাধীন কর্মের ওয়াদা অংগীকার সত্য অসত্য হওয়ার ভিত্তি হয় সংকল্প এবং সংকল্পহীনতার ওপর। যদি প্রশ্ন করা হয়, আযাব প্রত্যক্ষ করার পর দুনিয়ায় কুফরী কাজ করা কিভাবে সম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, শুধু সত্যের বিপরীত বিশ্বাসের মধ্যেই কুফরী সীমাবদ্ধ নয়; বরং সত্য প্রত্যাখ্যান করাও এক ধরনের কুফরী, সত্যের বিপরীত বিশ্বাসের চাইতেও কঠোরতর কুফরী। সত্য প্রত্যাখ্যানও যে কুফরী, তার প্রমাণ কোরআন মজীদের সুস্পষ্ট বর্ণনায়ই রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

'তারা যুলুম ও ঔদ্ধত্যের কারণে তার সবকিছু প্রত্যাখ্যান করলো, যদিও তাদের অন্তর এসব (নিদর্শন) সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলো।' *(সূরা নামল, আয়াত ১৪)*

এমন কঠোর সময়েও মিথ্যাচার কিভাবে সম্ভব হবে, এ ব্যাপারে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কেননা, স্বভাব প্রকতির বিনষ্টি এমনই হয়ে থাকে। অতএব, কঠিন আযাবের সময়ও কাফেরদের আরেকটি মিথ্যাচারের কথা কোরআন মজীদেই উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

'অতপর তাদের (সেদিন একথা (বলা) ছাড়া কোনো যুক্তিই থাকবে না যে, আল্লাহ তায়ালার কসম, যিনি আমাদের মালিক, আমরা কখনো মোশরেক ছিলাম না। (হে নবী,) তুমি চেয়ে দেখো কিভাবে আজ লোকগুলো (আযাব থেকে বাঁচার জন্যে) নিজেরাই নিজেদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং (এও দেখো,) তাদের নিজেদের রচনা করা মিথ্যা (কিভাবে আজ নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে!' *(সূরা আল আনয়াম, আয়াত ২৩-২৪)*

অবশ্য স্বভাব প্রকৃতির বিনষ্ট হওয়ায় তারা অক্ষম অসমর্থ হবে না। কেননা, স্বভাব প্রকৃতির বিনষ্ট হওয়ার কারণে শক্তি সামর্থ, স্বাধীনতা রহিত হয় না। আর শাস্তি প্রদানের ভিত্তিই হচ্ছে শক্তি সামর্থ এবং স্বাধীনতা। শাস্তি প্রদানের ভিত্তি স্বভাব প্রকৃতির বিনষ্ট হওয়া নয়। স্বভাব প্রকৃতির প্রভাব প্রতিক্রিয়া শুধু মানসিক ঝোঁকপ্রবণতার ওপরই পড়ে। তাতে কর্ম সংঘটিত হওয়া বা কর্মের দৃঢ় ইচ্ছা আবশ্যক নয়। আর এটা সুস্পষ্ট, যখন প্রকৃত তাওবা এবং অপরাধ সংঘটন থেকে আত্মরক্ষার প্রকৃত সংকল্প করা হয় না; বরং সাময়িক সমস্যা প্রতিরোধই হয় একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন তার ওপর থেকে আযাব প্রত্যক্ষ করার অবস্থায়ও আল্লাহ তায়ালাকে প্রতারিত করার মতো অপরাধের দ্বারস্থ হয়, তখন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের ভিত্তিমূলই ধসে যায়, যার ওপর জাহান্নাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার দাবীর ভিত্তি ছিলো। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতের ওপর কোনো প্রকার আপত্তিমূলক প্রশ্নই আর থাকছে না।

www.nagorikpathagar.org

সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা ও দ্বীনী বিষয়ে ব্যক্তির অনুসরণ

(এ প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু হযরত মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (র.)-এর বৈঠকী আলোচনা থেকে সংগৃহীত। তার আলোচনা বৈঠকসমূহ সাধারণত এলমী কথাবার্তায় পরিপূর্ণ থাকতো। এক বৈঠকে তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপকারিতার প্রতি ইশারা করেছেন। তন্মধ্যে একটি ঘটনা এখানে পরিবেশন করা হচ্ছে। এতে তিনি দ্বীনী বিষয়ে ব্যক্তির অনুসরণের যথার্থতা প্রমাণের জন্যে বোখারী শরীফের রেওয়ায়াত থেকে সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারার একটি ঘটনা আলোচনা করেছেন।)

সকল বিষয়ে আসল নির্দেশ আল্লাহ তায়ালার, এ বিষয়ে কোনো মুসলমানেরই মতবিরোধ থাকতে পারে না। প্রত্যেকের ওপর শুধু আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুসরণই ওয়াজেব। নবী রসূলদের নির্দেশ– যার স্বীকৃতি ওয়াজেব– তাও শুধু এ ভিত্তিতে যে, নবী রসূলরা আল্লাহ তায়ালার বিধানের প্রচারক এবং তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সেতুবন্ধন। যদি নবী রসূলরা তাদের গবেষণার মাধ্যমেও কোনো বিষয় নির্দেশ করেন, তারও ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। বিশেষ প্রমাণ বা নিদর্শন দ্বারা তা যে আল্লাহ তায়ালারই হুকুম সেটা তারা হৃদয়ংগম করে থাকেন। তাই নবী রসূলদের নির্দেশ পালন করা আল্লাহ তায়ালাই ফরয করেছেন। নতুবা কোরআনের তো খোলামেলা ঘোষণা আছেই যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কারো নির্দেশই পালনযোগ্য নয়।

এ আলোচনা থেকে একথা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে, নবী রসূলদের নির্দেশ পালন যেমন আল্লাহ তা'য়ালার পালনকর্তা এবং হুকুমদানের বৈশিষ্ট্যের সাথে শরীক করা বলা যায় না, তেমনি উম্মতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যারা আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতিনিধি এবং তাদের নির্দেশের পরিপূর্ণ নির্দেশের অনুসরণও কোনোক্রমেই রসূলের পদমর্যাদার সাথে শরীক করা বলা যেতে পারে না; বরং দ্বীনের ইমামরা হচ্ছেন মূলত আম্বিয়ায়ে কেরামের নির্দেশ ও বিধিবিধানের প্রচারক। তারা গবেষণা ছাড়াও যা কিছু বলেন, তারও ভিত্তি সাধারণত কিতাব এবং সুন্নাহ হয়ে থাকে। তাই আম্বিয়ায়ে কেরামের আনুগত্য যেমন প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌র অনুগত্য, তেমনি আয়েম্মায়ে দ্বীনের আনুগত্যও নিসন্দেহে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য। আয়েম্মায়ে দ্বীনের এ আনুগত্যকেই ফেকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় তাকলীদ (ব্যক্তির অনুসরণ) বলা হয়। 'যদি তোমরা না জানো তা হলে জ্ঞানীদের থেকে জেনে নাও।' কোরআনের এ আয়াতে এ মূলনীতি বিষয়ক মাসয়ালাই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যারা কোরআন হাদীসের ইংগিত, নিগূঢ় তত্ত্ব ইত্যাদি বুঝতে সক্ষম নয়, তারা আলেমদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র বিধান অবগত হয়ে আমল করবে এবং এ বিষয়ে আলেমদের অনুসরণ করবে। তাকলীদ (দ্বীনী বিষয়ে ব্যক্তির অনুসরণ)-এর মূলতত্ত্ব হচ্ছে, যারা জানে না, তারা যারা জানে তাদের জিজ্ঞেস করে করে আল্লাহ তায়ালার বিধিবিধানের ওপর আমল করবে। এটি এমন এক স্বতঃসিদ্ধ রীতি, যা বোধসম্পন্ন কোনো মানুষই

www.nagorikpathagar.org

অস্বীকার করতে পারে না। এ কারণে বিচার বোধসম্পন্ন আহলে হাদীসরাও নিরংকুশ তাকলীদের বৈধতা এবং ওয়াজেব হওয়া সম্পর্কে কোনো প্রকার মতদ্বৈধতা পোষণ করেন না। এজন্য তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দলিলভিত্তিক প্রমাণপত্র– যা সাধারণ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সেসব কিছু লেখা নিষ্প্রয়োজন; বরং মতভেদ এবং আলোচনার বিষয় তো হচ্ছে, নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ করে অন্য ইমামদের কথার ওপর আমল করা হবে না – পরিভাষায় যাকে তাকলীদে শখসী (নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণ) বলা হয়, কিন্তু প্রকৃত বিষয় উপলব্ধি করা গেলে এও কোনো জটিল আলোচনার বিষয় থাকে না।

দ্বীনী বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণের মূলতত্ত্ব

প্রবৃত্তির অনুসরণ নিষিদ্ধ এবং হারাম হওয়া সম্পর্কে কোরআন হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। এ কারণে দ্বীনী বিধি বিধানের ওপর আমলে প্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পূর্ণ হারাম– চার ইমামসহ উম্মতের অন্য সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেন। যে নিজের প্রবৃত্তির কামনা বাসনার অনুসরণ করে, অতপর কোরআন হাদীসে তার প্রমাণ খুজে ফেরে, সে নিজের সংকল্প এবং মানস চিন্তার নিরিখে স্বীয় প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। কোনো প্রকারেই সে কোরআন অনুসারী নয়, যদিও ঘটনাক্রমে কোরআনের কোনো প্রমাণ তার সাথে মিলেও যায়, তবুও সে কিন্তু প্রবৃত্তিরই অনুসারী– কোরআনের নয়। বিষয়টা অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত সত্তার সাথে সম্পর্কিত, যিনি অন্তরের গভীরে বিরাজমান নিয়ত এবং সংকল্প সম্পর্কে অবহিত।

হযরত ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) স্বরচিত ফতোয়ায় এতদসংক্রান্ত বিস্তৃত এক প্রবন্ধে সমগ্র উম্মতের এজমা (ঐকমত্য)-এর কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, যে প্রবৃত্তির অনুসরণের উদ্দেশে গবেষক ইমামদের অভিমত খুজে ফেরে এবং স্বীয় প্রবৃত্তির কামনা বাসনানুযায়ী আমল করে, শেষেতা কোনো ইমামের প্রতি সম্পৃক্ত করে দেয়, সে কিছুতেই আল্লাহ এবং আল্লাহ্র রসূলের বিধানের অনুসারী নয়; বরং সে মূলত নিজ প্রবৃত্তিরই অনুসারী। আর এরূপ করে দ্বীনকে খেলনার বিষয়ে পরিণত করা হয় মাত্র। এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.)-এর কিছু উদ্ধৃতির অনুবাদ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো,

এসব লোক কখনও সে ইমামের অনুসরণ করে যিনি বিয়ে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করেন, আবার কখনও সে ইমামের অনুসরণ করেন যিনি বিয়ে শুদ্ধ সাব্যস্ত করেন। শুধু স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং প্রবৃত্তির অনুসরণের লক্ষ্যেই এমনটা করা হয়। আর এরূপ করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এর তিন লাইন পরেই তিনি লেখেন, এর নযির হচ্ছে, কেউ যখন স্বয়ং শোফআ (প্রতিবেশিত্ব)-এর অধিকারলাভে আকাংখী হবে, তখন সে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী প্রতিবেশিত্বের অধিকার সিদ্ধ বলে বিশ্বাস প্রকাশ করবে। আর যখন স্বয়ং ক্রেতা হবে এবং অন্য কেউ প্রতিবেশিত্বের অধিকার লাভের আকাংখী হবে, তখন সে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত অনুসরণে প্রতিবেশিত্বের অধিকার অপ্রমাণিত হওয়ার বিশ্বাস প্রকাশ করবে। অনুরূপ সে ব্যক্তি যে

www.nagorikpathagar.org

বিয়ে বিদ্যমান থাকাবস্থায় ফাসেক পাপাচারীর অভিভাবকত্বের বিশুদ্ধ প্রবক্তা এবং পাপাচারীর অভিভাবকত্বের ভিত্তিতে বিয়ের যাবতীয় সুবিধাদি ভোগ করছে, কিন্তু এ ব্যক্তিই যখন তিন তালাক দিয়ে দেয়, তখন কঠিন হারাম থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে পাপাচারীর অভিভাবকত্বকে অস্তিত্বহীন এবং তার অভিভাবকত্বে অনুষ্ঠিত বিষয়কে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে। আর এরূপ করা মুসলমানদের (এজমা) ঐকমত্যে অবৈধ। যদি কেউ বলে আমি, আগে এ অভিমত সম্পর্কে জানতাম না, এখন আমি সে সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার সিদ্ধতায় বিশ্বাস স্থাপন এবং তা অনুরসণ করছি, তা হলেও তার এ উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এটা দ্বীনকে খেলনায় পরিণত করার একটি দরজা উন্মুক্ত করা মাত্র। আর এ অবস্থায় হারাম হালাল শুধু প্রবৃত্তির অনুসরণের ওপর ভিত্তিশীল হওয়ার উপকরণে পরিণত হয়।

এ বিষয়ে উম্মতের আলেম সমাজের অসংখ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। আমরা শুধু ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.)-এর অভিমত আলোচনার ওপরই শেষ করছি। কেননা, আহলে হাদীসরাও তার মর্যাদা স্বীকার করেন এবং অনেক বিষয়ে তার অনুসরণ করেন। মোট কথা, উম্মতের ঐকমত্যানুয়ী প্রবৃত্তির অনুসরণ হারাম। উপরন্তু অভিজ্ঞতায় এটা প্রমাণিত হয়েছে, যে মাসয়ালায় ইচ্ছা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত অনুসরণ করবে, আবার মনে চাইলে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) অথবা অন্য কোনো গবেষক ইমামের অভিমত অনুসরণ করবে, সর্বসাধারণকে যদি এরকম স্বাধীনতা দেয়া হয়, তাহলে এর অত্যাবশ্যকীয় পরিণতি তাই হবে যাকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) মুসলমানদের ঐকমত্যানুসারে হারাম বলে সাব্যস্ত করেছেন। এ শরয়ী যুক্তির ভিত্তিতে সকল মাসয়ালায় একই ইমামের অনুসরণ অত্যাবশ্যক সাব্যস্তকরণই নিরাপদ বলে দেখা হয়েছে।

এর আসল উদ্দেশ্য হবে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে আত্মরক্ষা করা। যেহেতু প্রবৃত্তির অনুসরণের বর্তমান যুগে এ ছাড়া আর কোনো পন্থা নেই যে, আমলকারীদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দিয়ে বরং এক ইমামের অনুসরণে বাধ্য করা হবে। তাই এ উদ্দেশ্য লাভের মাধ্যম হওয়ার কারণে তাকলীদে শখসী– ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণ ওয়াজেব মনে করা হয়েছে। ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণ সম্পর্কে এ বাস্তবতা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এও জানা গেলো, চার ইমামের অনুসরণ অথবা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণের বিষয় প্রমাণের জন্য কোরআন হাদীসে তাদের নাম বলে দেয়া অথবা তাদের নির্দিষ্ট করা জরুরী নয়। কেননা, কোরআন হাদীস শরীয়তের অভীষ্টসমূহের বিশ্লেষণ করে, কিন্তু অভীষ্ট লাভের মাধ্যমসমূহে বিশ্লেষণ জরুরী নয়। যেমন হজ্জ ফরয, এ বিষয়ে কোরআন হাদীসে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং ফরয হওয়ার কারণে হজ্জ আদায় করা শরীয়তের অভীষ্ট। রেল, জাহাজ, মোটর অথবা উট এ অভীষ্টলাভে উপনীত হওয়ার মাধ্যম। এসব মাধ্যমে আরোহণ পদ্ধতির বিশ্লেষণ অথবা জাহাজের নাম কোরআন হাদীসে খুজে ফেরা মূর্খতার প্রমাণ বৈ আর কিছু নয়। তাই কোরআন হাদীসের কোথাও যদিও ইমাম বিশেষের অনুসরণের প্রমাণ নাও থাকে,

www.nagorikpathagar.org

তথাপি শুধু প্রবৃত্তির অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়াই ইমাম বিশেষের অনুসরণ অত্যাবশ্যক হওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিলো।

সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা থেকে প্রমাণিত হয়, প্রথম যুগেও ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণের নযির বিদ্যমান রয়েছে। সাধারণ সাহাবায়ে কেরাম আলেম সাহাবীদের অনুসরণ করতেন। তাদের কেউ কেউ অনির্ধারিতভাবে কখনও এক আলেমের আবার কখনও অন্য আলেমের অভিমত অনুসরণে আমল করতেন। কেননা, তারা প্রবৃত্তির অনুসরণের বিপদ থেকে সুরক্ষিত ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ তখনও ব্যক্তিবিশেষের অভিমত অনুসরণে আমল করতেন। যার একটি নযির এখানে পেশ করা হচ্ছে। আর এটাই হচ্ছে এ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

মদীনাবাসীর

হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা.)-এর অনুসরণ

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত ইকরেমা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, মদীনাবাসী একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে সে মেয়েলোক সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, ফরয তাওয়াফের পর যার ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে (এ মেয়েলোক কি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত বিদায়ী তাওয়াফের জন্যে অপেক্ষা করবে, নাকি তার দায়িত্ব থেকে বিদায়ী তাওয়াফ রহিতই হয়ে যাবে, অথবা বিদায়ী তাওয়াফ বাদ রেখেই চলে যাওয়া তার জন্য জায়েয হবে)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, সে চলে যেতে পারে। প্রশ্নকারী মদীনাবাসী বললেন, আপনার কথায় আমরা হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা.)-এর কথার বিপরীত আমল করতে পারি না।

বোখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'তে সাকাফীর সূত্রে উল্লিখিত ঘটনায় মদীনাবাসী প্রশ্নকারীদের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে–

আপনি ফতোয়া দিন বা নাই দিন, হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা.) বলেন, এ মেয়েলোক (তাওয়াফ ব্যতীত) ফিরে যেতে পারে না।

'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে মোসনাদে আবী দাউদ তায়ালেসীর সূত্রে হযরত কাতাদা (রা.)-এর বর্ণনাক্রমে এ ঘটনা সম্পর্কিত নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত রয়েছে–

আনসাররা বললেন, হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা.)-এর অভিমতের বিপরীতে আমরা আপনার অভিমত অনুসরণ করবো না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাদের বললেন, আপনারা হযরত উম্মে সোলায়ম (রা.) -কে জিজ্ঞেস করুন (মাসয়ালা তাই শুদ্ধ যা আমি বলেছি)।

এ ঘটনায় মদীনাবাসী আনসার এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মধ্যকার কথোপকথনে দুটি বিষয় সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে গেছে। প্রথমত মদীনাবাসী আনসারার হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা.)-এর অনুসরণ করতেন। তার মতের বিপরীতে অন্য কারো ফতোয়ার ওপর আমল করতেন না। দ্বিতীয়ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-ও মদীনাবাসী আনসারদের ওপর এমন অভিযোগ আরোপ

www.nagorikpathagar.org

করেননি, যা আমাদের কালের হাদীসের ওপর আমলের দাবীদাররা ব্যক্তিবিশেষের অনুসারীদের ওপর আরোপ করে থাকেন। তারা বলে থাকেন– দ্বীনী বিষয়ে নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ রেসালাতে অন্যকে অংশীদার করার নামান্তর; সুতরাং নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ হারাম– নাজায়েয; বরং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আলোচ্য মাসয়ালার সঠিক সমাধান অনুসন্ধান এবং পুনরায় হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা.) থেকে জেনে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

এ ঘটনা 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থেই উদ্ধৃত হয়েছে, মদীনাবাসী আনসাররা মদীনা তাইয়েবায় পৌঁছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নির্দেশ মোতাবেক হযরত উম্মে সোলায়ম (রা.)-কে এ মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা)-কেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত অবহিত করেন। ফলে হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা.) পুনর্বার হাদীস পর্যালোচনা করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত গ্রহণ করেন এবং নিজের পূর্ববর্তী ফতোয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। *(ফাতহুল বারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৪)*

মোট কথা, এ ঘটনায় মদীনাবাসী আনসার এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এতোটুকু ঐকমত্য জানা গেছে যে, যারা গবেষক হওয়ার মর্যাদাসম্পন্ন এবং পর্যাপ্ত এলেমের অধিকারী নন, তারা যদি নিজের জন্যে কোনো নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ আবশ্যক করে নেন, তা হলে নিসন্দেহে তা জায়েয।

আলোচ্য ঘটনায় প্রথম যুগে সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা থেকে ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণ এবং তার বৈধতা প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে দ্বীনী বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণ ওয়াজেব মনে করার কারণ হচ্ছে, এ ছাড়া প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সুরক্ষিত থাকা স্বভাবতই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই এ যুগে দ্বীনী বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণ ওয়াজেব হওয়ার একটি নযির এখানে পেশ করা হচ্ছে।

দ্বীনী বিষয়ে নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র

[কিছু দিন আগে এ পত্রখানা কুতুবে আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগোহী (র.)-এর কাগজপত্র থেকে বের হয়। আমি হযরত গংগোহী (র.)-এর পুত্র হাকীম মাসউদ আহমদ (র.) থেকে এটা সংগ্রহ করি। পত্রখানা অনেক মূল্যবান এলমী আলোচনায় পরিপূর্ণ। পত্রখানি সমকালীন একজন গ্রন্থ প্রণেতা ও বড়ো মাপের আলেমের সন্দেহের জবাবে লিখিত হয়েছে। দুখের বিষয়, যে পত্রের জবাবে এ পত্রখানা লিখিত হয়েছে, তা পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলে প্রশ্ন সংবলিত পত্রের বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝা যেতো। অবশ্য এ অবস্থায়ও এর মর্ম অনুধাবন আলেম সমাজের জন্যে জটিল বিষয় হবে না। আলেম সমাজের উপকারের জন্যেই পত্রখানার অনুবাদ পেশ করা হচ্ছে।]

প্রিয় মৌলবী সাহেব!

সালাম বাদ, আমার চিঠিখানা পড়ুন। আশাকরি এতে আপনার প্রশ্নের কিছু উত্তর পেয়ে যাবেন। আসলে আমি বর্তমানে খুবই ব্যস্ত রয়েছি। সময় বলতে আমার মোটেই

www.nagorikpathagar.org

নেই। কিছু লেখা আমার জন্যে খুবই কঠিন ব্যাপার। যদি আপনি সামনাসামনি থাকতেন তাহলে ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে আলোচনা করা যেতো।

আপনার উক্তি– তাকলীদে শখসী (নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণ) বেদয়াতে সাইয়েয়া।

আমার মতে, আপনার কথা অনুসারে দ্বীনী বিষয়ে নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ একটি মোবাহ (নির্দোষ বৈধ) বিষয় প্রমাণিত হয়, যা আপনি আপনার পত্রে স্বীকার করেছেন। তবে মোবাহ হওয়ার অর্থ আপনি ঠিকমতো হৃদয়ংগম করতে পারেননি। আপনি তো বর্ণনাবৃত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ উভয়ের ওপরই পানি ঢেলে দিয়েছেন। শর্তযুক্ত অনুসরণ তো ফরয। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– 'তোমরা যদি না জানো তা হলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো।' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন– 'মূর্খতা নাম রোগের নিরাময় হচ্ছে প্রশ্ন করা।' আর এটা স্বতসিদ্ধ বিষয়, শিক্ষা ব্যতীত দ্বীন লাভ হয় না এবং তাতে জ্ঞান বিবেক বোধ অনুভূতির কোনো প্রবেশাধিকারও নেই। অতএব, নিশর্ত অনুসরণ যে ফরয, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনিও তা স্বীকার করে নেবেন। যদি আপনি নিশর্ত অনুসরণ ফরয হওয়া অস্বীকার করেন, তবে তা প্রমাণ করা হবে। নিশর্ত অনুসরণ দুই প্রকার। নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণ এবং অনির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণ। উভয়টি হচ্ছে একই শ্রেণীর দুটি শাখা। এখন নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও অনির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণ আবার দুই প্রকার, নিঃশর্ত অথবা শর্তযুক্ত। একে দুটি শাখা অথবা সামগ্রিকভাবে এর দুটি অংশ বলতে পারেন, যেভাবে চান তা নির্ধারণ করতে পারেন। সর্বাবস্থায় উভয় প্রকারই অনির্দিষ্ট অনুসরণের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা ফরয। ভালো কথা, আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা, ফরযের প্রকার অথবা শাখা এবং মোবাহ কিভাবে হলো? আরে আল্লাহর বান্দা, ফরয এবং মোবাহ তো পরস্পর বিপরীত দুটি জিনিস, যা শ্রেণীর বিধানভুক্ত। অতপর পরস্পর বিপরীত দুই প্রকারের একটি আরেকটির শাখা হলো কিভাবে? একটু ভাবুন। আপনার মতে নিঃশর্ত অনুসরণ তো ফরয আর ব্যক্তির অনুসরণ মোবাহ। অথচ আপনি যা মোবাহ বলছেন, তা তো ফরয অনুসরণেরই শাখা। সুতরাং আপনার যাবতীয় সন্দেহ সংশয় একটা ভ্রান্ত চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব, সাবধান হোন। তাকলীদ বা অনুসরণের উভয় প্রকারই ফরয। কোনোটাই মোবাহ নয়। তবে অনুসরণের নির্দেশ পালনে স্বাধীনতা রয়েছে। যে শাখা ইচ্ছা আদায় করুন। দ্বিতীয়টি কি প্রয়োজন। কেউ দুপ্রকারের কোনোটাই যদি কার্যকর না করে তাহলে সে গোনাহগার হবে। উভয় প্রকারের যে কোনোটি কার্যকর করার স্বাধীনতাকেই আপনি মোবাহ বলে দিয়েছেন। এটা তো রূপকার্থে বলা যেতে পারে। মূলত ব্যাপার এ নয় যে, স্বয়ং তাকলীদে শখসী– নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ মূলগতভাবে মোবাহ। এর উদাহরণ, যেমন কসমের কাফফারা। মূলগতভাবে কসমের ফাফফারা আদায় করা ফরয। আর গরীব মিসকীনকে খাওয়ানো, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, দাসমুক্তি– এ তিন প্রকারের যে কোনোটি কার্যকর করার স্বাধীনতা রয়েছে। যে কোনোটি করলেই কসমের কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। যে কোনোটাই করবে না, সে কসমের কাফফারার দায়ে গোনাহগার থাকবে। অনুরূপ কোরবানী ওয়াজেব। খাসী, বকরী,

www.nagorikpathagar.org

গাভী, ষাঁড়, অতপর নর মাদী যে কোনোটি দ্বারা কোরবানী মূল ওয়াজেবের আংশিক বিভাজন মাত্র। যে কোনোটি দ্বারা কোরবানী আদায়ের স্বাধীনতা রয়েছে। যেটিই করা হোক, ওয়াজেবই আদায় করা হলো। খাসী, বকরী, গাভী, ষাঁড় অথবা নর মাদী– যে কোনো প্রকারের কোরবানীই হোক না কেন, কোনোটাই মোবাহ নয়, সবই ওয়াজেব। তবে কেউ একটির ওপর আমল করলে অন্যগুলো থেকে দায়মুক্ত হয়ে যায়। সকল সামগ্রিক বিধানের অবস্থাই এ ধরনের। তা হচ্ছে, মৌল শরয়ী বিধান কার্যকর করা ফরয। এ ফরযকে মোবাহ বলা তার কোনো প্রকার গ্রহণের স্বাধীনতা হিসাবে মোবাহ। এখানে মোবাহ ফরযের পরিপূরক নয়। আপনি মোবাহ বিষয় ফরয হয়ে যাওয়ার যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তা অস্থানে হয়েছে। নতুবা আপনার সন্দেহ যথার্থ বলা হলে, একে সম্বল করেই নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণকারীরা অনির্দিষ্ট অনুসরণকে বেদয়াতে সাইয়েয়াহ বলে বসবে। কেননা, অনির্দিষ্ট অনুসরণ কিভাবে ফরয হয়? তাও তো মোবাহই বটে। এ আলোচনার এটাই সারমর্ম।

আর শাহ ওলীউল্লাহ (র.) কোথায় বলেছেন যে, অনির্দিষ্ট অনুসরণের ওপর এজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে তার বিপরীত প্রকার হারাম হবে। ওয়াজেবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় হারামের সাথে। যদি মনে করা হয়, তিনি এরূপ বলেছেন, তা হলেও নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ মোবাহ কিভাবে হবে? বরং তা তো হারামই হবে। আর এ ভ্রান্তিই মূর্খ গায়রে মোকাল্লেদীন (নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ অস্বীকারকারী)-দের পেয়ে বসেছে; বরং হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (র.) বলেছেন, অনুসরণীয় প্রথম তিন যুগে সর্বসম্মতিক্রমে অনির্দিষ্ট অনুসরণ জায়েয ছিলো। অতএব, জায়েয হওয়া দ্বারা এর বিপরীত প্রকার কি করে মাকরূহ প্রমাণিত হলো? একটি সামগ্রিক বিধানের কোনো এককের জায়েয হওয়া দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার মাকরূহ হওয়ার প্রমাণ শরীয়তের কোথায় রয়েছে? বকরী দ্বারা কোরবানী জায়েয হওয়ার বিধান সাহাবায়ে কেরামের মাঝে প্রচলিত ছিলো, কিন্তু এ দ্বারা গাভীর কোরবানী হারাম কিভাবে হলো? বরং কোনো সামগ্রিক বিধানভুক্ত সকল একক জায়েয। আর কোনো এককের ওপর আমল দ্বারা অন্য এককগুলোর হুকুম রহিত হয়ে যায় না; বরং সমান্তরালভাবে তা প্রযোজ্য থাকে। অতএব, আলোচ্য মূলনীতি যদি আপনি হৃদয়ংগম করে থাকেন, তা হলে ভেবে দেখুন, আপনার মতে যেমন নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ মোবাহ, তেমনি অনির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণও মোবাহ। অনুরূপ অনির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণের সমার্থবোধক হওয়ায় ওয়াজেবই বটে। আর প্রকৃত সত্য হচ্ছে, উভয় প্রকারই ওয়াজেব। উভয়ের যে কোনোটির শরণাপন্ন হওয়ার স্বাধীনতা মোবাহ। অতএব, স্বপ্রকৃতিতে উভয়টি ওয়াজেব।

আপনার উক্তি– উচ্চ স্বরে আমীন বলা এবং নামাযের প্রত্যেক তাকবীরে হাত ওঠানো– কেউ যদি ওলামায়ে কেরামের অভিমত অনুযায়ী হাদীসের ওপর আমল হিসাবে এ দুটি কাজ করে, তা হলে এমন ব্যক্তির বিরোধিতা করা নিসন্দেহে হারাম। তবে কেউ যদি প্রবৃত্তির অনুসরণ, কৌতুক, ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি ও তা বিস্তারের

www.nagorikpathagar.org

উদ্দেশে উচ্চ স্বরে আমীন বলে এবং নামাযের প্রত্যেক তাকবীরে হাত ওঠায়, তা হলে তার বিরোধিতা করা প্রকৃত দ্বীন। কেননা, ফাসাদ বিশৃংখলা রহিতকরণ ওয়াজেব।

আপনার উক্তি– সর্বসাধারণের বিভ্রান্তির আশংকায় নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ বেদয়াতে সাইয়েয়া। প্রিয়ভাজন, নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ তখনই বেদয়াতে সাইয়েয়া হতো, যদি সত্তাগতভাবে তা মোবাহ হতো। অথচ আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ ফরয করে দিয়েছেন। যেমন অনির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ ফরয। সর্বসাধারণের জন্য সহজীকরণ অথবা নির্দিষ্ট অভিমতের প্রচার নিরুৎসাহিতকরণের উদ্দেশে যদি নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ বেদয়াত বলা হয়, তা হলে প্রথম তিন যুগ থেকে আমল করা সুস্পষ্ট বিধিসম্মত বিষয় কিভাবে মোবাহ আর কিভাবেই তার অত্যাবশ্যক অনুসরণ বেদয়াত হয়ে গেলো? কেনই বা প্রথম তিন যুগে অত্যাবশ্যক বিষয়ের বিপরীতে বিধিসম্মত স্বাধীনতার নির্দিষ্ট একক বেদয়াত হয়নি। যদি অনির্দিষ্ট এককই বেদআত না হয় তা হলে নির্দিষ্ট একক বেদয়াত হলো কিভাবে? আর যদি নির্দিষ্টটা বেদয়াত হয় তবে অনির্দিষ্টটা বেদয়াত না হওয়ার কি কারণ? শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানে উভয়টাই সমমর্যাদাশীল। ফরয হওয়া এবং আমলের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান। অনির্দিষ্টের ওপর আমল করার ব্যাপারে যদি এজমা হয়ে থাকে, তবে এ সম্পর্কে আমাকেও অবহিত করুন। আল্লাহ তায়ালা কোনো সার্বিক বিধানে কোনো এককের ওপর আমল অত্যাবশ্যক এবং অপর এককের ওপর আমল হারাম করেছেন, একথা অদ্যাবধি আমি শুনিনি। আর না জ্ঞান বিবেক তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। সর্বসাধারণ মানুষ আল্লাহ তায়ালার একটি সামগ্রিক বিধানের কোনো এককের ওপর অত্যাবশ্যকরূপে আমল করলে যা অনুসরণীয় তিন যুগে ছিলো না, তা হলে তো তারা বেদয়াতী হয়ে গেলো– লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আরে ভাই! কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, প্রথম তিন যুগের লোকদের আমল আল্লাহ তায়ালার ফরয বিধান রহিতকারী, আর এটা শেরেক, তাহলে আপনি এ প্রশ্নের কি জবাব দেবেন? এ আহমকীপ্রসূত চিন্তাধারাহেতু নির্দিষ্ট ইমামের অনুসারীদের মোশরেক বানিয়ে এর অস্বীকারীরা নিজেরাই মোশরেক হয়ে গেছে। অন্যকে মোশরেক বানাতে গিয়ে শেরকের বেড়ি উল্টো নিজেদের ঘাড়েই চেপেছে, এ বোধটুকুও তাদের নেই। সুতরাং সাবধানতার সাথে চিন্তা ভাবনা করে সামলে চলুন।

আপনার উক্তি– অতএব, এক্ষেত্রে সর্বসাধারণকে সতর্কীকরণ– আমার মতে, সর্বসাধারণ মানুষ যেন এমন ক্ষতিকর আকীদা বিশ্বাস পোষণ না করে; বরং উভয় প্রকারকেই ফরয জেনে যে প্রকারের ওপর ইচ্ছা আমল করুক, নিসন্দেহে এ বিষয়ে সতর্ক করা কর্তব্য। তবে শর্ত হলো, ক্রীড়া-কৌতুক এবং ফেতনা ফাসাদমুক্ত অবস্থায় যদি তা সম্ভব হয়। অবশ্য নিসন্দেহে তা ফাসাদমুক্ত হবে না। তারা আজ কারো স্ত্রী হালাল সাব্যস্ত করবে তো আগামীকাল হারাম সাব্যস্ত করবে। একদিন গো-সাপ হালাল ভাববে তো অন্য দিন–হারাম, অপবিত্র। ফলে খুবই অট্টহাসি হাসা হবে যে, মুসলমানদের দ্বীন তো ভ্রষ্ট ধর্মাচারীদের দ্বীন। এখনই হিন্দু এবং খৃষ্টানরা বিতর্ক ছড়িয়ে ফিরছে যে, মুসলমানদের দ্বীনের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। অতপর স্বয়ং ইসলাম

www.nagorikpathagar.org

অনুসারীরাই হিন্দু এবং খৃষ্টানদের মতো প্রশ্ন উত্থাপন করে ফিরতে শুরু করবে। সুতরাং শাখা বিধান সম্পর্কে একটু ভাবুন। এর পরেও যদি আপনার সন্দেহ অবশিষ্ট থেকে যায়, তা হলে পুনরায় লিখবেন। দুই চার ছত্র লিখে পাঠাবো ইনশাআল্লাহ।

আপনার উক্তি– যেমন বিয়ে শাদী এবং শোকজনিত রসম রেওয়াজ– আমি বলবো, আপনার এ উপমা প্রদান করা ভুল। রসম রেওয়াজ স্বপ্রকৃতিতে মোবাহ ছিলো, ফরয নয়। সুতরাং একটির সাথে অন্যটির কি সামঞ্জস্য। আপনার এ উপমা প্রদান–দোষযুক্ত বিষয়ের আরেকটি দোষযুক্ত বিষয়ের ওপর ভিত্তিশীল হওয়ার শামিল। কোনো মোবাহ বিষয়কে ওয়াজেব বানানো হারাম এবং হারাম প্রতিরোধ করা ওয়াজেব। ওয়াজেব বিষয়ে ফাসাদের আশংকা প্রকাশ বিধিসম্মত নয়। যেমন বিয়ে– প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় হোক, জৈবিক আকাংখার প্রবল অবস্থায় ওয়াজেব এবং যেনায় জড়ানোর আশংকাযুক্ত অবস্থায় ফরয। শক্তি সামর্থ থাকাবস্থায় বিয়ে পরিহার করা হারাম। অতএব, দ্বিতীয় বিয়ের প্রচলন ওয়াজেব এবং সর্বসাধারণের সমস্যায় জড়ানোর আশংকায় তা পরিহার করা বিধিসম্মত নয়। যেনার অনিষ্ট দূরীকরণের উদ্দেশেই দ্বিতীয় বিয়ের তাকিদ করা হয়েছে। আর সেটা সচরাচর দৃশ্যমান বিষয়। অথচ আপনার দৃষ্টি শুধু শুধুই অস্থানে নিছক দারিদ্রের ওপর পতিত হয়েছে, তার অত্যাবশ্যক খারাপ পরিণতির প্রতি আপনার দৃষ্টি যায়নি। যদি অপর কোনো বিষয়ও দ্বিতীয় বিয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যেনা প্রতিরোধক হতো, তা হলেও তার সমাধান বর্ণিত পদ্ধতিতেই হতো, কিন্তু এখানে তো বিয়ে ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। তাই বিয়ের প্রত্যেক এককেই ওয়াজেব সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানকালে নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণে আমলী ফরয এবং ফাসাদ দূরীভূতকরণের ফরয– উভয় ফরযই আদায় হচ্ছে। আপনিই বলুন, প্রজননযন্ত্র বিচ্ছিন্নকরণ ব্যতীত বিয়ের বিকল্প আর কি রয়েছে? তাও তো হারামই বটে। অতএব, ভালোভাবে বুঝুন।

আপনার উক্তি– অবশ্য কল্যাণকর তিন যুগে এর কোনো উদাহরণ নেই। আমি বলবো, আপনার এহেন উক্তি তো বিস্ময়ের পরেও বিস্ময়কর। শুনুন, প্রথম দিকে বাম হাতে আংটি পরা মোবাহ ছিলো। পরবর্তীতে রাফেযীদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টির আশংকায় তা মাকরূহে তাহরীমী হয়েছে। কেননা, রাফেযীদের (একটি বাতিল মতবাদ) সাথে সাদৃশ্য স্বয়ং একটি ফেতনা। হেদায়া গ্রন্থ দেখুন। ডান এবং বাম– উভয় হাতেই আংটি পরা জায়েয এবং কল্যাণকর। পরবর্তীকালে রাফেযীদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টির আশংকায় বাম হাতে আংটি পরা মাকরূহ হয়েছে। তাই বাম হাতে আংটি পরিধান পরিহার করা ওয়াজেব। কেননা, মাকরূহ বিষয় পরিহার করাও ওয়াজেব। এটা সত্য, প্রথম দিকে তা মোবাহ ছিলো। পরবর্তীকালে ফোকাহায়ে কেরাম সর্বসাধারণের ফেতনায় পতিত হওয়া এবং মোতাযেলীদের অভিমত প্রচার প্রসার প্রাপ্তির কারণে বাম হাতে আংটি পরিধান পরিহার করা ওয়াজেব সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, মোতাযেলীদের মতে, অনুগত পুণ্যশীলকে সওয়াবদান এবং গোনাহগারকে শাস্তিদান আল্লাহর ওপর ওয়াজেব।

www.nagorikpathagar.org

উল্লিখিত আলোচনার পরেও যদি আপনার মানসিক প্রশান্তি না আসে, তবে পরবর্তীতে দেখা যাবে। আপনিই বলেছেন, রসম রেওয়াজ পালন মোবাহ এবং সর্বসাধারণ মানুষ ফেতনায় পতিত হওয়ার আশংকাহেতু হারাম, দ্বিতীয় বিবাহ মোবাহ এবং যেনায় জড়ানোর আশংকাহেতু ওয়াজেব; সুতরাং আপনার এবং আমার চিন্তাধারায় কোনো বৈসাদৃশ্য নেই। আমাকে আর কি প্রশ্ন করছেন? সমগ্র দুনিয়ার আলেম সমাজ তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কথা এবং কাজকে শরীয়তের দলীল বলে স্বীকার করেন। আর তাই হচ্ছে অন্য বিষয়ের অনুমাননির্ভর সমাধানের মৌল ভিত্তি। আপনি লেখেছেন, তিনি স্বয়ং শরীয়ত প্রদাতা। সুতরাং যদি স্বয়ং শরীয়ত প্রদাতার কাজের উপর অনুমান করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান না করা যায়, তা হলে এ বিষয়ে মৌল ভিত্তি কিসের থেকে লাভ করা যাবে? আপনি তো এমন কথা বললেন, যা দুনিয়ায় অন্য কেউ বলতে পারে না। উদ্ভূত যেকোনো সমস্যার সমাধান লাভের উদ্দেশে সর্বপ্রথম কোরআন হাদীসের ওপরই নির্ভর করতে হবে, কোরআন-হাদীসের পর অন্য কোনো বিষয়ই আর শরীয়তের দলীল সাব্যস্ত হতে পারে না। এখন আপনিই বলুন– কি লিখেছেন। আর সাহাবায়ে কেরামের কথাও শরীয়তের দলীল। তাদের রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ এবং পরবর্তীদের তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যান্য যুগেও অনুরূপ কর্মধারাই চলে আসছে। অতএব, সাহাবায়ে কেরামের কাজ শরীয়তের দলীল এবং উদ্ভূত যেকোনো সমস্যার সমাধানলাভে মৌল ভিত্তি। সাহাবায়ে কেরামের সমাধান যদি দলীল না হয়, তবে আর কারটা হবে? অতএব, উসূল– মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থাদি দেখে নিন। এখানে একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি।

যিনি কোরায়শী নন তার ভাষা রীতিতে কোরআন পঠন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোবাহ করেছেন। অথচ ওসমান (রা.) সর্বসাধারণের সংকটে পতিত হওয়ার আশংকায় অ-কোরায়শীর ভাষারীতিতে কোরআন পাঠ হারাম এবং এ পদ্ধতি পরিত্যাগ ওয়াজেব করেছেন। সুতরাং হযরত ওসমান (রা.)-এর এ কাজ শরীয়তের এক মৌল প্রমাণ। ব্যাপার এমন নয় যে, কোনো সমস্যার অনুমাননির্ভর সমাধান লাভোদ্দেশে হযরত ওসমান (রা.)-এর আমলকে মৌল ভিত্তি বানানো যাবে না। এরূপ উক্তি নিরেট ভ্রান্তি। দ্বিতীয় প্রকার– অর্থাৎ নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণের উদাহরণ উপস্থাপন আপনার বুঝার ভুল মাত্র। কেননা, কল্যাণকর তিন যুগে আমল না হওয়ার কারণে ফরয হিসাবে বিধৃত কোনো বিষয় বেদয়াত হতে পারে না। আর যা বেদয়াত তাও জায়েয হতে পারে না। এ ধারণা আপনার বুঝার ভুলহেতুই সৃষ্টি হয়েছে।

অতএব, তোমরা না জানলে আলেমদের জিজ্ঞেস করো–গবেষক ইমামরাও কোরআনের এ ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত। কোনো বিষয় না জানলে অন্যকে জিজ্ঞেস করো–এটা একটা সাধারণ বিধান, কোনো বিশেষ বিধান নয়। সহীহ এবং রহিত হয়নি–এমন হাদীসসমূহ সম্পর্কে অবগতিলাভই তো জটিল বিষয়। এ কারণেই

www.nagorikpathagar.org

বিশেষজ্ঞ ইমামদের অনুসরণ করা হয়। যদি কেউ বিশুদ্ধ এবং রহিত হয়নি– এমন হাদীসসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগতিলাভে সক্ষম হয়, তাহলে তার অন্যের অনুসরণ নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? সুতরাং এও স্বয়ং অনুসরণই বটে। বিপরীত মর্মার্থ সম্বলিত দুটি হাদীস–এ দুটির কোন্‌টি রহিত হয়েছে তা জানা নেই। এক্ষেত্রে কারো থেকে জেনে নিয়েই একটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। অন্যথায় ব্যাপারটা দোদুল্যমান অবস্থান সমাধানহীন থেকে যাবে। আর বিশেষজ্ঞ গবেষক ইমামদের হাদীস না পাওয়ার সন্দেহ একটি নিরর্থক ব্যাপার। কেননা, এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অনুসন্ধানলব্ধ সমাধান বর্তমান রয়েছে। সুতরাং গবেষক ইমামগণ হাদীস লাভ করেননি–এটা এক অমূলক সন্দেহ এবং প্রবৃত্তির ধোকামাত্র।

যেমন উচ্চ স্বরে আমীন বলা এবং প্রতি তাকবীরে হাত ওঠানোর হাদীসসমূহ সহীহ সূত্রে বর্ণিত। এর বিপরীত আমলকারীদের সপক্ষেও হাদীস রয়েছে। আর হাদীসের পারস্পরিক বিরোধের ক্ষেত্রেই কোনো একটিকে প্রাধান্য দানের প্রয়োজন হয়। এখানে কোনো বিরোধই নেই; সুতরাং প্রাধান্য দানের চেষ্টাও নিষ্প্রয়োজন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-ও উচ্চ স্বরে আমীন বলা এবং প্রতি তাকবীরে হাত ওঠানোর কাজ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হওয়ার প্রবক্তা, কিন্তু এতে উচ্চ স্বরে আমীন বলা আর প্রতি তাকবীরে হাত ওঠানোই যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বশেষ আমল, তা প্রমাণিত হয় না। কোনো দুটি বিষয় পরস্পর বিরোধী হওয়ার জন্যে তা একই সময়ে সংঘটিত হওয়া শর্ত। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুটি কাজের একটি অন্যটির রহিতকারী অথবা রহিতকৃত হওয়ার অবস্থা চূড়ান্ত কিছু নয়। প্রত্যেকেই গবেষণার মাধ্যমে এক দিককে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং আমলকারীর যে কোনো একটি গ্রহণের স্বাধীনতা রয়েছে।

এই দীর্ঘ আলোচনার ফলে যদি ব্যাপারটা আপনার বুঝে আসে তবে আমাকে অবহিত করবেন। অন্যথায় পুনরায় লেখে পাঠাবেন। কেননা, আলোচ্য বিষয়ে আপনার সংশোধন জরুরী। আপনি তো প্রথম বারের আলোচনাতেই উল্টা পাল্টা বলতে শুরু করেছেন। বুঝে না আসলে অহেতুক লজ্জার বশীভূত হতে যাবেন না। পরিষ্কারভাবে লেখবেন। কেননা, এটা দ্বীনী বিষয়। আর দ্বীনী বিষয়ে আলেমের পদস্খলন আল্লাহর বান্দাদের বরবাদ করে ছাড়ে। নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ অস্বীকারকারীরা আলোচিত মূলনীতিসমূহ বুঝতে না পারার কারণেই বিভ্রান্তিতে পড়ে বরবাদ হয়েছে। এ ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণসমূহ হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হলে আলোচ্য রূপ সংশয় থেকে তারা সুরক্ষিত থাকতে পারতো, কিন্তু তারা আলোচ্য বিষয়ের ওপর গভীর দৃষ্টি না দিয়ে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখেছে। সুতরাং বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে।

জ্ঞানার্জন সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত

ছাত্রজীবনই কখনোই শেষ না হওয়া উচিত হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, যার এলেম অর্জিত হয়েছে, তার কখনোই এলেম অন্বেষণ পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

www.nagorikpathagar.org

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা অর্জিত এলেমের সাথে অতিরিক্ত আরও এলেম অর্জন করো। এটা তাকওয়া পরহেগারীর সহযোগী। এলেমের বৃদ্ধি সাধনে কমতি করা অর্জিত এলেমকে ক্ষতিগ্রস্ত করার নামান্তর মাত্র। কারো যে বিষয়ের এলেম অর্জিত হয়নি তা অর্জনে তার আগ্রহী না হওয়া, তার অর্জিত এলেম থেকে উপকৃত না হওয়ার প্রমাণ। *(জামেউল এলম)*

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, ইসলামকে জীবন্ত করার উদ্দেশে এলেম অন্বেষণ করা অবস্থায় যার মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর আম্বিয়ায়ে কেরাম তার থেকে মাত্র এক স্তর ওপরের মর্যাদার অধিকারী হবেন (অর্থাৎ, ইসলামকে জীবন্ত করার উদ্দেশে এলেম অন্বেষণরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শুধু নবুওয়তের মর্যাদাপ্রাপ্ত নয়- আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে তার শুধু এতোটুকুই পার্থক্য থাকবে)। *(জামেউল এলম)*

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, এলেম অন্বেষণরত অবস্থায় কারো মৃত্যু এসে গেলে সে শহীদী মৃত্যুবরণ করে। *(জামেউল এলম)*

লোকেরা হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক (র.)-কে বললো, আপনি কখন পর্যন্ত এলেম অন্বেষণ করতে থাকবেন? তিনি জবাবে বললেন, আমি ইনশাআল্লাহ আমৃত্যু এলেম অন্বেষণ করতে থাকবো। একদিন একজন তাকে এই প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি বললেন, যে বাক্য আমার জন্যে উপকারী এবং আমার নাজাতপ্রাপ্তির কারণ, সম্ভবত আমি এখনও তা লিপিবদ্ধ করতে পারিনি (তাই আমি সর্বদা এলেম অন্বেষণে লেগে থাকি)।

শিক্ষাজীবনে দারিদ্র এবং ক্ষুধায় ধৈর্য ধারণ

হযরত ইমাম মালেক (র.) বলেন, দারিদ্র ও ক্ষুধার স্বাদ আস্বাদন না করা পর্যন্ত কারো (দ্বীনী) এলেম অর্জিত হয় না। অতপর তিনি হাদীস শাস্ত্রের ইমাম হযরত রবিয়া (র.)-এর দরিদ্রতা নিস্বতার আলোচনা করেন। এলেম অন্বেষণহেতু তাকে এমন ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, তিনি ঘরের চাল বিক্রি করে দিয়েছেন। এমনকি তিনি নিম্নমানের খেজুর এবং আবর্জনার স্তূপে নিক্ষিপ্ত মোনাক্কা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর শিক্ষাজীবন

ইবরাহীম বিন জাররাহ (র.) বলেন, আমি স্বয়ং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি এলেম অন্বেষণ করেছি এবং আমার সাথে এতো লোক এলেম অন্বেষণ করেছেন, যাদের সংখ্যা আমি এখন গুনেও শেষ করতে পারবো না, কিন্তু এলেম থেকে সে ব্যক্তিই উপকৃত হয়েছে, দুঃখ যার অন্তরকে রঞ্জিত করেছে। দুঃখে অন্তরকে রঞ্জিত করেছে- এ কথার অর্থ, হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর ছাত্র জীবনে ঘরের লোকেরা তার জন্যে দুধে রুটি ছেড়ে দিয়ে রাখতো। সকাল বেলা রুটি দুধ খেয়েই তিনি শিক্ষা মজলিসে হাযির হতেন। শিক্ষা মজলিস

www.nagorikpathagar.org

থেকে ফিরেও দুধ রুটিই আহার করতেন। সুস্বাদু খাদ্য রান্না হবে আর তা খাবেন, এ জন্যে অপেক্ষায় থেকে সময় নষ্ট করতেন না। তার সমপাঠীরা হালুয়া ইত্যাদি প্রস্তুত করতে লেগে সবকের একাংশ থেকে বঞ্চিত থেকে যেতো।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর শিক্ষাজীবন

হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কেউই ধন সম্পদ এবং সম্মান প্রতিপত্তি দ্বারা দ্বীনী এলেম অর্জনে সফলতা লাভ করতে পারেনি; বরং দ্বীনী এলেম অর্জনে সে ব্যক্তি সফল হয়, যে অসচ্ছল জীবন যাপন করার, সম্মানিত ওস্তাদদের সামনে নিজেকে অবমানিত করার এবং এলেম ও ওলামায়ে কেরামকে ইযযত সম্মান করার কর্মধারা গ্রহণ করে। হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, আমি একেবারে ছোটোকালেই পিতৃহারা হই। আমার মা খুব কষ্টে আমাকে লালন পালন করতেন। আমি লেখাপড়ার উপযুক্ত হলে মা আমাকে মক্তবে পাঠিয়ে দেন। আমার মক্তব জীবনে শিক্ষকের আর্থিক কোনো প্রকার সেবা করার সংগতি আমার মায়ের ছিলো না। তাই আমি আমার শিক্ষককে এ কথায় সম্মত করি, আপনি কোথাও গেলে অথবা কোনো প্রয়োজনে মক্তবে পড়াতে না পারলে তখন আমি আপনার স্থলাভিষিক্তরূপে কাজ চালিয়ে যাবো। এভাবেই মক্তবে আমি কোরআন মজীদ সমাপ্ত করি।

এরপর থেকে আমি ওলামায়ে কেরামের শিক্ষা মজলিসে হাযির হতে শুরু করি। সম্মানিত ওস্তাদদের থেকে কোনো হাদীস অথবা মাসয়ালা শুনতে পেলে আমি তা লিখে রাখার চেষ্টা করতাম, কিন্তু আমার মায়ের কাছে এতো পয়সা ছিলো না, যা দ্বারা আমি কাগজ কিনতে পারি। তাই আমি একটা পদ্ধতি অবলম্বন করি এবং তা হচ্ছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোনো হাড় নযরে পড়লে আমি তা উঠিয়ে নিতাম এবং সে হাড়ের ওপরই লিখতাম। হাড়খানা লেখায় পূর্ণ হয়ে গেলে তা কোনো ঠিলিয়ায় (কলসিতে) রেখে সংরক্ষণ করতাম। এ অবস্থায়ই আমার শিক্ষা জীবনের একটা অংশ অতিক্রান্ত হয়। এর পর ঘটনাক্রমে ইয়ামানের শাসনকর্তা আমাদের এলাকায় এলে কোরায়শের কিছু সম্মানিত লোক তার কাছে সুপারিশ করেন, তিনি যেন আমাকে তার সাথে রাখেন। তিনি সানন্দে এ সুপারিশ মঞ্জুর করেন, কিন্তু শাসকদের সাহচর্যে অবস্থানের উপযোগী এক জোড়া কাপড় প্রস্তুত করে দেবার আর্থিক সংগতি আমার মায়ের ছিলো না। একান্ত বাধ্য হয়েই আমার মা ষোল স্বর্ণ মুদ্রায় নিজের চাদরখানা বিক্রি করে তা দ্বারা আমাকে পোশাক বানিয়ে দেন।

আমি ইয়ামানের শাসনকর্তার সাথে সেখানে পৌঁছি। তিনি আমাকে একটা কাজ দেন। আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে তা গ্রহণ করি। অতপর তিনি আরও কাজ বাড়িয়ে দেন এবং বাড়াতেই থাকেন। এ সময় ইয়ামানের কিছু লোক ওমরা অদায়ের উদ্দেশে মক্কা শরীফে উপস্থিত হয়। তারা মক্কাবাসীর কাছে আমার ভালো কাজের প্রশংসা করে, এতে আমি মানুষের কাছে বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠি। এরপর আমি ইয়ামান থেকে নিজের জন্মভূমি মক্কা শরীফে আগমন করি এবং ইবনে আবী ইয়াহইয়ার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে সেখানে গমন করি। তিনি আমাকে ভর্ৎসনা তিরস্কার করে ধমকিয়ে বললেন,

www.nagorikpathagar.org

তুমি আমাদের সাহচর্যে অবস্থান করো, এতদসত্ত্বেও এমন এমন কাজ করো। অর্থাৎ, শাসকবর্গ এবং আমীর ওমরার সাথে অবস্থান পছন্দ করো।

এরপর আমি হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে সতর্ক করেন, তবে অন্যভাবে। তিনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে আমাকে বললেন, আমি তোমার ঘটনা শুনেছি। যা শুনেছি সেটা আমার পছন্দ হয়নি। তোমার ওপর এলেম প্রচার প্রসারের যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তুমি সে ফরয দায়িত্ব আদায় করোনি। যা হোক, যা ঘটার তা তো ঘটেই গেছে। ভবিষ্যতে তোমার ওপর অর্পিত এলেম প্রচার প্রসারের গুরুদায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ইবনে আবী ইয়াহইয়ার নসীহত উপদেশের তুলনায় হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.)-এর উপদেশ আমার ওপর অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করে। তাই আমি সরকারী চাকরি ছেড়ে দেই।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর ছাত্র হযরত ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী (র.) থেকে আমি যে পরিমাণ এলেম অর্জন করেছি, লেখা সম্ভব হলে সেসব এক উটের বোঝা হবে। তিনি আরও বলেন, যে এলেম অর্জনের জন্যে সামান্য সময়ের অপমান অপদস্থতা, দুখ কষ্ট বরণ করে নিতে সম্মত হয় না, সে চিরকাল মূর্খতাজনিত অপমান অপদস্থতা আর অসম্মানের কাছে বন্দী হয়ে থাকে।

হযরত আলী (রা.) এক ভাষণে বলেন, তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝে নাও। মানুষ সে কাজের সাথেই সম্পৃক্ত হয় যা সে ভালোভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম। আর প্রত্যেক মানুষেরই সম্মান মর্যাদা, অবস্থান সে কাজ দ্বারাই চিহ্নিত নির্ধারিত হয়, যে কাজ সে ভালোভাবে জানে। তাই তোমরা এলেম অর্জন করে পরস্পরে এলেম সম্পর্কিত কথাবার্তাই বলো, তাহলে তোমাদের সম্মান মর্যাদা প্রকাশ পাবে।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি– প্রত্যেক মানুষের সম্মান মর্যাদা সে কাজ দ্বারাই নির্ধারিত হয় যা সে ভালোভাবে জানে– এমন এক বাক্য, যার নযির কোনো জ্ঞানী বিজ্ঞজনের উক্তিতেই নেই। অনেক কবিই উল্লিখিত বাক্যাংশ ভিত্তি করে কবিতা রচনা করেছেন।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, কারো জন্যে তার এলেম যদি যথেষ্ট হতো, তবে তা হযরত মূসা (আ.)-এর জন্যেই হতে পারতো। আল্লাহ তায়ালা তাকে যে এলেম দান করেছিলেন, সমকালে তার নযির ছিলো না। এতদসত্ত্বেও তিনি কোরআনের ভাষায় হযরত খেযের (আ.) সমীপে নিবেদন করেন–

'আমি কি আপনার সংগে অবস্থান করতে পারি, যাতে আপনি আমাকে সে হেদায়াতের শিক্ষা প্রদান করবেন, আল্লাহর তরফ থেকে যা আপনাকে দান করা হয়েছে।'

www.nagorikpathagar.org

আলী (রা.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি

হযরত আলী মোর্তাযা (রা.) বলেন, এলেম হচ্ছে জ্ঞানী ব্যক্তির হারানো সম্পদ। তা যার কাছে যেখানে পাওয়া যায় হাসিল করে নাও। এমনকি যদি সে এলেম কাফের মোশরেকদের কাছেও থাকে, তবু তা হাসিল করতে দ্বিধা করো না। প্রয়োজনে নিজের ছাত্র থেকে এলেম হাসিল করতেও কারো মানসিক সংকীর্ণতা সৃষ্টি হওয়া অথবা কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

ঈসা বিন মোসাইয়াবের উক্তি

হযরত ঈসা ইবনে মোসাইয়াব (র.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (র.) আমাকে বলেছেন, যখন তুমি কোনো হাদীস শ্রবণ করো, তৎক্ষণাৎ তা অন্যের কাছে বর্ণনা করো, যদি সে তা শুনতে আগ্রহী না হয়– তবুও। কেননা, যদি তুমি এরূপ করো, তা হলে এ হাদীস তোমার স্মৃতিতে পাথরে খচিত রেখার ন্যায় বসে যাবে।

হাকীম জালীনূসের উক্তি

চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও জ্ঞানীদের শিরোমণি জালীনূসকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো, চিকিৎসাবিজ্ঞানে আপনি আপনার সমকালীন সকলের চাইতে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কেন? তিনি বললেন, আমার সমকালীন চিকিৎসাবিদরা মদ্যপানে যে পয়সা উড়িয়েছে, আমি গ্রন্থ অধ্যয়নের উদ্দেশে চেরাগের তেলে তাদের মদের চাইতে বেশী পয়সা খরচ করেছি। কেউ কেউ বলেন, এ উক্তি হচ্ছে আফলাতুনের।

হযরত লায়স বিন সলীম (র.)-এর উক্তি

হযরত লায়স বিন সলীম (র.) বলেন, হাদীস শাস্ত্রের ইমাম হযরত তাউস (র.) আমাকে বলেছেন, তুমি যা কিছু এলেম হাসিল করো, নিজের জন্যেই করো। কেননা, মানুষের মাঝ থেকে আমানতদারী ও লজ্জাশীলতা চলে যাচ্ছে।

হাদীসবেত্তা হযরত শা'বী (র.)-এর উক্তি

একজন মহিলা কোনো বিষয় সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রের ইমাম হযরত শা'বী (র.)-কে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বললেন, হে আলেম! এ বিষয়ে আমাকে ফতোয়া দিন। হযরত শা'বী (র.) মহিলার জবাবে বললেন, আলেম তো সে যে আল্লাহকে ভয় করে।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, যদি তোমরা মানুষের কাছে এমন হাদীস বর্ণনা করো, যা তারা সহীহ মনে করতে পারে না, তবে এ হাদীস শ্রোতাদের জন্য সমস্যা সংকট সৃষ্টির কারণ হবে। অবিকল এ বিষয়বস্তুই হেশাম (র.) তার পিতা হযরত ওরওয়া (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর উক্তি

হযরত ওমর (রা.) এরশাদ করেন, নিজে এলেম শেখো এবং অন্যকে শেখাও। আর এলেমের জন্য গাম্ভীর্য ও ধীরস্থিরতা শেখো। যার থেকে তুমি এলেম শিক্ষা করেছো এবং যাকে শিক্ষা দিয়েছো, উভয়ের জন্যে বিনয় প্রকাশ করো। দাম্ভিক

www.nagorikpathagar.org

অহংকারী আলেম দলের শামিল হয়ো না। তা হলে তোমার মূর্খতা তোমার এলেমের ওপর বিজয়ী হয়ে যাবে।

হযরত জাবের (রা.)-এর উক্তি

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, এমন তিন ব্যক্তি রয়েছেন, মোনাফেক ব্যতীত আর কেউ তাদের অপমান অবমাননা করতে পারে না। তারা হলেন– বৃদ্ধ মুসলমান, ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং পুণ্যময় কথাবার্তা শিক্ষাদানকারী ওস্তাদ।

সুফিয়ান সাওরী (র.)-এর উক্তি

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.) অত্যন্ত গম্ভীর ও ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। একবার তিনি দেখলেন, তাকে দেখতে পেয়েই হাদীস শিক্ষার্থীরা শিক্ষা মজলিসের প্রতি দৌড়াচ্ছে। তখন হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.) বললেন, এসব হাদীস শিক্ষার্থী যদি নিজেদের এলেম অন্বেষণ এবং এ সম্পর্কিত প্রচেষ্টায় আল্লাহ তায়ালাকে পাওয়ার সংকল্প পোষণ করতো, তা হলে তারা কাছে কাছে পদবিক্ষেপ করতো।

(জামেউল এলম)

আধুনিক আবিষ্কার এবং মুসলমান

খৃষ্টান ঐতিহাসিকরা যতোই বিভ্রান্তিকর বর্ণনার আশ্রয় নিক, কিন্তু ইতিহাস এবং ন্যায়পরায়ণ খৃষ্টান ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্যসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় না। মিসরবাসী খৃষ্টান ঐতিহাসিক জুরযী যায়দান সর্বদা মুসলমানদের বৃহৎ বৃহৎ কীর্তিসমূহ এমনভাবে বর্ণনা করে থাকেন, যাতে তার গুরুত্ব হ্রাস পায়, তিনিও এ সত্যের স্বীকৃতিদানে বাধ্য হন। তাই জুরযী যায়দান লেখেন, এটা নিসন্দেহ, মুসলমানরাই হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা। *(তামাদ্দুনে আরব)*

জুরযী যায়দান ছাড়া আরও অসংখ্য ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকার মুসলমানদের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। স্বয়ং জুরযী যায়দানই মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আলোচনায় সেসব আবিষ্কারকে মুসলমানদের কীর্তি বলে গণ্য করেছেন, যেগুলোর ওপর আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত। টেলিগ্রাম, টেলিফোন, ওয়্যারলেস, তোপ, বারুদ, হাওয়াই জাহাজ, তেজাব, সাবান প্রভৃতি। মূর্খতা এবং জ্ঞানের দৈন্যতাবশত যেসবকে লোকেরা ইউরোপের আবিষ্কার বলে থাকেন, এসব মুসলমানদেরই আবিষ্কৃত। এসব আবিষ্কারে সফলতার মুকুট মুসলমানদের শিরেই সুশোভিত হয়ে আছে।

মুসলমানরা দেশের পর দেশ জয় করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গ্রীসে উপনীত হলে গ্রীকদের সে জ্ঞানভাণ্ডার তাদের হস্তগত হয়, যা ছিলো রসায়নবিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত। গ্রীকদের ধারণা ছিলো, বিশেষ পদ্ধতিতে গন্ধক চূর্ণ এবং অন্যান্য দ্রব্যের সংমিশ্রণ থেকে স্বর্ণ রৌপ্য প্রস্তুত হয়েছে। প্রথম প্রথম মুসলমানরা এ বিস্ময়কর এবং দুর্লভ মতবাদ সম্পর্কে অবগত হয়ে তা অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তাকে পূর্ণতা

www.nagorikpathagar.org

দানের উদ্দেশে সচেষ্ট হয়। তারা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং প্রমাণাদি এ প্রচেষ্টা সফল করতে কাজে লাগায়, কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্যের মৌল উপাদান সম্পর্কিত গ্রীক মতবাদ বাস্তবে সঠিক প্রমাণিত হয়নি। এ কর্মধারায় মুসলমানরা যেসব অভিজ্ঞতার সহায়তা নেন, সেসব তাদের প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত সেসব গ্রন্থ আজ মুসলমানদের কাছে নেই। বর্তমানে সেগুলো রয়েছে ইউরোপের গ্রন্থাগারসমূহে।

রসায়নবিদ্যার ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং সুপ্রাচীন। তবে সংক্ষেপে এতোটুকু নিবেদন করার আছে যে, ইমাম জাফর, মোয়াবিয়া বিন ইয়াযীদ বিন মোয়াবিয়া, জাবের, খালেদ এবং হাকীম রাযী প্রমুখকে এ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ গণ্য করা হয়। জাবের বিন হাইয়ানকে ইউরোপবাসী এ শাস্ত্রের গুরু বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। রসায়ন শাস্ত্রের মৌলনীতিসমূহের বেশীর ভাগ তার অভিজ্ঞতা এবং প্রমাণের ওপর ভিত্তিশীল। এ বিষয়ে জাবের বিন হাইয়ান অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। যেগুলো আজও অনুসন্ধান করলে কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক ডক্টর লেবান তার রচিত 'তামাদ্দুনে আরব' নামক গ্রন্থে জাবের বিন হাইয়ানকে অষ্টম খৃষ্ট শতাব্দীর লোক বলে মত প্রকাশ করেছেন। মুসলমানরা যখন রসায়নশাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তখন তারা এ শাস্ত্রকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত করে একে একটি উন্নত শাস্ত্রে রূপান্তরিত করেন। এ বিষয়ে ডক্টর লেবান লেখেন–

আরবরা রসায়নশাস্ত্র বিষয়ে গ্রীকদের থেকে যা কিছু পেয়েছিলেন তা ছিলো খুবই অপ্রতুল। গ্রীকরা যেসব বড়ো বড়ো যৌগিক পদার্থ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলো, আরবরাই সেগুলো আবিষ্কার করেন। *(তামাদ্দুনে আরব)*

ডক্টর লেবান মুসলিম বিজ্ঞানী জাবের বিন হাইয়ান সম্পর্কে লেখেন–

জাবের বিন হাইয়ানের গ্রন্থাদিতে এমন অনেক যৌগিক পদার্থের আলোচনা রয়েছে, ইতিপূর্বে সেগুলো দুনিয়ার মানুষদের অজ্ঞাত ছিলো। তার গ্রন্থসমূহেই প্রথম বাস্তব রাসায়নিক কর্মপদ্ধতি বিধৃত হয়েছে।

এ সূত্রসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহে প্রমাণিত হয়, রাত দিন প্রচেষ্টা চালিয়ে মুসলমানরাই রসায়নশাস্ত্রে নব নব জ্ঞানার্জন করেন এবং এ শাস্ত্রকে সর্বনিম্ন থেকে উন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত করেন। মুসলমানরা প্রথম প্রথম এ শাস্ত্রের প্রতি মূলত এ উদ্দেশেই মনোযোগ আরোপ করেন যে, তারা এর দ্বারা স্বর্ণ রৌপ্য প্রস্তুতে সফল হবেন। যদিও তারা স্বর্ণ-রৌপ্য তৈরীর অভীষ্টলাভে সফল হননি, কিন্তু প্রতিটি বস্তুর সংমিশ্রণ এবং যৌগ সৃষ্টিতে তারা নব নব মূলনীতি এবং রীতিনীতির ওপর জ্ঞান লাভ করেন। ডক্টর লেবান রসায়নশাস্ত্র বিষয়ক অনুসন্ধান ও গবেষণার আলোচনায় সেসব ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের বিভ্রান্তিকর বর্ণনাকে জোরালোভাবে খন্ডন করেন, যারা মুসলমানদের মর্যাদাকর বৃহৎ কীর্তিসমূহকে তুচ্ছ নগণ্য প্রতিপন্ন করার ভ্রান্ত প্রচেষ্টার আশ্রয় নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস এবং আবিষ্কারসমূহের আলোচনায় রজার বেকনকে বারুদের আবিষ্কর্তা বলেছেন। ফরাসী ঐতিহাসিক লেবান ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের এ বর্ণনা ভুল

www.nagorikpathagar.org

প্রতিপন্ন করে প্রমাণ করেছেন, রজার বেকন বারুদের আবিষ্কর্তা নন; বরং তিনি বারুদের সংস্কারক ছিলেন। বারুদ সম্পর্কে মুসলমানদের রচিত প্রাচীন তালিকা রজার বেকনের হস্তগত হয়েছিলো এবং তিনি আরবদের প্রাচীন তালিকারই সংস্কার সংশোধন করেন। তিনি বারুদের আলোচনায় লেখেন–

র‍্যানো ও ফাদের গবেষণা পর্যালোচনা এবং তাদের পূর্বসূরি ককেসরী, আঁদ্রে প্রমুখের বারুদ প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের গবেষণা পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়েছে, আরবরাই বারুদের প্রথম আবিষ্কারক। তোপ এবং বন্দুকও তারা আবিষ্কার করেছেন। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ডক্টর লেবান বারুদ কখন কোথা থেকে কিভাবে ইউরোপীয়দের হস্তগত হয় এবং সর্বপ্রথম কখন ইউরোপীয়রা বারুদ ব্যবহার করেছে, সে সম্পর্কেও আলোচনা করেন। তিনি লেখেন–

ইউরোপীয়রা ১৩৪৬ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ক্রেসীর যুদ্ধে সর্বপ্রথম তোপ ব্যবহার করে, কিন্তু আরবদের রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি থেকে জানা যায়, এর অনেক আগে থেকেই সেখানে তোপের ব্যবহার ছিলো। সামনে অগ্রসর হয়ে প্রখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের সূত্রে ডক্টর লেবান লেখেন–

১২৭৩ খৃস্টাব্দে মরক্কোর শাসক আবু ইউসুফ সেজেলমাসা এলাকা ঘেরাও করেন। তিনি ঘেরাওয়ের অস্ত্রশস্ত্র শহরের সম্মুখভাগে স্থাপন করেন। এসব অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিলো ছোটো মেনজানিক (তোপনিক্ষেপক যন্ত্র), যা দ্বারা লৌহকণা বর্ষণ করা হতো। এসব লৌহকণা পেছনের সিন্দুকে পোরা হতো, এর পেছনে থাকতো বারুদ, যাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হতো। এ ঘেরাওকালে ইংরেজ কাউন্ট ডারবী এবং সলেসরী সেখানে বিদ্যমান ছিলেন। তারা বারুদের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেন এবং এ নবলব্ধ অভিজ্ঞতা স্বদেশে বহন করে নিয়ে যান। সেজেলমাসা ঘেরাও ঘটনার চার বছর পর অনুষ্ঠিত ক্রেসী যুদ্ধে ইউরোপীয়রা সর্বপ্রথম তোপ বারুদ ব্যবহার করেন।

এ প্রসংগে এটা বিশেষ আলোচনাযোগ্য বিষয় যে, আরবদের প্রাচীন গ্রন্থে বারুদ প্রস্তুত তালিকায় বিভিন্ন বস্তুর যে পরিমাণ সন্নিবেশিত হয়েছে, আজও ইউরোপে কমবেশী সে পরিমাণই ব্যবহৃত হচ্ছে। আজকাল ইউরোপে ব্যবহৃত বারুদের ওযন এবং বিভিন্ন একক উপাদানের সাযুজ্য থেকে মুসলমানরাই তোপবারুদের আবিষ্কারক এবং সর্বপ্রথম ব্যবহারকারী– এ চিন্তাধারার সহায়তাই শুধু হয় না; বরং সত্যায়নও হয়ে যায়।

কিছু কিছু আলেম ওলামার গ্রন্থ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ

কোনো কোনো আলেম এবং মাশায়েখের গ্রন্থ সর্বসাধারণ মানুষের ধারণ ক্ষমতার বহু উর্ধ্বে। তাদের রচিত কোনো কোনো গ্রন্থ এমনও রয়েছে, শত্রুরা সেসব গ্রন্থে বিভ্রান্তিকর বিষয়বস্তু এবং কুফরী আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কিত কিছু কথা এ সব গ্রন্থের মূল রচয়িতাদের প্রতি সম্পৃক্ত করে চালিয়ে দিয়েছে। তাই সেসব সম্মানিত ওলামা মাশায়েখ রচিত গ্রন্থ অধ্যয়ন সাধারণ মানুষ বরং সাধারণ আলেমের জন্যেও সমীচীন নয়, যতোক্ষণ না তারা সে সকল প্রয়োজনীয় শাস্ত্রে পরিপূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করবেন।

www.nagorikpathagar.org

কেননা, এসব গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে সাধারণ মানুষ এবং সর্ববিষয়ে পারদর্শিতাশূন্য আলেমদেরও বিভ্রান্ত হবার প্রবল আশংকা রয়েছে। হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব শারানী (র.) 'লাতায়েফুল মেনান ওয়াল আখলাক' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কতিপয় বুযুর্গের গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন–

মোহাম্মদ বিন হাযম জাহেরী রচিত গ্রন্থসমূহ– যা দ্বীনের মূলনীতি এবং আকীদার বিষয় সম্বলিত– সেগুলো অধ্যয়ন থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা কর্তব্য।

তিনি বলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.) রচিত গ্রন্থসমূহ সর্বসাধারণের বোধ বুদ্ধির বহু উর্ধ্বে। তার কিছু কিছু গ্রন্থ বিশেষত ফতূহাত, ফুসূসুল হেকাম প্রভৃতিতে মোলহেদ (নাস্তিক)-রা অনেক কুফরী বিষয়বস্তু প্রবিষ্ট করিয়েছে। তিনি বলেন, শায়খ আবু তাহের (র.) তার শায়খ বদরুদ্দীন ইবনে জুমায়া থেকে উদ্ধৃত করেছেন, শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.)-এর গ্রন্থসমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায় কেরামের অভিমতের পরিপন্থী যেসব বিষয়বস্তু পাওয়া যায়, তা সবই আল্লাহ অস্বীকারকারীদের জুড়ে দেয়া। চরিতাভিধান কামুস প্রণেতা শায়খ মাজদুদ্দীনও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শায়খ মাজদুদ্দীন (র.) বলেন, শায়খ শামসুদ্দীন (র.) আমার কাছে হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.) রচিত 'ফতূহাত' গন্থের একটি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসেন। ছাপানো পাণ্ডুলিপির সাথে হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন আরাবী (র.)-এর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির তুলনা করলে দেখা যায়, তাতে মুদ্রিত কিছু বিষয়বস্তুর নাম নিশানাও নেই। অনুরূপ ইমাম ওমর বিন মোহাম্মদ ইশবেলী আশয়ারী (র.) রচিত 'লাহনুল আওয়াম' নামক গ্রন্থে বলেন, ইমাম গাযালী (র.) রচিত 'এহইয়াউল উলূম' গ্রন্থের কতিপয় জায়গা রয়েছে, প্রাসংগিক যাবতীয় বিষয়ে পারদর্শিতা এবং সুস্থ বোধ ব্যতিরেকে সেসব স্থানে আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ অত্যন্ত ক্ষতিকর। অনুরূপ ইমাম গাযালী (র.) রচিত 'কিতাবুন নাফহে ওয়াত তাসাওউহ' গ্রন্থেও পরে অনেক বিভ্রান্তিপূর্ণ ভুল বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে।

হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব শারানী (র.) বলেন, শায়খ আবু তালেব মক্কী (র.) রচিত কেতাবু কুতিব কুলুব' গ্রন্থের কতিপয় স্থানও হযরত ইমাম গাযালী (র.)-এর 'এইইয়াউ উলূমিদ্দীন' এবং 'কিতাবুন নাফহে ওয়াত তাসাওউহ' গ্রন্থের মতো। আর মোনযের বিন সায়ীদ নাসূতী রচিত গ্রন্থসমূহ মোতাযেলী চিন্তা চেতনা ও ভাবধারার আলোচনায় পরিপূর্ণ। ইবনে বারজান রচিত গ্রন্থসমূহ এবং আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী (র.) রচিত তাফসীরে কাশশাফের অনেক স্থানে মোতাযেলী চিন্তা চেতনা ও ভাবধারার আলোচনা রয়েছে।

হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহহাব শারানী (র.) আরও বলেন, মাজরেতী রচিত বায়ান্নটি পুস্তিকার সমষ্টি 'এখওয়ানুস সাফা' গ্রন্থ অধ্যয়ন থেকেও বেঁচে থাকা কর্তব্য। কেননা, প্রসিদ্ধি রয়েছে, এখওয়ানুস সাফা রচয়িতা মাজরেতী ইসলাম বিরোধী আকীদা বিশ্বাস লালনকারী আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকারকারী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। শায়খ শারানীর মতে, ইবরাহীম নেযাম ইবনে রাওয়ান্দী এবং মোয়াম্মার বিন মোসান্না প্রমুখ

www.nagorikpathagar.org

রচিত গ্রন্থাদি অধ্যয়নও অত্যন্ত ক্ষতিকর। শায়খ আবদুল করীম জাবালী রচিত 'আইনে মাজমূমা' গ্রন্থটির অধ্যয়নও ক্ষতিকর। *(লাতায়েফুল মেনান, পৃঃ ৩২৯)*

ছাত্রজীবনে আমলের প্রচেষ্টা

হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহহাব শারানী (র.) বলেন, আমার শায়খ হযরত আলী খাওয়াস (র.) বলেন, শিক্ষার্থীদের নিজেদের আমল থেকে বিরত রাখা সমীচীন নয়। আগে এলেম হাসিল করে পরে আমলের প্রতি মনোনিবেশ করবো– তারা যেন এরূপ না ভাবে। এটা এক শয়তানী প্রবঞ্চনা। এর মাধ্যমে শয়তান শিক্ষার্থীদের আমল থেকে ফিরিয়ে রেখে নিষ্প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বিষয়সমূহের এলেম হাসিলে নিবিষ্ট করে, যেসব বিষয়ের প্রয়োজন খুব কমই হয়ে থাকে। আর নিষ্প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বিষয়ের এলেম হাসিলের পেছনে লাগা শিক্ষার্থীদের আমলে মনোনিবেশ করার তাওফীক হয় না।

এ আলোচনা শেষে হযরত ইমাম শারানী (র.) বলেন, আমি কামনা করি, ওলামায়ে কেরাম এবং দ্বীনী এলেম শিক্ষার্থীরা এমন হস্তকর্ম এবং শিল্পবিদ্যা শিখুক, জীবিকার্জনে এগুলো তাদের কাজে লাগবে। যাতে তারা দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীন বিক্রি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে এবং মানুষের সদকা খয়রাতের প্রতি তাদের দৃষ্টি না যায়। কেননা, কঠোর প্রয়োজন ব্যতীত সদকা খয়রাত খাওয়ার ফলে জ্ঞান বিবেকের ঔজ্জ্বল্য নিশেষ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে হালাল পন্থায় অর্জিত জীবিকা দ্বারা জ্ঞান বিবেকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়।

ইমাম শারানী (র.) বলেন, আমি একবার এমন একদল জ্ঞানীর মজলিসে উপনীত হই, যারা পানাহার ও পরিধেয় বস্তু সামগ্রীতে সাবধানতা অবলম্বন করতো না। আমি দেখতে পেলাম, তাদের সমুদয় এলমী জিজ্ঞাসা এবং পারস্পরিক আলোচনা এমন সব নিরর্থক বিষয় সম্পর্কিত, যা ওলামায়ে কেরামের সম্মান মর্যাদা থেকে অনেক নিম্নমানের বিষয়। আমি বুঝে ফেললাম, এসব সন্দেহযুক্ত পানাহার এবং পরিধেয় বস্ত্র সামগ্রীর কুফল। হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব শারানীর রচিত।

(লাতায়েফুল মেনানে ওয়াল আখলাক, পৃঃ ৩৭৪)

হযরত ঈসা (আ.)-এর একটি উপদেশ

হযরত ইমাম মালেক (র.) মোয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ.) বলতেন–

আল্লাহর যেকের ব্যতীত অন্য কথা বেশী বলো না। যদি এর অন্যথা করো তা হলে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে যাবে। আর কঠোর অন্তকরণ আল্লাহ তায়ালা থেকে বহুদূরে থাকে। অথচ তোমরা তা জানো না। আর মনিব মালিকের মতো মানুষের দোষসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না; বরং গোলামের মতো নিজের গোনাহ সম্পর্কে চিন্তা করো। কেননা, মানুষ দুই প্রকার, এক প্রকার বিপদগ্রস্ত এবং অন্য প্রকার নিরাপদ। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে বিপদগ্রস্ত, অর্থাৎ গোনাহগারের প্রতি করুণা প্রর্দশন করা এবং নিজে গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকার কারণে আল্লাহর শোকর আদায় করা।

(ইমাম মোনযেরী– কেতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব, পৃঃ ৫২১)

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃত লজ্জা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে পূর্ণ লজ্জা পোষণের পন্থা হচ্ছে, তুমি নিজের মস্তিষ্ক এবং চিন্তা চেতনার হেফাযত করবে, যেন তোমার মস্তিষ্কে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো চিন্তা চেতনা স্থান নিতে না পারে। নিজের উদর এবং তার অভ্যন্তরে যে বস্তু রয়েছে তার হেফাযত করো, যেন তাতে হারাম কিছু প্রবেশ করতে পারে। তুমি মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাবার কথা স্বরণ করো। যে আখেরাতের কথা চিন্তা করে সে দুনিয়ায় নিষ্প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা পরিহার করে। অতএব, যে এ কয়টি বিষয় পালন করলো সে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ লজ্জা পোষণের হক আদায় করলো।

(ইমাম মুনযেরী– কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব, পৃঃ ৪৮৫)

ইমাম আওযায়ী (র.) মনসূর আব্বাসীর দরবারে

(এখানে যেসব বিষয় উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ এবং ভগ্নীপতি, মাদ্রাসা দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা নাবীহ হাসান (র.)-এর স্মৃতি থেকে পাওয়া। এগুলো তার লিপিবদ্ধ কাগজপত্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। এ বিষয়টিকে এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করা সমীচীন মনে করেই আমি এখানে তা পেশ করছি।)

হযরত ইমাম আওযায়ী (র.) ইসলামের সেসব সুযোগ্য সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত, যাঁদের সত্তা নিয়ে ইসলাম গর্ব অহংকার করতে পারে। তার মহামূল্যবান কীর্তিসমূহ আজও ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। হযরত ইমাম আওযায়ী (র.)-এর প্রকৃত নাম আবদুর রহমান, ডাকনাম আবু ওমর। এলেম ও হেদায়াতের এ সূর্য হিজরী ৮৮ সনে বালাবাক্কের আকাশে উদিত হয়। তিনি মাতৃক্রোড় পার না হতেই সময়ের বিবর্তন তার কপালে পিতৃহীনতার তিলক এঁকে দেয়।

শৈশবে পিতৃস্নেহ বঞ্চিত মানব সন্তানের শিক্ষাজীবনের ওপর কি বিরূপ প্রভাব পড়ে তা সর্বজনবিদিত। তবে এটাও ঠিক, বিশ্বজগতের পালনকর্তা মহান আল্লাহর অসীম রহমত করুণা কারো রাজত্ব রাজক্ষমতা দেখে নাযিল হয় না, কারো প্রভাব প্রতিপত্তি অথবা তার বংশগোত্র বা আত্মীয়স্বজনের মর্যাদা দেখেও তা অবতরণ করে না। এ ধরনের মানুষদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন– আমি ভাংগা অন্তরের অধিকারী বান্দাদের কাছে বেশী অবস্থান করি।

তার শিক্ষাদীক্ষা মায়ের তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে যৌবনে পদার্পণের পূর্বেই সর্ববিষয়ে তিনি পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করেন। তার এলমী পারদর্শিতা কোনো বর্ণনার মুখাপেক্ষী নয়। তিনি গবেষণা শক্তি, এলেম, আমল, প্রকৃতিগত মেধা প্রতিভা, তাকওয়া পরহেযগারী, পবিত্রতা প্রভৃতি বিষয়ে নিজের কালের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতে লাগলেন।

ইসমাঈল বিন আইয়াশ (র.) বলেন, আমি মানুষকে বলতে শুনেছি, আবদুর রহমান আওযায়ী এ উম্মতের আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যকার সর্বোত্তম সন্তান। তার ওপর

www.nagorikpathagar.org

দ্বীনী এলেমের এমন গভীর প্রভাব পড়েছিলো যা তার প্রকাশ্য অংগ প্রত্যংগের ওপরও দেখা যেতো। তার চেহারা থেকে বিনয় নম্রতা টপকাতো। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই আল্লাহকে বেশী ভয় করেন– হযরত ইমাম আওযায়ী (র.)-এর পবিত্র সত্তা আল্লাহ তায়ালার এ ঘোষণার সমুজ্জল প্রতীক ছিলো।

আবু মোসহের বলেন, সম্মানিত ইমাম রাতভর নামায, কোরআন তেলাওয়াত এবং কান্নাকাটি করে কাটাতেন। জীবনভর কেউ তাকে অট্টহাসি হাসতে দেখেনি। বে-দরকারী কোনো কথা কখনো তিনি বলতেন না। এমনিতে তিনি এলেম ও আমলে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সৎকাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধে তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। ধনী গরীব নির্বিশেষে সবাইকে তিনি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতেন। এ ব্যাপারে তিনি কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরোয়া করতেন না।

সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে বহু বারই তিনি শত্রুর হাতে আক্রান্ত হন, কিন্তু তিনি ছিলেন ধৈর্যের পর্বততুল্য এক প্রতীক। কঠোর বিপদের ঝঞ্ঝাবাত্যা তাকে নিজের অবস্থান থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণও টলাতে পারতো না। এ সম্মানিত ইমাম একবার নিজের এক ঘটনা বর্ণনা করে বলেন–

সমকালীন শাসক একদিন আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক মাসয়ালা সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? অথচ সত্য বলায় জীবনের ভয় ছিলো। তাই আমার মনে কিছুটা ভীতি চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, কিন্তু সাথে সাথেই মনে হলো, দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট আখেরাতে আল্লাহর আযাবের তুলনায় তো কিছুই নয়। সুতরাং জীবন চলে যায় যাক, কিন্তু সত্য বলতে দ্বিধান্বিত হওয়া উচিত নয়। শাসকের জিজ্ঞাসার জবাবে আমি যা সত্য তাই সম্পষ্টভাবে বলে দিলাম। আমার জবাব শুনে শাসক অগ্নিশর্মা হয়ে পড়েন। তবে আল্লাহর প্রশংসা, আমার ওপর শাসকের অগ্নিশর্মা অবস্থার কোনো প্রভাব পড়েনি।

এ আলোচনায় হযরত ইমাম আওযায়ী (র.)-এর জীবনচরিত লেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং তার উচ্চ সাহসিকতা, দৃঢ়তাপূর্ণ ক্রিয়াকর্মের কিছু দিক পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য। এখানে তার একটি ঘটনা সম্মানিত পাঠকদের অবগতির জন্যে উপস্থাপিত হচ্ছে, যা সংঘটিত হয়েছে খলীফা মনসূর আব্বাসীর দরবারে। এ ঘটনায় সম্মানিত পাঠক দেখতে পাবেন, কিভাবে আল্লাহর ভয়ে ভীত এক বান্দা নির্ভয়ে সাহসিকতার সাথে একজন প্রবল প্রতাপশালী শাসকের সম্মুখে নিরবচ্ছিন্নভাবে বক্তৃতা করে চলেছেন।

একদিন হযরত ইমাম আওযায়ী (র.) সমকালীন শাসক মনসূর আব্বাসীর দরবারে গমন করেন, কিন্তু তার সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য খোশামোদ কিংবা চাটুকারিতা করে সরকারী সম্পদ এবং প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে অবৈধ ফায়দা হাসিল করা ছিলো না; বরং সম্মানিত ইমামের শাসকের দরবারে গমনের উদ্দেশ্য ছিলো তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সঠিক বিধি বিধান সামনাসামনি পৌঁছে দেয়া। তিনি শাসকের দরবারে

www.nagorikpathagar.org

গিয়ে এক মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা শুরু করে দেন। বক্তৃতাকালে তিনি শাসক মনসূর আব্বাসীর উদ্দেশে বলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, হযরত ফারূকে আযম ওমর (রা.) বলতেন, যদি ফোরাতের কূলে কোনো একটি বকরীর বাচ্চাও ক্ষুধায় মারা যায়, তাহলে কেয়ামতে এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় কিনা এ ভয়ে আমি ভীত।

হে আবু জাফর! এখন আপনি নিজেই নিজের অবস্থা সম্পর্কে গভীর অভিনিবেশ সহকারে ভেবে দেখুন। আপনার রাজত্বে, আপনার শাসনাধীন এলাকায় বনী আদমরা ন্যায় ইনসাফ থেকে বঞ্চিত। তারা যুলুম অত্যাচারে মারা যাচ্ছে। আপনার কি পরিণতি হবে!

হে আমীরুল মোমেনীন, আমার কাছে ইয়াযীদ বিন জাবের হযরত আবদুর রহমান বিন আমর আনসারী (রা.) থেকে, তিনি হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর (রা.) এক আনসার সাহাবীকে সদকা যাকাত উসূল করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। নিযুক্তির ঘোষণা শোনার পরই এ সাহাবী হযরত ওমর (রা.)-এর কাছ থেকে বিদায় নেন। তিনি ভেবেছেন, নিয়োগপ্রাপ্ত সাহাবী বুঝি তার নির্দিষ্ট কর্মস্থলে চলে গেছেন। কিছু দিন পর হযরত ওমর (রা.) দেখতে পেলেন, সাহাবী মদীনায় অবস্থান করছেন। তিনি কর্মস্থলে গমন করেননি। হযরত ওমর (রা.) তাকে কর্মস্থলে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, আপনি আপনার নির্ধারিত কর্মস্থলে যেতে দেরী কেন করলেন! আপনি কি জানেন না, এ ধরনের লোকেরা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারীদের সওয়াব লাভ করে। আনসার সাহাবী জবাবে বললেন, কখনো নয়। এ জবাবে বিস্মিত হয়ে হযরত ওমর (রা.) তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি জবাব দিলেন, আমার কাছে রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ হাদীস পৌঁছেছে– সকল শাসক, আজ যাদের করায়ত্তে মানুষের কাজকর্মের দায়িত্ব রয়েছে, কেয়ামতের দিন তাদের এমনভাবে ওঠানো হবে যে, তাদের হাত গর্দানের সাথে বাঁধা থাকবে। ইনসাফ ন্যায়বিচার ব্যতীত আর কিছুই তাদের এ মসিবত থেকে মুক্ত করতে পারবে না। এরপর তাকে আগুনের পুলের ওপর দাঁড় করানো হবে। লেলিহান অগ্নিশিখা এবং উড়ন্ত অগ্নিস্ফুলিংগের উত্তাপে একের পর এক অংগ গলে পড়বে। এর পর আল্লাহর হুকুমে সব অংগ প্রত্যংগ জোড়া লেগে যাবে এবং হিসাব কিতাব শুরু হবে। যথাযথ ইনসাফ ন্যায়বিচার করলে তবেই আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। অন্যথায় সে ফেঁসে যাবে এবং সত্তর বছর পর্যন্ত জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে অবস্থান করতে হবে।

আনসার সাহাবীর কথায় হযরত ওমর (রা.) ব্যাপারটি আঁচ করে ফেলেন। তিনি সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ হাদীস কার কাছ থেকে শুনেছো। সাহাবী জবাব দিলেন, হযরত আবু যর ও সালমান ফারেসী (রা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি। হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তুতে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন। তিনি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে হযরত আবু যর ও হযরত সালমান ফারেসী (রা.)-কে ডেকে আনেন। তারা

www.nagorikpathagar.org

এলে হযরত ওমর (রা.) এ হাদীস সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করেন। তারা জবাব দিলেন, নিসন্দেহে আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে এ হাদীস শুনেছি।

সাহাবীদের জবাবে হযরত ওমর (রা.) কেঁপে ওঠেন। তার চোখ থেকে অবাধে অশ্রু প্রবাহিত হতে শুরু করে। তিনি নিজেকে নিজে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, হায় ওমর! এসব বিপদ মসিবত, দুঃখ কষ্ট বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোন্ অপরিণামদর্শী নির্বোধ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব মাথায় নেবে!

হযরত ওমর (রা.)-এর উল্লিখিত অনুশোচনাপূর্ণ কথার জবাবে হযরত আবু যর গেফারী (রা.) বললেন, বিপদ মসিবত, দুঃখ কষ্ট বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সে ব্যক্তিই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নিজের মাথায় নেবে, যাকে আল্লাহ তায়ালা লাঞ্ছিত অপমানিত করেছেন। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) অঝোর ধারে কাঁদতে থাকেন। তার কান্না দেখে আমারও কান্না এসে যায়।

হে আমীরুল মোমেনীন! দ্বিতীয় খলীফার অবস্থা দেখুন, ভাবুন এবং নিজের সম্পর্কে অনুমান করুন, আপনি তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে এ পদমর্যাদার হক কতোটুকু আদায় করেছেন?

হে আমীরুল মোমেনীন! হযরত ওমর (রা.) রাষ্ট্র পরিচালনার যে কঠিন মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, যাদের আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের শাসক রক্ষক বানিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেরই হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালানার মূলনীতি নিজের হৃদয় ফলকে লিখে রাখা কর্তব্য।

হে আমীরুল মোমেনীন! হযরত ওমর (রা.) বলতেন, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব সে-ই সামলাতে পারে, যে পরিপূর্ণ জ্ঞান বিবেক এবং দ্বীনী জ্ঞানের অধিকারী হবে। তার থেকে কোনো অন্যায় প্রকাশ পাবে না এবং সত্যের ব্যাপারে সে কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনা তিরস্কারের পরোয়া করবে না।

হে আমীরুল মোমেনীন! হযরত ওমর (রা.) বলতেন, শাসক চার প্রকারের হয়ে থাকে। তার এক প্রকার হলো সে শাসক, যে দৃঢ় ও সাহসী, যে যুলুম অত্যাচার অবিচার থেকে বেঁচে রয়েছে এবং নিজের আমলা কর্মচারীদেরও জনগণের প্রতি কঠোর এবং স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ আচরণ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এমন ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের সাওয়াব লাভ করবে। বিশ্বপালক আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন।

খলীফা মামুনুর রশীদ ও এক কমবয়সী কাযীর মধ্যকার পত্রালাপ

খলীফা মামুনুর রশীদ যখন ইয়াহইয়া বিন আকসুম (র.)-কে বসরার কাযী (বিচারক) করে পাঠান, তখন তার বয়স ছিলো খুবই কম। এতে কিছু লোক খলীফাকে ভর্ৎসনাপূর্ণ পত্র লেখেন। তখন খলীফা মামুন কাযী ইয়াহইয়া বিন আকসুম (র.)-কে চিঠি লেখে তার বয়স জিজ্ঞেস করেন। তিনি খলীফার চিঠির জবাবে লেখেন–

www.nagorikpathagar.org

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবী হযরত এতাব ইবনে ওসায়দ (রা.)-কে যখন প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, তখন তার যে বয়স ছিলো, বর্তমানে আমার বয়সও তাই। *(মাবসূত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৬৭)*

সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধ রহমত

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.) বলেন, শাখা মাসয়ালাসমূহে সাহাবায়ে কেরামের মতভেদ না হওয়া কখনোই আমার পছন্দ নয়। কেননা, যদি তাদের সর্বসম্মত অভিমত হতো, তাহলে মানুষ কষ্ট এবং সংকীর্ণতায় পড়ে যেতো। সাহাবায়ে কেরাম অনুসৃত এবং নেতৃস্থানীয়। তাদের যে কোনো একজনের অভিমতের ওপর আমল করার অবকাশ থাকতো না। *(জামেউল এলম, পৃঃ ১৪৩)*

কাফেরদের সাথে যুদ্ধে মুসলমানদের কঠোর সাবধানতা

রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবী হযরত মোয়ায বিন জাবাল (রা.)-কে এক ইসলামী বাহিনীর নেতা বানিয়ে পাঠান এবং তাকে উপদেশ প্রদান করেন–

কাফেরদের সাথে ততোক্ষণ যুদ্ধ করবে না, যতোক্ষণ না তাদের ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাবে (যদি ইসলামের সত্যতা তারা হৃদয়ংগম করতে পারে তবে তো ভালো)। তারা যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তা হলেও তোমরা প্রথমে যুদ্ধ শুরু করবে না। যদি কাফেররা আগে যুদ্ধ শুরু করে তা হলেও তোমরা ততোক্ষণ যুদ্ধ শুরু করবে না যতোক্ষণ না তারা তোমাদের কোনো মুসলমানকে শহীদ করে। যদি তোমাদের কাউকে কাফেররা শহীদও করে, তবু তোমরা যুদ্ধ শুরু করবে না; বরং তাদের তোমাদের শহীদের লাশ দেখাবে এবং বলবে, তোমরা কি এমন কোনো ব্যবস্থা করতে পারো যা যুদ্ধবিগ্রহ থেকে উত্তম।

কেননা, যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হাতে কাফেরদের হেদায়াত দান করেন, তা হলে এটা হবে তোমাদের জন্যে সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব কিছু থেকে উত্তম।

(শামসুল আয়েম্মা সারাখসী– মাবসূত, দ্বিতীয় খন্ড পৃঃ ৩১)

শামসুল আয়েম্মা সারাখসী (র.) মাবসূত গ্রন্থে এ হাদীস উদ্ধৃত করার পর কিছু রেওয়ায়াত এমনও উল্লেখ করেছেন, যেসব থেকে জানা যায়, ইসলামের প্রতি দাওয়াত এবং ভীতি প্রদর্শনে অতিরিক্ত করতে যাওয়া উচিত নয়। শুরু থেকেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ। তবে এ হাদীসের নির্দেশ সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যখন আমীর বা নেতা কাফেরদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে শুরুতেই নিরাশ হয়ে পড়েন। তা হলে প্রথমেই তারা যুদ্ধ শুরু করতে পারেন। অন্যথায় তাই করণীয় হবে, যা হযরত মোয়ায (রা.) বর্ণিত হাদীসে আলোচিত হয়েছে।

কুফায় হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)– যিনি ফকীহ সাহাবীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি যখন কুফায় অবস্থান গ্রহণ করেন, তখন ওলামায়ে কেরাম এবং শিক্ষার্থীদের এতো ভিড় জমে যে, শুধু কুফাতেই তার চার হাজার ছাত্র

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন। হযরত আলী (রা.) যখন কুফায় শুভ পদার্পণ করেন এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন, তখন সাথে তার ছাত্র এবং কুফায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন। যাদের মহাসমাবেশ চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এ দেখে হযরত আলী (রা.) বলেন–

আপনি তো এলেম ও ফেকাহ দ্বারা এ শহরকে ভরে দিয়েছেন।

(মাবসূত, ষষ্টদশতম খন্ড, পৃঃ ৬৮)

হযরত বেশর হাফী (র.)-এর কিছু অবস্থার বর্ণনা

হযরত বেশর হাফী (র.) হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সেসব বুযুর্গের একজন, যাদের আল্লাহ তায়ালা জাহেরী বাতেনী এলেম এবং শরীয়ত ও তরীকতের ইমাম বানিয়েছিলেন। ইমাম মালেক, হাম্মাদ বিন যায়দ, ফোযায়ল বিন ইয়ায এবং আবদুল্লাহ বিন মোবারক (র.) প্রমুখের মতো হাদীস শাস্ত্রের ইমামদের কাছ থেকে তিনি এলমে হাদীস শিক্ষা করেন। সম্মানিত মোহাদ্দেসদের এক বিরাট দল আবার তার কাছ থেকেও এলমে হাদীস শিক্ষা করেন। বিনয়, পুণ্যশীলতা, তাকওয়া ইত্যাদি কারণে তিনি স্বতন্ত্রভাবে হাদীস শিক্ষাদানের পন্থা অবলম্বন করেননি; বরং তিনি নিজের জন্যে দুনিয়াবিমুখতা, এবাদতে নির্জনতা এবং অখ্যাত অপ্রসিদ্ধ থাকার পন্থাই অবলম্বন করেন।

একবার হযরত বেশর হাফী (র.) রাস্তায় এক টুকরা কাগজ পড়ে থাকতে দেখেন, যাতে আল্লাহর নাম লেখা ছিলো। অথচ কাগজখন্ডটি পথচারীদের দ্বারা পদদলিত হচ্ছিলো। তিনি পড়ে থাকা কাগজখন্ডটি উঠিয়ে তা পরিষ্কার করেন। তার কাছে যে এক দেরহাম ছিলো তা দিয়ে খোশবু কেনেন এবং খোশবু কাগজখন্ডে লাগিয়ে তা এক প্রাচীর গাত্রে হেফাযত করে রেখে দেন। রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ যেন বলছেন, হে বেশর, তুমি আমার নামকে খোশবু লাগিয়েছো, দুনিয়া আখেরাতে আমি তোমার নামের ওপর খোশবু লাগাবো।

হযরত বেশর হাফী (র) বলতেন, যে কোরআন শরীফ হেফয করেছে এবং 'জামে সুফিয়ান' আত্মস্থ করেছে, তার উচিত এবাদতে লেগে যাওয়া। কেননা, প্রয়োজন পরিমাণ এলেম তার অর্জিত হয়েছে, আর এলেম শিক্ষার উদ্দেশ্য তো হচ্ছে আমল করা। সুতরাং এখন আমলে মনোযোগ দেয়া উচিত।

'জামে সুফিয়ান' স্বয়ং হযরত বেশর হাফী (র) সংকলিত একখানা সুন্দর কিতাব। যাতে হযরত সুফিয়ান সাওরী (র)-এর ফতোয়া এবং ফেকহী মাসয়ালাসমূহ একত্র করা হয়েছে।

তিনি বলতেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দার ভালো চান, তখন তার ওপর এমন লোককে প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেন, যে তাকে কষ্ট দেয়।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলতেন, সে ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যে মানুষ দ্বারা কষ্ট পায় না, আর বান্দা ততোক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না, যতোক্ষণ না চারদিক থেকে তার ওপর বিপদ মসিবত নাযিল হতে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

তিনি বলেন, যে দুনিয়ায় মর্যাদা এবং আখেরাতে সম্মান লাভ করতে আকাংখী, সে যেন নিজের মাঝে তিনটি স্বভাব সৃষ্টি করে। সে তিনটি স্বভাব হলো, কারো কাছে কোনো বস্তু চাইবে না, কাউকে মন্দভাবে স্মরণ করবে না, অর্থাৎ তার নিন্দাবাদ করবে না, কারো দাওয়াত কবুল করবে না।

কেউ নিষ্ঠা আন্তরিকতার সাথে দাওয়াত করলে তার দাওয়াত কবুল করা কিন্তু সুন্নত, বর্তমানকালে অধিকাংশ দাওয়াতেই নিষ্ঠা আন্তরিকতা থাকে না। হযরত বেশর হাফী (র) এখানে সে ধরনের দাওয়াতের ক্ষেত্রেই একথা বলেছেন।

২২৭ হিজরী সনে হযরত বেশর হাফী (র) ইন্তেকাল করেন। তার জানাযায় আল্লাহর বান্দাদের এতো ভিড় হয় যে, ফজরের নামাযের পর থেকেই জানাযা বের করা শুরু হয় এবং মাগরেবের নামাযের সময় তা কবরস্তানে পৌছে। সময়টাও ছিলো গ্রীষ্মকালের।

আহমদ বিন ফাতহে বলেন, ইনতেকালের পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখি। দেখলাম, বিশাল এক দস্তরখান বিছানো রয়েছে এবং হযরত বেশর হাফী (র.) তাতে বসে খাচ্ছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? জবাবে বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে দয়া করেছেন এবং ক্ষমা করেছেন। সমগ্র জান্নাত আমার জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। আমাকে নির্দেশ করেছেন, জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করা এবং যা কিছু চাও তাই খাও এবং পান করো। কেননা, দুনিয়ায় তুমি নিজের প্রবৃত্তিকে কামনা বাসনার অনুগমন থেকে বাধা দিয়ে রাখতে।

আমি তাকে আরো জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ভাই হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) কোথায় আছেন? বললেন, তিনি জান্নাতের দরজায় রয়েছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতভুক্ত যারা আল্লাহর কালাম গায়রে মাখলুক (অর্থাৎ সৃষ্ট নয়) বলে বিশ্বাস পোষণ করতেন, সুপারিশ করে করে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাচ্ছেন।

(তারীখে ইবনে আসাকের, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২৪১-২৪৮)

মিথ্যা চাটুকারিতার শাস্তি

ওয়ালীদ বিন আবদুল মালেকের শাসনামলে তার খোশামদের উদ্দেশে এক লোক বানোয়াট হাদীস গড়ে জাল বর্ণনা সূত্র সহকারে তার সামনে উপস্থাপন করে। এ বানোয়াট হাদীসের বিষয়বস্তু ছিলো–

আল্লাহ তায়ালা তার কোনো বান্দাকে খলীফা বা আমীরুল মোমেনীন বানালে তার শুধু পুণ্য কর্মসমূহই লেখা হয়, দুষ্কর্মসমূহ লেখা হয় না।

ওয়ালীদ বিন আবদুল মালেক কোনো ওলীআল্লাহ নন। পুণ্যবান মোত্তাকী বা মোত্তাকীদের দলভুক্ত বলেও তিনি গণ্য নন, কিন্তু তখনো নবুওয়ত যুগের কাছাকাছি থাকার বরকতের প্রভাব প্রতিক্রিয়া মোটামুটি সব কিছুর মাঝেই বিদ্যমান ছিলো। এটা শোনামাত্রই তিনি বলে ফেলেন, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, এটা কোনো হাদীস নয়– হতেও পারে না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা কোরআন করীমে এরশাদ করেন–

www.nagorikpathagar.org

'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার খলীফা– প্রতিনিধি বানিয়েছি; অতএব তুমি মানুষের মাঝে যেসব বিচার ফয়সালা করবে, তাতে প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না, কেননা প্রবৃত্তির অনুসরণ তোমাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে ভ্রষ্ট করবে। নিশ্চয় যেসব মানুষ আল্লাহর রাস্তা ভ্রষ্ট হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব, কারণ তারা হিসাবের দিনের কথা ভুলে গেছে।' *(সূরা সোয়াদ, আয়াত ২৬)*

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ (আ.)-এর মত দৃঢ়পদ নবীকে খলীফা বনানোর সাথে সাথে ঘোষণা করছেন– যদি কখনো তুমি সত্যের বিপরীত বিচার ফয়সালা করো তাহলে কঠোর আযাবের যোগ্য সাব্যস্ত হবে। সুতরাং একজন দৃঢ়পদ নবীকে উদ্দেশ করেই যেখানে আল্লাহ তায়ালার উক্তরূপ ঘোষণা, সেখানে অন্য মানুষের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করারই বা কি আছে!

(ফাতহুল বারী, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭)

ওয়ালীদ বিন আবদুল মালেক বুঝে ফেললেন, লোকটি শুধু আমাকে খুশী করার জন্যই মিথ্যা হাদীস গড়েছে। তিনি লোকটির ওপর খুশী না হয়ে তার সাথে বিপরীত ব্যবহার করেন। আর এ মিথ্যা হাদীস প্রণেতা– যে দ্বীনকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করতে চাচ্ছিলো, সে ব্যর্থ হলো।

আলোচ্য ঘটনা থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর সে উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হয় যা তিনি হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রা.)-এর পত্রের জবাবে লিখেছিলেন। তিনি এ জবাবী পত্রে লেখেন, যে ব্যক্তি কোনো সৃষ্টিকে খুশী করার জন্য স্রষ্টাকে নাখোশ করে, তাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালা সে সৃষ্টিকেই তার ওপর চাপিয়ে দেন। *(তিরমিযী)*

আসকালানে হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.)

একবার হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.) আসকালান গমন করেন এবং তিন দিন সেখানে অবস্থান করেন। এ তিন দিনের মধ্যে কেউ তার কাছে কোনো মাসয়ালা বা দ্বীনের কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করতে আসেনি। তখন তিনি বন্ধুকে বললেন, আমাকে সওয়ারী ভাড়া করে দাও, আমি এ শহর থেকে বেরিয়ে যাবো। কেননা, এটা এমন এক শহর, যেখানে থাকলে এলেম মরে যাবে।

(ইবনে আবদুল বার– জামেউল এলম, পৃষ্ঠা ৮৬)

সংস্কার সংশোধনের দায়িত্বশীল ওলামায়ে কেরাম এবং নেতৃস্থানীয় সম্প্রদায়

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের দুটি দল এমন, যদি তারা সংশোধিত হয় তা হলে সব মানুষ সংশোধন হয়ে যাবে। আর যদি তারা বিনষ্ট হয় তাহলে সব মানুষই বিনষ্ট হবে। এ দুটি দল হলো ওলামায়ে কেরাম এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় সম্প্রদায়।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, ওলামায়ে কেরামের উদাহরণ ঠিক লবণের মতো। কোনো জিনিস খারাপ বা নষ্ট হতে লাগলে লবণ তা সংশোধন করে দেয়, কিন্তু লবণই

www.nagorikpathagar.org

যদি নষ্ট হয়ে যায় (অর্থাৎ পরিমাণে বেশী হয়), তা হলে কোনো বস্তু দ্বারাই এর সংশোধন হয় না। *(ইবনে আবদুল বার- জামেউল এলম)*

ফলিফার নামে হযরত যার বিন হোবায়শ (র.)-এর পত্র

তাবেয়ীদের মধ্য হযরত যার বিন হোবায়শ (রা.) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম। তিনি ফারুকে আযম হযরত ওমর (রা.), আলী মোরতাদা (রা.), আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.), আবদুর রহমান বিন আওফ (রা.), উবাই বিন কাব (রা.), হোযায়ফা (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের সংসর্গ পেয়েছেন এবং তাদের সূত্রেই তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি একশ বাইশ বছর আয়ুষ্কাল লাভ করেন। তিনি একবার সমকালীন শাসক আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের নামে একটি উপদেশপূর্ণ পত্র লেখেন। যার শেষ বাক্য হলো-

হে আমীরুল মোমেনীন! শারীরিক সুস্থতার কারণে কখনো ধোকায় পতিত হবেন না যে, এখনও আপনার আয়ু অনেক অবশিষ্ট রয়েছে। এ সম্পর্কে আগের লোকেরা যে উপদেশমূলক কথা বলেছেন তা স্মরণ করুন। এ বিষয়ে যে কবিতার পংক্তিটি বলা হয়েছে তার ভাবার্থ হচ্ছে-

'যখন কোনো মানুষের সন্তানের পর সন্তান জন্ম নিতে থাকে এবং পরে বার্ধক্যহেতু এক সময় তার দেহ পুরনো হতে থাকে, উপর্যুপরি সে অসুস্থ হতে থাকে, তখন বুঝে নিতে হবে, এটা হচ্ছে ফসলের এমন এক ক্ষেত, যার ফসল কাটার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে।

আবদুল মালেক বিন মারওয়ান এ চিঠি পড়ে অঝোরে কাঁদতে থাকেন এবং বলেন, একেবারেই ঠিক বলেছেন।

(ইবনুল জাওযী -সেফওয়াতুস সাফওয়া, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৬)

রুবয়ী বিন হেরাশ (র.)-এর সত্যবাদিতা এবং তার বরকত

হযরত রুবয়ী বিন হেরাশ (র.) শৈশব থেকেই সত্যবাদিতা ও পুণ্যশীলতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। জীবনে কখনো তিনি কোনো মিথ্যা বলেননি।

একবার এক আজব ঘটনা ঘটে। তার দুই পুত্র হাজ্জাজ বিন ইউসুফের রোষানলে পতিত হন (হাজ্জাজ এ উম্মতের সবচাইতে বড়ো যালেম বলে প্রসিদ্ধ আছে)। হাজ্জাজের অত্যাচার নির্যাতন সম্পর্কে রুবয়ী বিন হেরাশ (র.)-এর ছেলেরা অবহিত ছিলেন বলে আত্মগোপন করে সময় কাটাচ্ছিলেন। হাজ্জাজকে কেউ একজন বললো, তাদের পিতা কখনো মিথ্যা বলেন না। তাকেই ছেলেদের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। সুতরাং হাজ্জাজ অনতিবিলম্বে রুবয়ী বিন হেরাশ (র.)-এর সমীপে লোক পাঠিয়ে তার ছেলেদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তিনি নির্দ্বিধায় বলেন, হাঁ, তারা তো ঘরেই আছে। সন্তানের জীবন যাচ্ছে, অথচ এমন সংকটময় মুহূর্তেও একটি মিথ্যা শব্দ উচ্চারণ করা তিনি পছন্দ করেননি। এমন একটা কঠিন মুহূর্তে সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কোনো সাধারণ কথা ছিলো না, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার

www.nagorikpathagar.org

সত্যবাদিতাকে সে বরকত দান করেছেন, আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তার প্রতিক্রিয়া এবং বরকতের প্রকাশ ঘটেছে।

হযরত হেরাশ বিন রুবয়ী (র.)-এর বিস্ময়কর সত্যবাদিতা আর সত্য কথনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো নির্দয় প্রাণ মানুষও প্রভাবান্বিত না হয়ে পারেনি। সে রুবয়ী বিন হেরাশ (র.)-কে বললো, আপনার সত্যবাদিতার কারণে আমি আপনার সন্তানদের অপরাধ ক্ষমা করে দিচ্ছি।

(ইবনুল জাওযী- সেফওয়াতুস সাফওয়া, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৯)

হযরত ওয়ায়স করনী (র.)-এর কিছু উপদেশ

হরম বিন হাইয়ান (র.) বলেন, আমি হযরত ওয়ায়স করনী (র.)-কে নিবেদন করলাম, আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন, যখন শয্যা গ্রহণ করো তখন মৃত্যুকে নিজের বালিশ বানাও এবং মৃত্যুকেই নিজের চোখের সামনে রাখো। যখন জাগ্রত হও তখন আল্লাহর দরবারে দোয়া করো যেন তিনি তোমার অন্তকরণ ও নিয়ত পরিচ্ছন্ন করে দেন। কেননা, অন্তকরণ ও নিয়ত সঠিক অবস্থার ওপর কায়েম রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার। অনেক সময় প্রথম দিকে মানুষের অন্তকরণ ও নিয়ত যথার্থ অবস্থার ওপর স্থির থাকে বটে, কিন্তু পরে হঠাৎ করে তা বদলে যায়। অথবা প্রথম দিকে সঠিক অবস্থায় থাকে না, কিন্তু পরে ঠিক হয়ে যায়। কখনো গোনাহের ক্ষুদ্রতার ওপর দৃষ্টিপাত করো না; বরং সে বিশাল সত্তার ওপর দৃষ্টি করো, তুমি যার নাফরমানী করছো। *(ইবনুল জাওযী- সেফওয়াতুস সাফওয়া, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২৯)*

গান বাজনা সম্পর্কে শায়খ তকীউদ্দীন সুবকী (র.)

হযরত শায়খ তকীউদ্দীন সুবকী (র.)-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, সামা (গান)-এর মজলিসে হাযির হওয়া এবং নর্তন কুর্দন করা, গানের প্রভাবে অচেতন হয়ে যাওয়া কেমন। তিনি এ প্রশ্নের জবাব কতগুলো কবিতার পংক্তি দ্বারা প্রদান করেন। নিম্নে কবিতার পংক্তিগুলোর অনুবাদ পেশ করা হলো-

জেনে রাখো, নর্তন কুর্দন, দফ বাজানো এবং গান গাওয়া প্রভৃতি সম্পর্কে তুমি প্রশ্ন করেছো।

এগুলোর বৈধতা সম্পর্কে আমাদের পূর্বেকার এমন সম্মানিত ব্যক্তিরা মতভেদ করেছেন, যারা স্বয়ং ছিলেন হেদায়াতের জীবন্ত ব্যাখ্যা এবং ছিলেন সর্দারদের সর্দার, কিন্তু এ মতবিরোধ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার এমন কোনো শরীয়ত আসেনি, যাতে সামা- গান গাওয়া, শোনা, শুনে নর্তন কুর্দন করে অবচেতন হওয়া মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যারা সামা- গান গাওয়া ও শোনার ফলস্বরূপ নর্তন কুর্দন করা, অবচেতন হওয়া হালাল বলেন, তারা একে সে শ্রেণীভুক্ত বলেন, যেমন অন্যান্য অভ্যাস ও মোবাহ বিষয়সমূহকে হালাল বলা হয়। যারা এর হালাল হওয়ার প্রবক্তা, তারাও একে এবাদত মনে করেন না; বরং অন্যান্য রীতি অভ্যাস এবং মোবাহ বিষয়সমূহের মতোই একটি বৈধ বিষয় মনে করেন। অতএব, যে সামা- গান গাওয়া, শোনা, ফলস্বরূপ নর্তন কুর্দন করা, অবচেতন

www.nagorikpathagar.org

হওয়া এবাদত এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমরূপে অবলম্বন করেছে, তা হলে বুঝে নাও, এটা নিতান্তই একটা আফসোসের বিষয়।

হযরত ইমাম শায়খ তকীউদ্দীন সুবকী (র.) তার কথা স্মরণ রাখার জন্য বলেছেন, কোনো শরীয়ত অথবা তাসাওউফপন্থীদের কোনো ধারাতেই কেউ সামাকে এবাদতের মতো আমলের বিষয় সাব্যস্ত করেননি। তাই শায়খ বা পীর তার মুরীদদের যেভাবে যেকের আযকার এবং এবাদতের প্রশিক্ষণ দান করেন, কাউকে সেভাবে গান গাওয়া বা শোনায় মশগুল হতে বলেননি। কারো থেকে এমন কথা কখনো বর্ণিতও হয়নি। বেশীর থেকে বেশী এতোটুকু বলা যায়, সুফিয়ায়ে কেরামের কেউ কেউ প্রয়োজনে সামান্য গান গাওয়া বা শোনায় মশগুল হওয়া জায়েয বলেছেন।

দোআনা প্রদেশের এক আজব ঘটনা

[কয়েক বছর পূর্বে এ অধম (মুফতী শফী র.) আল মুফতী সাময়িকীর জন্যে তৈরী করা এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এমন সব ঘটনা একত্রিত করি, যে সব ঘটনায় সৃষ্টিজগতের জড় বস্তুসমূহ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত রেসালাতের প্রমাণ প্রকাশ পেয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি 'ফেকরুল আবদিশ শাফী যেকরে সাইয়েদিশ শাফী' নামে আলাদাভাবে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রবন্ধটিও সে ধারার একটি। তাই এ প্রবন্ধটিকে 'যেকরুল আবদিশ শাফী যেকরে সাইয়দিশ শাফী' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধের পরিশিষ্ট বানিয়ে দেয়াই ভালো মনে করেছি। এ ঘটনা জলন্ধর শহর থেকে প্রকাশিত সাময়িকী 'মোসলেমা'র ১২৫২ হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখের সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।]

আগস্ট মাসের কথা। আমার কাছে আমার বোনের মেয়ের একটি চিঠি এসেছে। সে লিখেছে, তার ওখানে এক আজব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সানন্দ চিত্তে আমি সে ঘটনাই এখানে লিপিবদ্ধ করছি। ঘটনাটি হলো, আমার আম্মা জুমার রাতে আকাশে তারকাসমূহের মধ্যে কালেমা লেখা দেখেছেন। এক রাতে এরূপ তারকাসমূহের মধ্যে কালেমা লেখা দেখতে পেয়ে তার কাছেই ঘুমন্ত তার ছোট মেয়ে এবং ভাগিনীকে জাগিয়ে তোলেন। তারাও তার মতোই আকাশে তারকার মধ্যে কালেমা শরীফ লেখা দেখতে পায়। আমার এক আত্মীয় বর্ণনা করেন, রাতের শেষ ভাগে আমি কোনো প্রয়োজনে ঘরের বের হই। আমি আসমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই খুব পরিষ্কার ,অত্যন্ত সুন্দর মোটা অক্ষরে কালেমা লেখা আমার দৃষ্টিগোচর হয়। আমি বিস্মিত হয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তা দেখতে থাকি। এ ঘটনার পর আরও কয়েক জায়গা থেকে এ আলোচনা শোনা গেছে এবং অনেকদিন পর্যন্ত এর চর্চাও সর্বত্র চলতে থাকে। আট নয় বছর পর আজ আমি আমার বোনের মেয়ের চিঠি থেকে এ ঘটনা অবহিত হই। এ ঘটনা শুনে বোনের প্রতি আমার ঈর্ষা হয়। বললাম, আহা, আমারও যদি সে বরকতময় প্রিয় নাম দৃষ্টিগোচর হতো। আল্লাহ তায়ালা যে নামকে কয়েক বারই নিজের নামের সাথে লিখে এরূপ সম্মানিত করেছেন এবং তার এ মোজেযা কয়েক দফাই ইসলাম অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের দেখিয়েছেন যে, স্থানে স্থানে এ পবিত্র নাম বৃক্ষ, পাথর ও

www.nagorikpathagar.org

আসমানে লিখিত দেখতে পাওয়া গেছে এবং হাজার হাজার মানুষ স্বচক্ষে তা দেখেছেন।

দিল্লীতে একটি নতুন কেল্লা নির্মাণের উদ্দেশে সেখান থেকে পাথর বের করা হচ্ছিলো। সে পাথরের একটি টুকরায় কালেমা লেখা বেরিয়ে এসেছে, যা দেখার জন্যে দুর দূরান্ত থেকে মানুষজন আসছিলো। পাথরটি আজও সংরক্ষিত রয়েছে।

যেদিন আমি আমার বোনের মেয়ের চিঠি পাই, সেদিন থেকেই আমি নিয়ম করেছিলাম, রাতে বিছানায় শুয়ে খুবই আগ্রহ সহকারে আসমানের দিকে দেখতাম এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করতাম, ইয়া আল্লাহ, আমাকেও সে কালেমা দেখিয়ে দিন, যার ঢংকা পৃথিবীময় বাজছে এবং বাজতে থাকবে, কিন্তু আমার এ কামনা পূরণ হয়নি (এ সময় বেশ কিছু দিন থেকে আমি দোজানার নবাব সাহেবের মায়ের কাছে অবস্থান করছিলাম)। আমি বিষয়টা একদিন তাঁর সাথেও আলোচনা করি। তিনিও লালিত আশা পূর্ণ হওয়ার জন্যে আমার সাথে দোয়ায় শরীক হতেন। আবার কখনো বলতেন, এ তোমার কোনো খেয়ালের বিভ্রান্তি না তো। আমি নিবেদন করলাম, এ যদি খেয়ালের বিভ্রান্তিই হবে, তবে তো আমি আপনি নিশ্চয়ই তা পূর্ণ করার আগ্রহ নিয়ে রয়েছি, কিন্তু আমাদের আকাংখা তো পূর্ণ হচ্ছে না।

এর কিছুদিন পর আমি আমার বোনের কাছে যাই। আত্মীয় স্বজনদের সাথে সাক্ষাত শেষ করে অবসর হয়ে রাতে ঘুমাতে যাবার সময় আবার এ আলোচনা ওঠে। তখন আমি বোনকে ব্যাপারটা বিস্তারিত জিজ্ঞেস করলাম। যেমন তোমার দেখার সময়টা কখন ছিলো, কিভাবে দেখেছো ইত্যাদি। জিজ্ঞাসার জবাবে সে বললো, এক রাতের কথা, আমার ঘুম আসছিলো না – কিছুটা গরম আর কিছুটা অস্থিরতার কারণে একটু খারাপই লাগছিলো (আমার বোন তখন সন্তানসম্ভবা ছিলো)। জুমার রাতে দুই ঘটিকার কাছাকাছি সময়ে আমি পার্শ্ব পরিবর্তন করে আসমানের প্রতি নযর করতেই দেখি, দুটি তারকা খুব কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে। তন্মধ্যে একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল। কিছুদিন থেকে এটি পূর্ব দিক থেকেই উদিত হচ্ছে। চমকিত তারকাটির আকৃতি কিছুটা আরবী বর্ণমালার প্রথম অক্ষর আলেফের আকৃতির অনুরূপ। বোন আমাকে বলছিলো, এ দুটি তারকা লাম অক্ষর বনে যায়। এর মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর এবং মোটা অক্ষরে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সুস্পষ্ট আমার দৃষ্টিগোচর হয়। এর মধ্যখানে হাজারো চিকন চিকন তারকা এমনভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যেন লেখার চারদিকে স্বর্ণ জরি ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। কালেমার চারদিকে আরও কিছু নাম দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু আমি সেগুলো পরিষ্কার পড়তে পারিনি। আবুদল্লাহ, ওমর, এমন দু-একটি নাম পড়তে পেরেছি। বাকীগুলো পরিষ্কার দেখাচ্ছিলো না। আমি অনেক সময় পর্যন্ত বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে এ দৃশ্য দেখতে থাকি। কাছেই আমার মা, বড় মেয়ে এবং স্বামী নিদ্রামগ্ন ছিলো। মন চাচ্ছিলো তাদেরও জাগিয়ে দৃশ্যটা দেখাই, কিন্তু আমার মুখে কথা আসছিলো না। আকাশে এমন উজ্জ্বল এবং চমক বিস্তৃত ছিলো যে, শুয়ে শুয়ে আল্লাহর কুদরতের সে নির্দশন দেখতে থাকি। এমনকি সোবহে সাদেক হয়ে যায় এবং আকাশ পরিষ্কার হয়ে এ দৃশ্য দৃষ্টির সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। তখন আমার মন খুশীতে

www.nagorikpathagar.org

পূর্ণ ছিলো। কালেমা পড়ে নামাযের জন্য উঠি। সবাই ওঠলে তাদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করি। তার সবাই বললেন, আমাদের ওঠালে না কেন?

এ ঘটনার পর দ্বিতীয় রাত এমনিতেই কেটে যায়। তৃতীয় রাতে আবার দুইটা বাজার কাছাকাছি সময় আসমানের দিকে তাকাতেই দেখি, আজ পুরো কালেমা নেই। অত্যন্ত পরিষ্কার অক্ষরে শুধু 'মোহাম্মদ' লেখা রয়েছে। মনে মনে খেয়াল করলাম, আজ পুরো কালেমা নেই। এ অবস্থায় আকাশে লিখিত 'মোহাম্মদ' শব্দের প্রতি দেখতে দেখতে আমার কিছুটা ঘুমের ভাব আসে। তখন কারো আওয়ায কর্ণগোচর হয়– এ তো কালেমা নয়; বরং 'মোহাম্মদ' নাম। এ কথা খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখবে। আওয়ায শুনে আমি চমকে উঠি। দেখলাম, পাশে কেউ নেই। ভাবলাম; আমার গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কেই কি বলা হয়েছে যে, তার এ নাম রাখবে! নতুবা এ আওয়াযের আর কি রহস্য থাকতে পারে। বিষয়টা আমি আমার স্বামী ব্যতীত আর কারও সাথে আলোচনা করিনি। আমি বিষয়টা মনে কল্পনা করেই চলছিলাম। এভাবে দুচার দিন কেটে যায়। এর পর এক রাতে বড়ো বোনের মেয়েও আসে এবং সে আমার কাছেই শুয়ে ছিলো। এ রাতেও আগের মতো ঘুম আসেনি। রাতের শেষ ভাগে আসমানে কিছু আলো দৃষ্টিগোচর হয়। দেখলাম, আগের মতোই পরিষ্কার অক্ষরে কালেমা লেখা রয়েছে, আমি স্বচক্ষে তা দেখছি। এ ভাবে কিছু সময় পর্যন্ত দেখতে থাকি। এরপর বহু কষ্টে আমার মুখ থেকে কথা বেরোয়। আমি খুব আস্তে আস্তে ছোটো বোনকে ডাকি, কিন্তু তখনও আমার আওয়ায পরিষ্কার বের হচ্ছিলো না। বোনের মেয়ের চোখ খুললে সে বললো, খালা আম্মা কি বলছেন। আপনার কি হয়েছে, পরিষ্কার করে কথা বলতে পারছেন না কেন? তখন খুব কষ্টে তাকে বললাম, আসমানের দিকে দেখো। আসমানের দিকে দৃষ্টি করে সেও কালেমা লেখা দেখতে পায়। আমার বোনের মেয়ে আমার ছোটোকেও জাগিয়ে তোলে। সে ছিলো কিশোরী। আমার কাছেই নিদ্রামগ্ন ছিলো। জেগে ওঠে আমার বোনের মেয়ের সাথে সেও আকাশে কালেমা দেখলো। তারা অন্যদের জাগাতে চাচ্ছিলো, কিন্তু মুখ খুলছিলো না বলে কাউকে জাগাতে পারেনি। এভাবেই তারা দেখতে থাকে, এমনকি ভোর হয়ে যায়। তারা বিস্মিত হচ্ছিলো, এটি কি রহস্য! অবশেষে স্থানীয় এক শিক্ষক, যিনি একজন বড়ো আলেমও ছিলেন– তাকে বলা হলো, স্বপ্নঘোরে নয়; বরং জাগ্রতাবস্থায় সম্পূর্ণ চেতন মনে এ দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ আলেম বললেন, তার উদরে কোনো পুণ্যাত্মা অবস্থান করছে। এক রাতে যে মোহাম্মদ আহমদ নাম বাতলানো হয়েছে, ছেলে হলে এ নাম রাখবে, এ ঘটনায় সম্ভবত সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

এরপর এক আত্মীয় আলেম এবং কারী সাহেব আসেন। তার সাথে ব্যাপারটা আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, তার মস্তিষ্ক যথেষ্ট আলোকিত। তার থেকে কোনো পুণ্যশীল সুসন্তান জন্ম নেবে। এ ঘটনায় সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। এর বিশ দিন কি এক মাস পর এ মহিলার এক ছেলে জন্ম নেয়। নবজাতক খুবই সুশ্রী এবং সুস্থ ছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাকে স্বাভাবিক দীর্ঘায়ু দান করুন। শিশুটির কিছু তৎপরতা ও আচরণের ইংগিতে মনে হয় সে পুণ্যশীল এবং বুদ্ধিমান হবে।

www.nagorikpathagar.org

এ ঘটনা শোনার পর থেকে আমি প্রতি রাতেই তারকা দুটির প্রতি দেখতাম। পরবর্তীতে এ দুটি তারকা সম্পর্কে আলোচনা অন্যদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে। কেননা, এ দুটি তারকা আকাশে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখা যেতো। এশার নামাযের কাছাকাছি সময়ে তারকা দুটি আকাশের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থান করতো এবং শেষ রাতে মধ্যাকাশে এসে যেতো। এর একটি তো অত্যন্ত আলোকিত, রং কিছুটা সবুজ ঘেঁষা দেখা যেতো। অন্যটি অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল এবং রং কিছুটা লালচে মনে হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক বড়ো বড়ো কথা সাধারণ্যে প্রচারিত হতে থাকে। কেউ কেউ এ তারকা দুটোকে বর্তমান যুদ্ধে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) দুই পক্ষ বলে নামকরণ করেছে, যার এক পক্ষের সম্ভাবনা উজ্জ্বল এবং অন্য পক্ষের সম্ভাবনা কম। তারকা দুটি এখনও যথারীতি উদিত হয়। তবে পার্থক্য হলো, আগে খুব কাছাকাছি অবস্থান করতো। এখন একটি থেকে আরেকটি কিছুটা দূরে অবস্থান করছে। শেষ রাতে খুবই উজ্জ্বল দেখায়। কোনো আলেম অথবা জ্যোতিবিদ এ সম্পর্কে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করতে পারেন। আমি যা লিখেছি তাতে কিছুমাত্রও অতিরঞ্জন নেই।

আধুনিক সভ্যতার ধারক বাহকরা নিজেরাই তাদের ওপর বিরক্ত

[বেনারস ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরের বক্তৃতা, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১]

পৃথিবীতে বিদ্যমান সব বিপদ মসিবতের কারণ হচ্ছে আধুনিক সভ্যতা। এ সভ্যতার ভিত্তি বস্তুবাদের ওপর স্থাপিত। যতোদিন পর্যন্ত আমরা নিজেদের ইহজাগতিক বিধান প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর স্থাপন না করবো, ততোদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। এ কথা বেনারস ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর স্যার রাধাকৃষ্ণের। আজ সন্ধ্যায় স্পীড ল' হলে 'বর্তমান পৃথিবীর সমস্যা'– নির্ধারিত বিষয়ের ওপর বক্তৃতাকালে তিনি একথা বলেছেন। এ সভা 'নেগ ইন্ডিয়া লীগে'র ব্যবস্থাপনায় রাজা জীরোনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান বক্তা স্যার রাধাকৃষ্ণ বর্তমান যুদ্ধ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, এ যুদ্ধ সত্য মিথ্যার মধ্যকার যুদ্ধ, কিন্তু এ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন মনে করা মহা ভুল হবে। যুদ্ধে হিটলার অথবা ইংরেজ– যে পক্ষই বিজয়ী হোক, পরাজিত পক্ষ বিজয়ীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবে। ফলে চলমান যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আরেকটি ভীষণ যুদ্ধ হবে। বর্তমান সভ্যতা বস্তুবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এটাই সর্বপ্রকার অনিষ্টের মূল। যতোদিন আমরা আধ্যাত্মিকতার ওপর ভিত্তিশীল কোনো বিধান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো না, ততোদিন পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে না। যতোদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উচ্চ নীচ অবশিষ্ট থাকবে, ততোদিন চলমান সব ঝগড়াঝাটির অবসান হবার নয়।

(সংবাদপত্র ওয়াহদাত– দিল্লী, ২ মার্চ, ১৯৪১ ইং)

www.nagorikpathagar.org

হযরত যুল বাজাদাইন (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

[রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দিকে একবার তাকানো– পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যকার সব বস্তু সামগ্রী থেকে উত্তম।]

হযরত যুল বাজাদাইন (রা.)-এর নাম আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাম। তিনি সে সব সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, যারা সারওয়ারে কায়েনাত, সৃষ্টি জগতের গর্ব অহংকার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখে নিজের চক্ষু শীতল করেছেন। তিনি ছিলেন পিতৃহীন। জীবন ধারণের কোনো ব্যবস্থা তার ছিলো না। চাচার কাছেই লালিত পালিত হন। জ্ঞান বুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার পর সুস্থ প্রবৃত্তি তাকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী উৎসুক করে তোলে, কিন্তু চাচার ভয়ে তিনি অস্থির ছিলেন। কিভাবে ইসলামের প্রতি স্বীয় আগ্রহ ঔৎসুকোর কথা প্রকাশ করবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে একদিন অনাদি সৌভাগ্যের আগ্রহ বিজয়ী হয়। নির্ভয়ে চাচার কাছে নিবেদন করলেন, আমি ইসলামকে সত্য জীবন বিধান বলে মনে করি। অতএব, আমি ইসলাম কবুল করতে যাচ্ছি। চাচা নানাভাবে তাকে ভয়ভীতি দেখান। বললেন, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করো তা হলে আমি তোমাকে যা কিছু দিয়েছিলাম তা সবই কেড়ে নেবো, কিন্তু সাধারণ কথায় এ নেশা তো কমার নয়। তিনি হেসে ওঠে বললেন, চাচা–

আল্লাহ্‌র কসম, মাত্র একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সমগ্র জগত এবং জগতের সব সহায় সম্পদ, বস্তু সামগ্রী থেকে আমার কাছে উত্তম।

চাচা তার এ ধরনের দৃঢ়তা সত্ত্বেও তার পরনের কাপড়খানা পর্যন্ত খুলে রেখে দেয়। তার মা অতিকষ্টে আবরণীয় অংগ ঢাকার জন্যে একখানা চাদর যোগাড় করে দেন। মায়ের দেয়া চাদরখানা দুই টুকরা করে এক টুকরা দিয়ে লুংগি এবং এক টুকরা দিয়ে চাদর বানান। এর পর রিক্ত নিস্ব অবস্থায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে মুসলমানদের জামাতে শামিল হন। *(আল মাদহাশ ইবনুল জাওযী, পৃষ্ঠা ১৭৬)*

দুই কাপড়ের কারণে তার নাম যুল বাজাদাইন প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। আমাদের খাজা (আযিযুল হাসান মাজযুব) সাহেব খুবই উত্তম বলেছেন–

একদিকে আমার আঁচল টুকরা টুকরা, অন্য দিকে জামার বুকের অংশ ছিন্ন ভিন্ন, কিন্তু এ ছেঁড়া ফাটা অবস্থায়ও আমি ছিলাম ফুলের মতো হাসিমুখ। সর্বদিক থেকে নিস্বার্থ হয়ে যখন তার স্মরণে বসলাম, তখন নিজের চাটাইও আমার কাছে সোলায়মান আলাইহিস সালামের সিংহাসনের মতো মনে হলো।

এ ধরনের প্রেমিকদের সম্পর্কে কবি কতই না সুন্দর বলেছেন –

তোমার প্রেম ভালবাসায় আমি যে কষ্ট বরণ করেছি, লায়লীর প্রেমিক মজনুও তার প্রেমে সে কষ্ট বরণ করেনি।

তবে আমি মজনু (কায়স)-এর মত জংলী জীবজন্তুর পেছনে দৌড়াইনি, কারণ পাগলামিরও বিবিধ প্রকার রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

কুদরতের এক বিস্ময়কর নিদর্শন

কোরআন মজীদে পূর্ববর্তী কাফের সম্প্রদায়সমূহের ছয় ব্যক্তির নাম আলোচিত হয়েছে। এরা হলো–

আবর, জালুত, ফেরআউন, হামান, কারূন ও সামেরী।

শেষোক্ত সামেরীর নাম মূসা বিন যাফর। এ ব্যক্তি হযরত মূসা আলাইহেস সালামের সমসাময়িক এবং তার আত্মীয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতিপালন ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালার এক নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ কৌশল এবং পরিপূর্ণ কুদরতেরই নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা তাকে শত্রুদের ঘরে শত্রুদের কোলেই প্রতিপালন করিয়েছেন। অনুরূপ মূসা বিন যফর সামেরীর প্রতিপালনও অতি প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে। সে যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন ফেরআউনের নীতি অনুসারে তাকে যবাই করে দেয়া অত্যাবশ্যক ছিলো। তার মা ভাবলো, চোখের সামনে নিজের সন্তানের যবাই হওয়ার দৃশ্য দেখবো না। সুতরাং এ ভেবে সামেরীর মা তাকে পাহাড়ের এক গুহায় লুকিয়ে তার ওপরে পাথর চাপা দিয়ে রাখে। সন্তানের জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে স্নেহপরায়ণ মা নিজের দুর্বল সন্তানকে স্বহস্তে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করেছে। তবে দুর্বল অসহায়ের মালিক, আশ্রয়হীনদের আশ্রয় মহান আল্লাহ তায়ালা এ দুর্বল অসহায় মানব সন্তানকে নিজের বিশেষ প্রতিপালন ব্যবস্থাধীনে লালন পালন করেন।

আল্লাহ তায়ালা গর্ভে রাখা সামেরীর খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা করতে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে আদেশ করেন। এ আদেশ মোতাবেক হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম শিশু সামেরীর হাতের এক আংগুলে দুধ, এক আংগুলে মধু এবং এক আংগুলে ঘি মেখে তাকে আংগুলগুলো চাটতে দিতেন। এভাবেই আল্লাহ তায়ালার কুদরতী ব্যবস্থাপনায় লা-ওয়ারিস শিশু সামেরী পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় প্রতিপালিত হতে থাকে। এক সময় সে হাঁটতে চলতে শুরু করে। এখন আল্লাহ্‌র কুদরতের কারিশমা দেখুন। একই সময় দুই মূসা জন্ম নেয়। উভয়ের প্রতিপালনই অতি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। একজন ফেরআউনের মতো কাফের বাদশার ঘরে প্রতিপালিত হয়, আর দ্বিতীয় মূসা হযরত জিবরাঈল আলাইহেস সালামের মতো পবিত্র সত্তার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়, কিন্তু যিনি ফেরআউনের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছেন তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালার এক সম্মানিত রসূল। পক্ষান্তরে যে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের হাতে প্রতিপালিত হয়, সে হলো কাফের মোনাফেক।

একজন আরব কবি এ বিস্ময়কর ঘটনাটি নিম্নের পংক্তিতে প্রকাশ করেছেন–

'কোনো মানব সন্তান যদি তার প্রথম সৃষ্টিতেই সৌভাগ্যবান হয়ে জন্ম নেয়
তাহলে তার প্রতিপালনকারীদের জ্ঞান বিবেক হয়রান হয়ে যায়।
যারা তার ওপর আশা রাখে তারা বঞ্চিত হয়।'

অতএব, যে মূসাকে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম প্রতিপালন করলেন সে হলো কাফের, আর যে মূসাকে ফেরআউন প্রতিপালন করলো তিনি হলেন রসূল।

(নজীবুল মুসলেমীন বেকালামে রাব্বিল আলামীন– পৃষ্ঠা ১৬৭)

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন পর্যায়ে রূহ ও দেহের সম্পর্ক

রূহ ও দেহের সম্পর্কের বিষয়টা আলেম এবং সর্বসাধারণ মানুষ– উভয় শ্রেণীতেই একটা আলোচ্য বিষয় এবং এ আলোচনা সময়ের দাবীও বটে। কবরের আযাব ও সওয়াব কি শুধু রূহের ওপর হবে– নাকি দেহের ওপর হবে, না উভয়ের ওপর হবে– যদি দেহের ওপর আযাব হয় তা হলে দেহ বিলীন হয়ে যাওয়ার পর তার ধরন কি হবে– এ প্রশ্নের সমাধানের ওপরই রূহ ও দেহের সম্পর্কের বিষয়টার সমাধান নির্ভর করে।

হাফেযে হাদীস আল্লামা ইবনে কাইয়েম জাওযী (র.) 'কিতাবুর রূহ' গ্রন্থে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত, আস্বস্তিকর এবং বিজ্ঞোচিত আলোচনা করেছেন। এখানে হযরত ইবনে কাইয়েম (র.)-এর সে বিজ্ঞোচিত আলোচনার কিছু জরুরী অংশ লিখিত হচ্ছে।

রূহ আর দেহের সম্পর্ক মানব জীবনের বিভিন্নকালে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। মানব জীবনে মোট পাঁচটি সময় আসে।

১. মানব শিশু যখন মায়ের পেটে থাকে তখন তার মাঝে রূহ দেয়া হয়, ২. যখন সে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, তখন মা বাবাসহ অন্যদের আদর স্নেহে লালিত পালিত হয়, ৩. নিদ্রাবস্থায় দেহের সাথে রূহের এক ধরনের সাময়িক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়, তবে নিদ্রাজনিত কারণে রূহ ও দেহের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হলেও একটা শক্তিশালী সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, ৪। মৃত্যুর পর কবর জগতে রূহ ও দেহের বিচ্ছিন্নতা ঘটে, তবে সার্বিক বিচ্ছিন্নতা ঘটে না; বরং মৃত্যুর পর কবর জগতেও সর্বদাই রূহ এবং দেহের এক ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। তাই বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী কেউ কবরের কাছে গিয়ে কবরবাসীকে সালাম দিলে তার রূহ দেহে প্রত্যবর্তন করে। যদিও রূহের এ প্রত্যাবর্তনে পূর্ণ জীবন লাভ হয় না। ৫। আখেরী জগতে রূহ ও দেহের সম্পর্ক। এ সময়ের সম্পর্ক মানব জীবনের অন্য চারটি কালের চাইতে সবল সম্পর্ক হবে। কেননা, এ সময় রূহ ও দেহের সম্পর্কের মাঝে মৃত্যু, নিদ্রা বা অন্য কোনো সমস্যাই প্রতিবন্ধক হবে না।

সারকথা হচ্ছে, মানব জীবনের এ পাঁচ সময়ে তার রূহ ও দেহের সম্পর্কের বিভিন্ন ধরন ও পর্যায় থাকে। কোথাও এ সম্পর্ক দুর্বল, কোথাও সবল এবং কোথাও একটু বেশী সবল থাকে। মানুষের বসবাস এবং অবস্থানস্থলও তিনটি। তার একটি পার্থিব জগত– যে জগতে আমরা বর্তমানে অবস্থান করছি। রূহ ও দেহের সম্পর্কের প্রাথমিক তিনটি পর্যায় এখানেই অতিবাহিত হয়। এর পর কবর জগত, তার পর আখেরী জগত। এ দুজগতে রূহ ও দেহের বিধান এবং অবস্থান বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কিছু কিছু অবস্থায় এ বিধানের সম্পর্ক হয় দেহের সাথে, এ অবস্থায় রূহ থাকে দেহের অধীন। আর এর বিপরীতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে জন্মগত এবং সন্তাগতভাবে কাজকর্ম ও আচার আচরণের সম্পর্ক রূহের সাথে হয়, এ অবস্থায় দেহ থাকে রূহের অধীন, আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে রূহ এবং দেহের অবস্থা একই রকম থাকে।

www.nagorikpathagar.org

এ আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে, পার্থিব জগতে সব বিধিবিধান পালনের বাধ্যবাধকতা, কষ্টক্লেশ, আরাম আয়েশ, শাস্তি পুরস্কার ইত্যাদির সম্পর্ক হচ্ছে মূলগতভাবে দেহের সাথে এবং এসব ক্ষেত্রে রূহ দেহের অধীন। এ কারণেই পর্থিব জগতে শরীয়তের যাবতীয় বিধি বিধানের সম্পর্ক হচ্ছে দেহ এবং দেহের অংগ প্রত্যংগের নড়াচড়ার সাথে। যদিও তার অন্তরে প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত কিছু থাকে। তাই ইসলামী বিধানের মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদানকারীকে পার্থিব বিধানে মুসলমানই সাব্যস্ত করা হয়। যদিও তার অন্তরে কুফুর লুকায়িত থাকে। তদুপরি কাফের অপরাধীর ওপর যে শাস্তি প্রয়োগ করা হয় তাও সরাসরি দেহের ওপরই পতিত হয়। এ ক্ষেত্রে দেহের অধীনস্থ হিসাবে রূহ এ শাস্তির কষ্ট ভোগ করে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইসলামী বিধানের সম্পর্ক দেহের সাথে। এসব ক্ষেত্রে রূহ দেহের অধীন। উপাদেয় খাদ্য পানীয়, দৃষ্টিনন্দন পোশাক, ঘরবাড়ী ইত্যাদির আরামও দেহই আস্বাদন করে এবং দেহের মাধ্যমেই রূহ তা আস্বাদন করে।

মোট কথা, পার্থিব যাবতীয় কাজ এবং বিধান সম্পর্কে একেক করে গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা ভাবনা করলে প্রতিটির সরাসরি সম্পর্ক দেহের সাথেই প্রতিভাত হবে এবং দেহের মাধ্যমেই রূহের ওপর তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া সংক্রমিত হবে, কিন্তু কবর জগতের ব্যাপারটি পার্থিব জগতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে যাবতীয় বিধান, আচার আচরণ, শাস্তি পুরস্কার এবং আযাব ও সওয়াবের সম্পর্ক সরাসরি রূহের সাথে। এখানে দেহ হচ্ছে রূহের অধীন। পার্থিব জগতে দেহ যেমন প্রকাশ্য এবং রূহ তাতে লুকায়িত ছিলো, আর দেহ রূহের জন্যে কবরের স্থলভিষিক্ত ছিলো, যাবতীয় কষ্টক্লেশ, আরাম আয়েশ, রোগব্যাধি ইত্যাদি দেহের ওপর আপতিত হতো এবং রূহ দেহের অধীনস্থ হিসাবে কষ্টক্লেশ, আরাম আয়েশ, রোগ্যব্যাধি দ্বারা প্রভাবান্বিত হতো, অনুরূপ কবর জগতে রূহ থাকে প্রকাশ্য এবং দেহ থাকে আচ্ছাদিত, তাই কবর জগতের যাবতীয় আযাব ও সওয়াব এবং কোমলতা ও কঠোরতা সরাসরি রূহের ওপরই আপতিত হয়। যতোক্ষণ পর্যন্ত দেহ অস্তিত্বশীল থাকে, ততোক্ষণ দেহ ও রূহের মাধ্যমে আসল সওয়াব, কোমলতা কঠোরতা ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। পার্থিব জগতে যেমন দেহের প্রভাব প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়, রূহের প্রভাব প্রতিক্রিয়া সরাসরি কোনো মাধ্যম ব্যতীত জানা যায় না, অনুরূপ কবর জগতে দেহের প্রভাব প্রতিক্রিয়াও দৃষ্টিগোচর হয় না। রূহের প্রভাব প্রতিক্রিয়াও এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ওপরই প্রকাশ পেতে পারে, যে রূহ প্রত্যক্ষ করে। অবশ্য কিছু কিছু সময় রূহের আযাব ও সওয়াব এতোটা শক্তিশালী হয় যে, তখন তা দেহের ওপরও প্রকাশিত হয়। কবর জগতের অসংখ্য ঘটনা এবং প্রত্যক্ষ দর্শন একথার সাক্ষ্য বহন করে।

কবরে কোনো কোনো লাশের ওপর সাপ বিচ্ছু লেপ্টানো দেখতে পাওয়া গেছে। কোনো কোনো কবরে আগুন দেখা গেছে। কোনো কোনো কবরবাসীকে শৃংখলবদ্ধ দেখা গেছে। এরূপ অসংখ্য অগণিত ঘটনা রয়েছে, যা নিতান্ত শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে বিভিন্ন যুগের ইতিহাস গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে। কিতাবুর রূহ, শরহুস

www.nagorikpathagar.org

সুদূর, ইমাম কুরতুবী (র.) প্রণীত 'তাযকেরা' ইত্যাদি গ্রন্থে কবর আযাবের বর্ণিত রূপ ঘটনাবলী নির্ভরযোগ্য সূত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মোট কথা, কখনও কখনও রূহের আযাব ও সওয়াবের প্রভাব প্রতিক্রিয়া দেহেও অনুভূত হয়, কিন্তু রূহের ওপর শান্তির প্রভাব প্রতিক্রিয়া দেহে অনুভূত হওয়া জরুরী নয়। এর এক উদাহরণ আল্লাহ তায়ালা আমাদের পার্থিব জগতেও দেখিয়ে দিয়েছেন। তা হচ্ছে, স্বপ্নজগতে স্বপ্নদ্রষ্টা নানাবিধ আযাব, কষ্ট এবং আরাম আয়েশের স্বাদ আস্বাদন করে, স্বপ্ন দেখাবস্থায় স্বপ্নদ্রষ্টা নড়াচড়া করে, কিন্তু সাধারণত দেহের ওপর এর কোনো প্রভাব প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় না। আবার কখনও কখনও প্রকাশ পেয়েও যায়। যেমন স্বপ্নে কোনো কষ্ট মসিবত দেখে স্বপ্নদ্রষ্টা কাঁদতে কিংবা চীৎকার শুরু করে দেয়। কখনও ঘুম থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যায়। কখনও হাঁটতে চলতে শুরু করে। অবশ্য দেহের ওপর এর প্রভাব প্রকাশ পাওয়া জরুরী নয়। কখনও প্রকাশ পায় আবার কখনও পায়ও না। অনুরূপ কখনও কখনও একই বিছানায় দুব্যক্তি শায়িত থাকে। তাদের একজন স্বপ্নে কষ্ট মসিবত দেখে ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং নিজের দেহের ওপরও স্বপ্নে দেখা কষ্ট মসিবতের প্রভাব প্রতিক্রিয়া অনুভব করে। আবার আরেকজন স্বপ্নে আরাম আয়েশের ব্যাপার দেখে জাগ্রত হয় এবং সে নিজের দেহেও এ আরাম আয়েশের প্রভাব প্রতিক্রিয়া অনুভব করে, কিন্তু একই শয্যায় শায়িত দুব্যক্তির একজন অন্য জনের অবস্থা সম্পর্কে মোটেই অবগত হয় না।

সারকথা হচ্ছে, কবর জগতে রূহ আসল এবং দেহ তার অধীন এবং আখেরী জগতে উভয়ের অবস্থা একই রকম। সরাসরি রূহ এবং দেহ উভয়ের ওপরই আযাব ও সওয়াব জারি হবে। এ কারণে আখেরী জগতে দেহকে বিলীন হতে দেয়া হবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

'যখন জাহান্নামীদের গাত্রচর্ম জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে, তখন আমি তাদের গাত্রচর্ম বদলে দেবো, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে।' *(সূরা নেসা, আয়াত ৫৬)*

হাফেয ইবনে কাইয়েম (র.)-এর এ আলোচনার পর কবর আযাব সম্পর্কিত অধিকাংশ সন্দেহ সংশয় এবং প্রশ্নের এমনিই অবসান হয়ে যায়।

আগের ও পরের যুগের ওলামায়ে কেরামের এলেমের পার্থক্য

অষ্টম শতাব্দী হিজরীর হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম হযরত আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (র.) এ শিরোনামের ওপর 'ফযলু এলমিস সলফ আলাল খালফ' নামক একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করে এ উম্মতের ওলামায়ে কেরাম এলেমের রূহের পথনির্দেশ করেছেন। বিশেষ করে যে বিষয়ে উদাসীনতা অমনোযোগিতার কারণে অনেক এলেমের অধিকারীও এলেমের নূর এবং বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এখানে হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলীর পুস্তিকার গুরুত্বপূর্ণ অংশের অনুবাদ পেশ করা হচ্ছে। এর বৃহদাংশ হচ্ছে এলেম হাসিলে নিয়োজিত হওয়ার পন্থা এবং এলমী মাসয়ালাসমূহ অনুসন্ধান সম্বলিত পর্যালোচনা। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম,

www.nagorikpathagar.org

ফোকাহায়ে কেরাম এবং মোতাকাল্লেমীনদের (কালাম শাস্ত্রবিদ) প্রয়োজনবশত যে কোনো মাসায়ালা পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান এবং তার সূক্ষ্মতা নির্ধারণে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। এ জন্য তাদের লম্বা চওড়া আলোচনা পর্যালোচনাও করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে তারা একান্ত বাধ্য হয়েই এসব করেছেন, কিন্তু তাদের বর্ণিত কর্মপন্থায় পরবর্তীরা মাঝে মাঝে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। তারা পূর্ববর্তীদের কর্মপন্থার অনুসরণে ঝগড়াঝাটি, আলোচনা পর্যালোচনা এবং তর্ক বিতর্কের নামই এলেম রেখেছেন। তাদের দৃষ্টিতে সে লোকই বড়ো আলেম সাব্যস্ত হয়ে গেছে, যে বিরোধপূর্ণ মাসায়ালায় লম্বা চওড়া বক্তৃতা এবং চটকদার শব্দসমূহ বলে বলে জনসমাবেশকে অভিভূত করতে পারে।

এ কর্মপদ্ধতি এমন এক কঠিন বিভ্রান্তি, যাতে নিমগ্ন থেকে যে এলমী মাপকাঠি স্থাপন করা যায়, তাতে উম্মতের সবচাইতে বড় আলেম শ্রেণী সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীরাও পুরোপুরি উত্তীর্ণ হন না। হযরত আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (র.) তার পুস্তিকায় সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী লোকেরা যে লম্বা চওড়া আলোচনা পর্যালোচনা এবং তর্ক বিতর্কে পড়েননি, এটা তাদের অক্ষমতা বা অজ্ঞতার কারণে নয়; বরং এ পদ্ধতিকে তারা নিরর্থক, ক্ষতিকর এবং পথের প্রতিবন্ধকতা ভেবেই পরিহার করেছেন। ইমাম ইবনে সিরীন (র.) যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট শব্দে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কেরাম যে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টিতে নিরর্থক, ক্ষতিকর এবং লক্ষ্য পথের প্রতিবন্ধক কর্মপদ্ধতিতে জড়িয়েছেন, এটা তাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার প্রমাণবাহী নয়; বরং তাদের মর্যাদার ভিত্তিতে তাদের গৃহীত কর্মপদ্ধতির একটা সদব্যাখ্যামাত্র। আর সে সদব্যাখ্যা হচ্ছে, যুগের প্রয়োজন তাদের পূর্ববর্তীদের বিপরীত কর্মপদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের এলেম এবং এলেম হাসিলের পন্থা পদ্ধতিতে পূর্ববর্তীদের পদ্ধতিই ছিলো প্রধান। পরবর্তীদের কেউ যদি নিষ্প্রয়োজনে অথবা প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে ঝগড়াঝাটি, তর্ক বিতর্কের এ পদ্ধতিকেই নিজের কর্মপন্থা বানিয়ে নেয়, তবে সেটা কারো কাছেই প্রশংসিত নয়। এ সম্পর্কে হযরত আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলীর উক্তি একেবারেই যথার্থ। তিনি বলেন–

তাদের (পরবর্তীদের) এলেমের নামে শুধু আলোচনা পর্যালোচনা আর তর্ক বিতর্কই থেকে যায়। যা তাদের মাঝে মাঝে উপকারী এলেমের প্রতি অমনোযোগী করে তোলে।

পরবর্তী মনীষীদের কারো কারো উক্তি –

'আল্লাহ তায়ালা কোনো বান্দার কল্যাণ চাইলে তার জন্যে আমলের দরজা খুলে দেন এবং ঝগড়াঝাটি ও মতবিরোধের দরজা তার জন্যে বন্ধ করে দেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা কারো অমংগল চাইলে তার জন্যে আমলের দরজা বন্ধ করে ঝগড়াঝাটি ও মতবিরোধের দরজা খুলে দেন।'

হযরত ইমাম মালেক (র.) বলেন, মদীনায় যেসব মনীষীকে পেয়েছি, তারা কোনো মাসয়ালা নিয়ে তর্ক বিতর্ক, লম্বা চওড়া আলোচনা এবং আলোচ্য বিষয়ের

www.nagorikpathagar.org

সূক্ষ্মতা উদঘাটনের অযথা চেষ্টাকে মাকরূহ মনে করতেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে একজন বললেন, সুন্নতের অনুসারী একজন আলেম যদি কোনো বিষয়ের ভুল মর্মার্থ বর্ণনাকারীর মতের খন্ডন করে সুন্নতের সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেন তবে তাতে ক্ষতি কি? জবাবে ইমাম মালেক (র.) বললেন, এ ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি এবং সূক্ষ্মতা উদঘাটন পদ্ধতি গ্রহণ করা অনুচিত। এ ক্ষেত্রেও হাদীসের মর্ম বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হতে হবে। যদি সে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে তবে ভালো, অন্যথায় বক্তাকে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। বেশী আলোচনায় কখনো জড়াতে যাবে না। তিনি আরও বলেন, এলমী বিষয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত আলোচনা পর্যালোচনা, ঝগড়াঝাটি এলেমের নূর বিলীন করে দেয়। এতে অন্তর কঠোর হয়ে যায় এবং পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, ঈর্ষা বিদ্বেষ জন্ম নেয়।

হযরত হাসান বসরী (র.) এক দল মানুষকে কিছু এলমী বিষয়ে আলোচনা ও তর্কবিতর্কে নিরত দেখতে পেয়ে বললেন–

'এবাদত থেকে এ সব লোকের মন ওঠে গেছে এবং কথা বানানো তাদের জন্যে সহজ হয়ে গেছে, তাদের তাকওয়া কমে গেছে। অতএব, কথা বানানোকেই তারা নিজেদের কাজ বানিয়ে নিয়েছে।'

হযরত ইমাম মোহাম্মদ বিন সিরীন (র.) তাবেয়ীদের মধ্যে একজন নেতৃপর্যায়ের লোক ছিলেন। একদিন এক লোক তার কাছে এসে কিছু মাসয়ালা নিয়ে আলোচনা শুরু করে। ইমাম সাহেব লোকটির কথাবার্তার ভংগিতে বুঝে ফেলেন, মাসয়ালা জানা তার উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য নিছক আলোচনা আর তর্ক বিতর্ক করা। এটা বুঝে তিনি সে লোককে বললেন–

'যদি আমি নিছক আলোচনা আর তর্ক বিতর্কই করতে চাই, তবে আলহামদু লিল্লাহ, তোমার চাইতে সে পদ্ধতি আমার ভালো জানা আছে, কিন্তু আমি তর্কে বিতর্কে জড়াতে চাই না।'

হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) বলেন, আমি কখনও কোনো এলমী মাসয়ালায় মুখোমুখি তর্ক বিতর্ক ও আলোচনায় জড়াইনি।

হযরত জাফর বিন মোহাম্মদ (র.) বলেন–

'দ্বীনী বিষয়ে ঝগড়াঝাটি থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, তা অন্তরকে আল্লাহর যেকের থেকে গাফেল করে দেয় এবং মোনাফেকী সৃষ্টি করে।'

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.) বলেন– 'পূর্ববর্তী ওলামারা যে তর্ক বিতর্ক থেকে বেঁচে থাকতেন, এটা এলেমের কারণেই– কোনো এলমী অক্ষমতা অজ্ঞতার কারণে নয়। পরিপূর্ণ দূরদর্শিতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার ভিত্তিতে তারা মানুষকে তর্কবিতর্ক থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। যদি তারা তর্কবিতর্ক করতে চাইতেন, তবে এ বিষয়ে তারা যথেষ্ট সক্ষম ছিলেন।'

এ হচ্ছে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (র.) পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের এলেম এবং বাচনভংগি সম্পর্কে যা লিখেছেন তার সারমর্ম। এর পর তিনি পরবর্তী লোকদের ভ্রান্তি, কোনো বিষয়ে তাদের সূক্ষ্মতা উদঘাটন এবং কথা বানানো সম্পর্কে লেখেন–

www.nagorikpathagar.org

পরবর্তী সময়ে অনেকে এ বিভ্রান্তিতে নিপতিত রয়েছেন। তাদের ধারণা, কোনো বিষয়ে যার আলোচনা দীর্ঘ ঝগড়াঝাটি এবং বেশী মতবিরোধপূর্ণ হয়, তাদের দৃষ্টিতে সেই বড় আলেম সেসব লোকের চাইতে– যারা এ কর্মপদ্ধতির ওপর চলতে অভ্যস্ত নন। আর এ হচ্ছে নির্ভেজাল একটা মূর্খতা।

এখন যদি আপনারা সাহাবী এবং সম্মানিত পূর্বসূরি সিদ্দীকে আকবর, ফারুকে আযম, আলী মোরতাযা, মোয়ায বিন জাবাল, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, যায়দ বিন সাবেত (রা.) প্রমুখ শীর্ষ সাহাবীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তা হলে দেখতে পাবেন, তাদের সকলের কথাবার্তাই কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর তুলনায় কম এবং সংক্ষিপ্ত। অথচ সমগ্র ইসলাম জগত এ ব্যাপারে একমত, তারা সবাই হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর চাইতে আরো বড়ো আলেম ছিলেন। অনুরূপ তাবেয়ীনের চাইতে তাবে' তাবেয়ীনের কথাবার্তা, আলোচনা বেশী লম্বা চওড়া। অথচ তাবেয়ীরা তাবে তাবেয়ীনের চাইতে বড়ো আলেম এবং তাদের ওস্তাদ ছিলেন। এতে বুঝা গেলো, মনোজ্ঞ বক্তৃতা এবং অত্যধিক বর্ণনা বা আলোচনার নাম এলেম নয়; বরং এলেম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার এক নূর, যা মোমেনের অন্তরে প্রক্ষিপ্ত হয়। এতে তাদের সত্য অসত্য এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির মাঝে পার্থক্য করার শক্তি অর্জিত হয়। স্বয়ং রেসালাত ও নবুওয়তের কথাবার্তা, বাচনভংগির বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, 'আমাকে সংক্ষিপ্ত এবং অল্প কথায় বেশী মর্মার্থ প্রকাশ করার বাণী দান করা হয়েছে।'

আলোচনা থেকে বুঝা গেলো, বর্তমানকালে অনেক সাধারণ মানুষ শুধু নয়; বরং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বও যে লম্বা চওড়া আলোচনা এবং তর্ক বিতর্কে বিজয়ীদের বড়ো আলেম মনে করেন, এটা নিছক মূর্খতা এবং আমাদের পূর্বসূরীদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার কুফল। সাহাবায়ে কেরামের পর আয়েম্মায়ে দ্বীন যেমন হযরত সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আওযায়ী, লায়স বিন সা'দ, আবদুল্লাহ বিন মোবারক এবং তাদের সমপর্যায়ের সম্মানিতদের দেখুন, তাদের উক্তি, কথাবার্তা এবং আলোচনা তাদের পরবর্তীদের চাইতে কম। অথচ তারাই পরবর্তীকালে উম্মতের শিক্ষকের মর্যাদায় সমাসীন হয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা এমন এক যুগে রয়েছো যে যুগে আলোচক বক্তা কম, কিন্তু হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করেন এমন লোকের সংখ্যা বেশী। অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যখন বক্তা আলোচক বেশী হবে এবং অনুধাবন করা হৃদয়ংগমকারীর সংখ্যা হবে কম।

কল্যাণকর এলেম

ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কল্যাণকর এলেম তাই যা পূর্ববর্তীদের কাছে ছিলো। অতএব, কোরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দলীল প্রমাণ আত্মস্থকরণ, সে সবের মর্মার্থ নির্ধারণে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের উক্তির সাথে যুক্ত থেকে তদনুযায়ী তারা যে এলেম হাসিল করেছেন এবং নিষ্ঠার সাথে যেভাবে

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করেছেন, তার সাথে একাত্ম হওয়া। এরই অত্যাবশ্যক পরিণতি হচ্ছে, এলেমের প্রকৃত ফল আল্লাহভীতি অর্জিত হবে। যার প্রতি কোরআনের এ আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'আলেমরাই আল্লাহ তায়ালাকে বেশী ভয় করে।' *(সূরা ফাতের, আয়াত ২৮)*

তাই কোনো কোনো পূর্বসূরি আলেম বলেছেন, যে আল্লাহকে ভয় করে সে-ই হচ্ছে প্রকৃত আলেম। আর যে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করে সে হচ্ছে জাহেল। আমি যে 'ফযলু এলমিস সলফ আলাল খালফ' পুস্তিকার এক বিশেষ অংশের সংক্ষেপায়ণ করতে চেয়েছি, এ হচ্ছে তার সর্বশেষ আলোচনা। আমরা আল্লাহর কাছে কল্যাণকর এলেম প্রার্থনা করছি এবং অকল্যাণকর এলেম, আল্লাহর ভয়শূন্য অন্তর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

দৃঢ় এলেমের অধিকারী কারা

(দারুল উলূম দেওবন্দের সদর মোহতামেম শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর হযরত আল্লামা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (র.)-এর বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত।)

১৩৬০ হিজরী সনের ১৫ রবিউল আউয়াল মাসে দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষা জীবন শেষ করে মোহাম্মদ আতা হেরাতীর দস্তারবন্দী উৎসব উপলক্ষে দারুল উলূম দেওবন্দের মসজিদে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় হযরত মাওলানা ওসমানী (র.) প্রকৃত এলেমের প্রতি শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশে বলেন, কোরআন মজীদে রাসেখীন ফিল এলম– দৃঢ় এলেমের অধিকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে, কিন্তু আমি এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআন ও হাদীসের ভাষায় রাসেখীন ফিল এলম– দৃঢ় এলেমের অধিকারী কাকে বলে এবং এর নির্ধারিত পরিমাণ ও মাপকাঠি কি– তা নিয়ে ভাবনায় ছিলাম।

আল হামদু লিল্লাহ, রসূলের একটি হাদীস এ প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এ প্রশ্নই করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন–

যে ব্যক্তি কসম–ওয়াদা অংগীকার পূর্ণ করে, যে কথায় সত্যবাদী হয়, যার অন্তর যথার্থ সরল সঠিক পথে থাকে, যার উদর ও লজ্জাস্থান পবিত্র– তাকওয়ার ওপর কায়েম থাকে, ক্ষুধা এবং প্রবৃত্তির চাহিদা নিবারণে যা কোনো না-জায়েয পন্থার শরণাপন্ন হয় না, এমন লোকেরাই হচ্ছে রাসেখীন ফিল এলম– দৃঢ় এলেমের অধিকারী।

(ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনাক্রমে শরহে তাহরীরুল উসূল)

এ আলোচনা শেষে হযরত আল্লামা ওসমানী (র.) বলেন, এলেমের বড়ো নিদর্শন হচ্ছে আল্লাহর ভয়। যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই সে আলেম পদের যোগ্য নয়। সে যতোই উত্তম বক্তৃতা করুক এবং এলমী বিষয়ের আলোচনা পর্যালোচনা ও অনুসন্ধানে যতোই সে প্রাজ্ঞ পারদর্শী হোক।

www.nagorikpathagar.org

সত্যপন্থী ও বাতিলপন্থীদের এক বিশেষ পার্থক্য

উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইমাম হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ওস্তাদ হযরত ইমাম ওয়াকী (র.) বলেন, সত্যপন্থী ও বাতিলপন্থী গ্রন্থ রচয়িতাদের এক বিশেষ পার্থক্য হচ্ছে, সত্যপন্থীরা যে ব্যাপারেই লেখেন, তারা লিখিত বিষয় সংশ্লিষ্ট সব বর্ণনাই লিপিবদ্ধ করেন। সেগুলো তাদের অভিমতের সমর্থন করুক কিংবা নাই করুক। পক্ষান্তরে বাতিলপন্থীরা তাদের রচনায় সে সব বর্ণনাই উদ্ধৃত করেন, যেগুলো তাদের অভিমতের পক্ষে। *(সুনানে দারা কুতনী– কিতাবুত তাহারাত)*

ইতিহাসের কতিপয় বিস্ময়

চার ভাই– এদের একজন থেকে অন্যজনের বয়সের পার্থক্য দশ বছর এবং তারা আবু তালেব বিন আবদুল মোত্তালেবের সন্তান। এ চার ভাই হলেন– তালেব, আকীল, জাফর এবং আলী মোরতাযা (রা.)।

তালেব আকীলের দশ বছরের, আকীল জাফরের দশ বছরের এবং জাফর আলী মোরতাযা (রা.)-এর দশ বছরের বড়ো।

মূসা বিন ওবায়দা রাবাযী তার সহোদর ভাই আবদুল্লাহর আশি বছরের ছোটো।

সাহাবী হযরত মোহাল্লাব বিন আবী সুফরা (রা.)-এর তিন পুত্র সন্তান– ইয়াযীদ, যিয়াদ ও মোদরেক একই বছর জন্মগ্রহণ করেন এবং এ তিন ভাই একই বছর শহীদ হন। শাহাদাতের সময় তাদের প্রত্যেকের বয়স হয়েছিলো আটচল্লিশ বছর।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.), আবদুল্লাহ বিন ওমর লায়সী, খলীফা সাদী এবং জাফর বিন সোলায়মান হাশেমী– এদের প্রত্যেকের একশ' জন করে সন্তান জন্ম নেয়।

১৯০ হিজরী সালের ১৪ রবিউল আউয়াল তারিখের রাত আল্লাহর অগণিত বিস্ময়কর কুদরতের একটি ছিলো, এ রাতে এক বাদশাহ হাদী ইনতেকাল করেন, আরেক বাদশাহ হারুনুর রশীদ সিংহাসনে সমাসীন হন এবং তৃতীয় বাদশাহ মামুন জন্ম গ্রহণ করেন।

(হাফেযে হাদীস ইমাম আবুল ফারজ জাওযী রচিত 'মাদহাশ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

আরব দেশে কেয়াফা ও এয়াফা শাস্ত্র

কেয়াফা. কোনো মানুষ অথবা জীব জানোয়ারের বাহ্যিক নিদর্শন দেখে সেটির আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে প্রমাণ গ্রহণকে কেয়াফা বলে।

এয়াফা. জীব জানোয়ারের চলাফেরা, পক্ষীকুলের ওড়া ইত্যাদি দেখে সেগুলোর আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রমাণ গ্রহণকে এয়াফা বলে।

এ শাস্ত্র দুটোতে আবরদের জ্ঞান এতো পরিপূর্ণ ছিলো যে, এতদসংক্রান্ত ঘটনা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনুল আসীর (র.) তার ইতিহাস গ্রন্থে আরব গোত্র বনী আসাদের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

আল্লামা ইবনুল আসীর তার ইতিহাস গ্রন্থে লেখেন, আরবের বনী আসাদ গোত্র এয়াফা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং প্রসিদ্ধ ছিলো। একবার জ্বিনদের এক সমাবেশে বনী আসাদের এয়াফা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা এবং প্রসিদ্ধির কথা আলোচিত হচ্ছিলো। তখন জ্বিনদের মধ্য থেকে কয়েকজন এয়াফা শাস্ত্রে বনী আসাদ গোত্রের পরীক্ষা গ্রহণে উদ্যত হয় এবং মানবাকৃতি নিয়ে বনী আসাদ গোত্রে গমন করে। সেখানে গিয়ে মানববেশী জ্বিনেরা বললো, আমাদের উষ্ট্রী হারিয়ে গেছে। আমরা চাচ্ছি আপনারা আপনাদের গোত্রের কাউকে আমাদের সাথে দিন, যিনি এয়াফা শাস্ত্র দ্বারা আমাদের হারানো উষ্ট্রীর বর্তমান অবস্থান চিহ্নিত করে দেবেন।

মানববেশী জ্বিনদের কথামতো বনী আসাদ গোত্রের লোকেরা একটি বালককে তাদের সাথে দিয়ে দেয়। বালকটি উটে বসে মানববেশী জ্বিনদের সাথে রওয়ানা দেয়। পথিমধ্যে একটি বাজপক্ষী উড়ে এ কাফেলার সামনে আসে। বাজপক্ষী নিজের এক বাহু লটকে রেখেছিলো। এটা দেখে বনী আসাদ গোত্রের বালকটি কান্না শুরু করে দেয়। মানববেশী জ্বিনেরা কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে বালকটি নির্দ্বিধায় বলে ফেললো–

বাজপক্ষীটি তার এক বাহু উঠিয়ে রেখেছে এবং আরেক বাহু লটকে দিয়েছে। সেটি যেন সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর কসম খেয়ে বলছে, আসলে তোমরা মানুষ নও আর হারানো উট খোঁজাও তোমাদের উদ্দেশ্য নয়।

(রাসায়েলে ইবনে রজব হাম্বলী ঃ তারীখে ইবনুল আসীরের সূত্রে)

কেবলার দিক নির্ধারণে অংক অথবা নক্ষত্র দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (মৃত ৭৯৫ হিজরী) 'ফযলু এলমিস সলফ আলাল খালফ' নামক স্বরচিত পুস্তিকায় লেখেন–

এলমে তাসীর, অর্থাৎ নক্ষত্ররাজির নড়াচড়া ও অবস্থান ইত্যাদি দ্বারা সমুদ্রে রাস্তা নির্ধারণ এবং কেবলার দিক সম্পর্কে অবগতিলাভের উদ্দেশে প্রয়োজন অনুপাতে উপকার গ্রহণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের মতে জায়েয, কিন্তু এর সূক্ষ্মতা উদঘাটন এবং বাড়াবাড়ি কারো কারো মতে জায়েয নয়, উপরন্তু কিছুটা ক্ষতিকর বটে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরিণতিতে কখনো কখনো মুসলমানদের সাধারণ মাসজিদ ও মেহরাবসমূহ এবং সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়। ফলে এমন ব্যক্তি ধারণা পোষণ করতে থাকে, সাহারায়ে কেরাম, তাবেয়ীরা এবং সর্বসাধারণ মুসলমান কেবলার দিক নির্ধারণে ভুল করেছেন। এরূপ ধারণা পোষণ সম্পূর্ণরূপে বাতিল– ভিত্তিহীন। এ কারণে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) ধ্রুব তারা দ্বারা কেবলার দিক নির্ধারণে প্রমাণ গ্রহণ নিষিদ্ধ বলেছেন।

সাহাবাদের অনুসরণ ও হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.) বলেন–

তোমরা সে কেয়াস– অনুমানই গ্রহণ করো যা তোমাদের পূর্ববর্তীলোকদের কেয়াসের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা, তারা তোমাদের চাইতে অনেক বেশী জানতেন। *(ফযলু এলমিল সলফ আলাল খালফ)*

www.nagorikpathagar.org

পার্থিব বিপদ মসিবত অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, মহামারী

পার্থিব জগতে যেমন নেয়ামত ও সুখ সামগ্রীর কোনো শেষ নেই– প্রত্যেক বড়ো নেয়ামত থেকে আরও বড়ো নেয়ামত হতে পারে, তেমনি বিপদ মসিবতেরও কোনো শেষ নেই। প্রত্যেক বড়ো বিপদের চাইতেও বড়ো বিপদ হতে পারে। এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আল্লামা ইবনে জাওযী (র.) রচিত 'কিতাবুল মাদহাশ' থেকে কিছু বিপদ মসিবত ও অভিনব ঘটনার কথা লিখিত হচ্ছে, যা পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে আপতিত হয়েছে। ইতিহাস আলোচনা ছাড়াও এ বিষয়ে লেখার আমার আরো একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হচ্ছে, বিপদ মসিবত ও দুর্ঘটনায় পতিতরা যেন এসব ঘটনা অধ্যয়ন করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে। নিজের চাইতে বৃহৎ বিপদে পতিত ব্যক্তিকে দেখলে নিজের বিপদ মসিবতের স্বল্পতা সম্পর্কে মানসিক প্রশান্তি স্বস্তি লাভ মানব প্রকৃতিসম্মত একটি বিষয়।

দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ মহামারী

হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফতকালে হিজরী ১৮ সনে অনাবৃষ্টিজনিত কারণে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, বাতাসে ধুলাবালুর পরিবর্তে ছাই ভস্ম ওড়তে দেখা যেতো। তাই এ বছরের নাম দেয়া হয় 'আমুর রামাদাহ– ছাই ভস্মের বছর। অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষাবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, জংগলের হিংস্র জীব জানোয়ার পর্যন্ত ক্ষুধা-পিপাসায় অস্থির হয়ে মানুষের কাছে চলে আসতো। এ দুর্ভিক্ষ চলাকালে হযরত ওমর (রা.) প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, দুর্ভিক্ষাবস্থার অবসান না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঘি এবং দুধ খাবেন না। সর্বসাধারণ মুসলমানও এ সময় ঘি দুধ খাওয়া পরিহার করে।

হিজরী ৬৪ সনে বসরায় এমন কঠিন প্লেগ মহামারী দেখা দেয় যে, শহর প্রশাসকের মা মারা গেলে তার জানাযা বহনের জন্যে একত্রে চার জন মানুষ পাওয়া যায়নি।

হিজরী ৯৬ সনে ব্যাপক ধ্বংসকর প্লেগ মহামারীর বিস্তার ঘটে। এ মহামারীতে তিন দিনে সত্তর হাজার মানুষ মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। এ মহামারীতে সাহাবী হযরত আনাস (রা.)-এর আশি জন পুত্র সন্তান মৃত্যু বরণ করেন (তাঁর সন্তান সংখ্যা ছিলো একশ'র কিছু বেশী)। এ প্লেগ মহামারীর ঘটনায় মৃতদের কবরস্তান পর্যন্ত নিয়ে কবরস্থ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই গৃহবাসী সবাই মরে গেলে তাদের একটি কক্ষে নিয়ে চতুর্দিক ইট এবং কাদামাটি দ্বারা বন্ধ করে দেয়া হতো।

হিজরী ১৩১ সনে প্লেগ মহামারীর আগমন ঘটলে প্রথম দিন সত্তর হাজার, দ্বিতীয় দিন সত্তর হাজারেরও কিছু বেশী মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তৃতীয় দিন অবশিষ্ট সব মানুষই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

হিজরী ৩৩৪ সনে এমন দুর্ভিক্ষ আপতিত হয় যে, মানুষ নিজের সন্তান যবাই করে খেতে শুরু করে। মৃত জীব জানোয়ার খেতে থাকে। কয়েকটি রুটির বিনিময়ে বিরাট বিরাট সহায় সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়া হয়। সমকালীন শাসক মোয়েযযুদৌলার জন্য

www.nagorikpathagar.org

বিশ হাজার টাকায় এক কোর (আমাদের ওজনে প্রায় আশি মণ) গম কেনা হয়। হিসাবে এক মণের দাম দুশ টাকা এবং এক সেরের দাম পাঁচ টাকা পড়ে। হিজরী ৪৪৮ সনে এমন দুর্ভিক্ষ আপতিত হয় যে, সাত গিনিতে পাঁচ সের খাদ্যশস্য, একেক গিনিতে একেক আনার ও কাকড়ি বিক্রি হচ্ছিলো। মিসর থেকে সংবাদ আসে, তিন জন চোর সিঁদ কেটে এক ঘরে প্রবেশ করে। ভোর বেলায় তাদের তিন জনকেই মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাদের একজন সিঁদের মুখে, দ্বিতীয় জন সিঁড়িতে এবং তৃতীয় জন কাপড়ের বাঁধা গাঠরির ওপর মরে পড়ে ছিলো।

হিজরী ৪৬২ সনে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং কলেরা মহামারী এতোটা ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে যে, মানুষ মানুষের গোশত ভক্ষণ করতে শুরু করে। এ দুর্ভিক্ষ চলাকালে একদিন উজির নিজের ঘোড়া থেকে এক জায়গায় অবতরণ করেন। উযির অবতরণ করতেই তিন ব্যক্তি দৌড়ে এসে ঘোড়াটি যবাই করে সেটির কাঁচা গোশত খেতে শুরু করে। এতে উযির তিন জনকেই শূলিদন্ড প্রদান করেন। ভোরে দেখা গেলো, শূলিদণ্ডপ্রাপ্ত তিন জনের কারো দেহেই হাড়গোড় ছাড়া কোনো গোশত অবশিষ্ট নেই। বুভুক্ষুরা এদের সব গোশত খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছে।

ভূমিকম্প

হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফতকালে হিজরী ২০ সনে এক ভীষণ ভূমিকম্প হয়।

অতপর হিজরী ৯৪ সনে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ভূমিকম্প চলতে থাকে। বড় বড় গৃহ ভূমিসাত হয়ে যায় এবং এন্তাকিয়া শহর সম্পূর্ণ মাটিতে মিশে যায়।

হিজরী ২৩৩ সনে গোতা শহর ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ উল্টে যায়। শহরের সব মানুষই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মাত্র একজন লোক জীবিত ছিলো। এর কাছাকাছি এন্তাকিয়া শহরে ভূমিকম্পে বিশ হাজার লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

২৩৪ হিজরী সনে বাগদাদ, বসরা, কুফা, ওয়াসেত, আবাদান, হামাদান, উর, আহওয়ায প্রভৃতি এলাকার ওপর দিয়ে এমন উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হয়, যা শস্য ক্ষেতসমূহ জ্বালিয়ে দেয়। বাতাসের উত্তাপে হাটবাজার পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। একাধারে বায়ান্ন দিন পর্যন্ত এ উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে।

২৩৮ হিজরী সনে তাহের বিন আবদুল্লাহ সমকালীন খলীফা মোতাওয়াক্কেল বিল্লাহর দরবারে একটি পাথর প্রেরণ করে। যা তাবারিস্তান এলাকায় আসমান থেকে পতিত হয়। এর ওজন ছিলো আটশ' চল্লিশ দেরহামের সমান। এটি পতনের আওয়ায বার মাইল পর্যন্ত শোনা যায় এবং আসমান থেকে পড়ে এ পাথর মাটির পাঁচ হাত অভ্যন্তরে চলে যায়।

২৪০ হিজরী সনে তুরস্ক থেকে এক বায়ু প্রবাহিত হয়। এ বায়ু মার্ভ অঞ্চলে পৌঁছে তথাকার অধিবাসীদের এক বৃহৎ অংশকে সর্দি কাশি দ্বারা ধ্বংস করে ফেলে। এর পর এ বায়ু রায় এবং নিশাপুরে পৌঁছে জ্বর এবং হাঁচি দ্বারা অনেক মানুষকে ধ্বংস করে।

www.nagorikpathagar.org

পশ্চিমের শহরগুলো থেকে এ সময় পত্র মারফত সংবাদ আসে, কেযওয়ানের জনবসতিসমূহ থেকে তেরোটি জনবসতি ভূগর্ভে ধসে পড়ে। এ তেরোটি জনবসতির মাত্র দুই জন মানুষ জীবিত ছিলো। এদের দেহের রং একেবারে ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে যায়। এরা কেযওয়ান শহরে গমন করলে শহরবাসী তাদের এই বলে বের করে দেয় যে, তোমরা আল্লাহর আযাবে বন্দী। তাই শহর প্রশাসক তাদের শহরের বাইরে ঘর বানিয়ে দেন।

২৪১ হিজরী সনে ওয়ামেগান অঞ্চলে ভূমিকম্পে পঁচিশ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইয়ামান এলাকায় এক পাহাড় অন্য পাহাড়ের জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

হলব এলাকায় কাকের চাইতে বড়ো এবং শকুনের চাইতে ছোটো এক পাখী এসে গাছের ওপর অবস্থান নেয় এবং চল্লিশ বার আওয়ায করে–তোমরা আল্লাহকে ভয় করো– আল্লাহ্ আল্লাহ্। চল্লিশ বার এ আওয়ায করে পাখীটি উড়ে যায়। আবার পরের দিন এসে পূর্ব দিনকার মতো চল্লিশ বার আওয়ায করে উড়ে যায়। শহর প্রশাসক পাখীর এ আওয়ায শুনতে পেয়েছে এমন পাঁচশ' লোককে সাক্ষী করে রাখেন।

২৪৫ হিজরী সনে এন্তাকিয়ায় ভীষণ ভূমিকম্প হয়। এতে দেড় হাজার ঘরবাড়ি ভূমিস্মাত হয়ে যায়। এ সময় এন্তাকিয়াবাসী ঘর, চেরাগ এবং জানালার আড়াল থেকে ভীতিকর আওয়ায শুনতে পেতো।

এ বছর তেনস এলাকায় অত্যন্ত ভীতিকর একটা আওয়ায শোনা যায়। এ ভীতিকর আওয়ায দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফলে এক বিরাট জনগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যায়।

এ বছরই এক জনবসতির ওপর সাদা কালো পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ৮৮ হিজরী সনে মোসেলের নিকটবর্তী দূনিয়াল শহরে ভূমিকম্প হয়। ভোর বেলায় হঠাৎ দেখা গেলো, শহরের অধিকাংশ এলাকা মাটির স্তূপে পরিণত হয়েছে। ভূমিকম্পের ফলে ভেংগে পড়া ইমারতগুলোর নীচ থেকে দেড় লক্ষ লোকের মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়।

৩১৯ হিজরী সনে হাজীদের এক কাফেলা পথ ভুলে এক অজ্ঞাত স্থানে গিয়ে উপনীত হয়। সেখানে তারা পাথরে পরিণত হয়ে যাওয়া বহু মানুষ দেখতে পান এবং এক রমণীকে দেখেন পাথরের তন্দুরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তন্দুরে যে রুটি ছিলো তাও সম্পূর্ণ পাথরে পরিণত হয়ে গেছে।

হজ্জের অনুষ্ঠানাদি এবং কোরবানী আল্লাহ প্রেমের প্রকাশস্থল

[এ প্রবন্ধটি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আমার ছাত্র জীবনে লেখা। তখন কোনো পত্রিকা কর্তৃপক্ষের ফরমায়েশক্রমে আমি এটি লিখেছিলাম। এ সময় ঘটনাক্রমে লেখাটা সামনে পড়ে যায়। আর এ লেখাটা একান্ত মনোজ্ঞ মনে করে এ পুস্তিকার অংশে জুড়ে দিলাম।]

www.nagorikpathagar.org

এ সৃষ্টিজগতের তার নিজের স্রষ্টা মহান আল্লাহর সাথে অনেক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা স্রষ্টা আর আমরা সবাই তাঁর সৃষ্টি। তিনি হুকুমদাতা আর আমরা সবাই তাঁর হুকুমের অধীন। এ সম্পর্ক সংশ্লিষ্টতা ব্যতীত আল্লাহ তায়ালা মাহবুব– প্রিয়জন এবং সৃষ্টি তাঁর প্রেমিক। বিশ্ব চরাচরে বিদ্যমান সব কিছুর দিকে তাকালে সব বস্তুর মাঝেই আমাদের এ দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ মিলবে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে কম বেশী এই প্রেম ভালোবাসার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। মূর্তিপূজারী জাতি গোষ্ঠীগুলো যদিও পাথর এবং মূর্তি প্রতিমাসমূহের সামনে নতশিরে উপুড় হয়ে পড়ে, কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের দাবী হলো–

'আমরা এ সব প্রতিমার এবাদত– পূজা অর্চনা এ উদ্দেশেই করি যেন এরা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।'

একজন অগ্নিপূজক অগ্নিপূজা করে, একজন সূর্যপূজারী সূর্যের সম্মুখে উপুড় হয়ে পড়ে, একজন হিন্দু মন্দিরের দিকে দৌড়ায়, একজন খৃষ্টান গির্জার দিকে দৌড়ায়, একজন ইহুদী তার এবাদতখানার দিকে দৌড়ায়। এদের সবাইকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন, এসব জায়গায় তোমরা কাকে অন্বেষণ করছো, কার স্মরণে অস্থির চঞ্চল হয়ে এ দৌড়াদৌড়ি করছো, তবে তাদের সকলের কাছ থেকে সম্মিলিত জবাবই পাবেন। তারা সবাই বলবে, একজন তাওহীদবাদী মুসলমান যে পবিত্র সত্তার এবাদতের উদ্দেশে মসজিদের দিকে দৌড়ায়, তারাও সে সত্তার প্রেম ভালবাসায় এবং তাঁরই স্মরণে অস্থির চঞ্চল হয়ে এসব করে। তারা সবাই সে সত্তারই অন্বেষণ করছে এবং তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করছে।

দুর্ভাগ্যবশত তারা ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছে, যে কারণে তাদের যাবতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টা শুধু যে নিষ্ফল নিরর্থক তাই নয়; বরং তাদের ব্যাপারে তা মারাত্মক ক্ষতিকর সাব্যস্ত হয়েছে। তারা যতোই এ ভ্রান্ত পথে দৌড়াক না কেন, ততোই তারা লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে আরো দূরে চলে যাচ্ছে, সেটা ভিন্ন বিষয়।

কবির ভাষায়–

'হে বেদুঈন! তুমি কখনো কাবা শরীফে উপনীত হতে সক্ষম হবে না। কারণ, তুমি যে পথ ধরে চলেছো তা তো তুর্কিস্তান অভিমুখে চলে গেছে।'

দ্বীন ইসলামের অনুসারীদের আল্লাহ তায়ালা নিজের যথার্থ সরল সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন। তারা যে কদমই ওঠাক, তা তাদের প্রকৃত প্রিয়জনের নিকটবর্তী করে দেয়।

সারকথা হচ্ছে, আল্লাহ প্রেম একজন মানুষের জন্য তার প্রকৃতিগত বিষয়। যাতে এক বড়ো থেকে বড়ো দার্শনিক এবং মূর্খ থেকে মূর্খতর গোঁয়ার একই সমান। যে অন্তরে কিছুটা হলেও এখনো প্রাণ অবশিষ্ট রয়েছে, সে অন্তরগুলো নিজের মাঝে আল্লাহ প্রেম, আল্লাহর মহত্ত্ব মর্যাদা অনুভব করে। এখানে সে অন্তরসমূহের আলোচনা হচ্ছে না– বস্তুবাদের আধিক্য যেগুলোকে অপহরণ করে নিয়েছে। যাদের উদ্দেশেই কবি আকবর এলাহীবাদী (র.) বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

ইউরোপ আসমানের মূল মালিক অধিকারীকে ছেড়ে বসেছে।

ব্যস, তারা আকাশের বিদ্যুত আর বাষ্পকেই নিজেদের স্রষ্টা মনে করে বসেছে।

প্রেম ভালোবাসার উপায় উপকরণগুলোর ওপর দৃষ্টিপাত করলে তা তিনটির বেশী বের হয় না। সে তিনটি হলো–সম্পদ, রূপ সৌন্দর্য ও গুণ-বৈশিষ্ট্য। কেউ কাউকে সম্পদের কারণে ভালোবাসে, কেউ রূপ সৌন্দর্যের কারণে ভালোবাসে। আবার কারো গুণবৈশিষ্ট্যের কারণে কেউ তার প্রতি আকৃষ্ট আগ্রহান্বিত হয়।

আমরা যদি সম্মান মর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী আল্লাহর দরবারের প্রতি নযর ওঠাই, তা হলে জানা যাবে, সেখানে প্রেম ভালোবাসার এ উপকরণ তিনটি পূর্ণরূপে বর্তমানই শুধু নেই; বরং তাই হচ্ছে আলোচ্য কারণগুলোর উৎসমূল। পার্থিব জগতে যেখানেই গুণ বৈশিষ্ট্য, রূপ সৌন্দর্যের আলোকচ্ছটা বর্তমান রয়েছে, তা সবই সেই পূর্ণতর গুণ বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিবিম্ব। প্রেম ভালোবাসার যাবতীয় উপায় উপকরণ যখন আল্লাহর দরবারে পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তখন আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোনো দিকে নযর ওঠানো অথবা মন লাগানো কি পরিমাণ সংকীর্ণতা এবং বঞ্চনার কারণ হবে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং সর্ব গুণ বৈশিষ্ট্যের উৎসমূল সত্তাকে ছেড়ে অন্য কিছুর সাথে মন লাগানো বাস্তবে শুধু সীমাহীন বঞ্চনা, চিরস্থায়ী দুঃখ অনুশোচনা ব্যতীত নিজের মাঝে আর কিছুই সৃষ্টি করে না।

আর যখন প্রমাণিত হলো, সৃষ্টিজগতের সাথে আল্লাহর যেমন হুকুমদাতা এবং হুকুমের অধীনস্থতার সম্পর্ক রয়েছে, অনুরূপ রয়েছে প্রেমাস্পদ এবং প্রেমিকের সম্পর্ক। এমতাবস্থায় এখন এটা হৃদয়ংগম করা মোটেই কঠিন কিছু নয় যে, বিভিন্ন ধরনের যে এবাদত বান্দার দায়িত্বে ফরয করা হয়েছে, তা সবই প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্পর্কের প্রদর্শনী মাত্র। তার কিছু হুকুমদাতা ও হুকুমের অধীনস্থতার এবং কিছু আল্লাহ তায়ালার মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং এবাদতগুলোর মধ্যে নামায রোযা, হজ্জ যাকাত প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। আদ্যোপান্ত তা সবই এক রাষ্ট্রীয় দরবারে উপস্থিতির চিত্র। আর যাকাত কিছুটা প্রথম প্রকার এবং কিছুটা দ্বিতীয় প্রকারের মর্যাদাভুক্ত। কেননা, ওশর (উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ), খারাজ (নাগরিকদের থেকে গৃহীত ভূমিকর), ট্যাক্স ও শুল্ক ইত্যাদি একদিকে রাষ্ট্রের হক, অন্য দিকে আল্লাহর পথে নিজের অর্থ সম্পদ কোরবান করে দেয়া প্রেম ভালোবাসার মনযিলসমূহের একটি মনযিল। আর রোযা ও হজ্জ– এ দুটি এবাদত নির্ভেজাল প্রেমাস্পদের মর্যাদা সংশ্লিষ্ট এবং প্রকৃত প্রেম ভালোবাসার প্রকাশ। আমার এ আলোচনা যদিও শেষোক্ত এবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু বর্ণনার ধারাক্রম রক্ষার্থ এখানে রোযা ও হজ্জ সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা আগে উপস্থাপন করছি।

প্রেমের এ প্রথম মনযিলে খাওয়া দাওয়া ছুটে যায়, রাতের ঘুম উবে যায়। রাত দিন শুধু প্রেমাস্পদের ধ্যান খেয়াল এবং চিন্তা ভাবনাই তার মনে ভর করে থাকে। কবির ভাষায়–

'সে রাতই রাত, সে দিনই দিন, যা তোমার স্মরণে অতিক্রান্ত হয়।'

www.nagorikpathagar.org

রমযানের রাত দিনে তো এ কবিতা পংক্তির অনুরূপ প্রেম ভালোবাসার মন হরণকারী দৃশ্যেরই প্রদর্শনী হয়। দিনভর ক্ষুধাপিপাসার কষ্ট বহন করে ফিরে, আর রাত এলেই আবেদন নিবেদনের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। এটাই হাদীস শরীফে ঘোষিত ফরমানের নিগূঢ় রহস্য। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে–

সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধের চেয়েও সুগন্ধযুক্ত। রোযাদার পানাহার, ইন্দ্রিয় কামনা বাসনা সব কিছু আমার জন্যেই পরিত্যাগ করে। অতএব আমি নিজে তাকে এর বিনিময় প্রদান করবো। *(বোখারী)*

মুখের দুর্গন্ধকে মেশকের সুগন্ধের ওপর প্রাধান্যদান, এটা প্রেম ভালোবাসা ছাড়া আর কি। কবির ভাষায়–

'স্বয়ং পবিত্র সত্তার রোযার বিনিময়দানও প্রেম ভালোবাসার
মহান দরবারের এক কারিশমা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

এতেকাফ

রমযান মাসের শেষ দশ দিন সুন্নত এতেকাফ ওপরে আলোচিত প্রেম ভালোবাসারই যোগ্য। কবির ভাষায়–

'অতপর অন্তরে এই ইচ্ছা আছে যে,
কারো দরজায় পড়ে থাকি,
শির নত করে পড়ে থাকি প্রিয়জনের দরবারে।'

শুধু তাই নয়, প্রেমিকের আগ্রহ আকর্ষণে দুনিয়ার অধিকাংশ হালাল বস্তুও পরিহার করা হয়।

প্রেমের দ্বিতীয় মনযিল হলো, যখন চাঞ্চল্য অস্থিরতা বাড়ে, তখন ঘর বাড়ী, প্রিয়জন আত্মীয়স্বজন, জন্মভূমি সব কিছু ছেড়ে পাগল উন্মাদের মতো বনজংগলে ঘুরে বেড়ায়। উন্মাদ পাগলের মতো না শরীরের কোনো পরোয়া থাকে, না পোশাকের কোনো খবর থাকে। সে নিজের অবস্থায়ই মগ্ন। হাজারো রাজসিংহাসন আর রাজপাটের ওপর এ নিস্ব অবস্থাকেই সে প্রাধান্য দেয়।

রমযান শেষ হতেই হজ্জের মাসসমূহ শুরু হওয়ার মাঝে সম্ভবত এ রহস্যই লুকায়িত রয়েছে। রমযান মাস নিশেষে যেন একথারই ঘোষণা দিচ্ছে যে, প্রেমের প্রথম মনযিল শেষ হয়েছে। এখন দ্বিতীয় মনযিলে পদার্পণ শুরু হচ্ছে।

হজ্জের অনুষ্ঠানাদি প্রেমের দ্বিতীয় মনযিল

কিছুটা চিন্তা ভাবনা কাজে লাগালে বুঝা যাবে, হজ্জ এমন এক এবাদত, যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই হচ্ছে এক প্রেমিকসুলভ অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যপূর্ণ তৎপরতার নাম। হজ্জের উদ্দেশে একজন মানুষ তার পরিবার পরিজন, ঘরবাড়ী, জন্মভূমি পরিত্যাগ করে কোনো প্রেমিকের অন্বেষণে বের হয়। পোশাক এবং আকৃতি অবয়বও তাই বানানো হয় যা উন্মাদ উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের জন্যেই সমীচীন। কয়েক দিন থেকে তার

www.nagorikpathagar.org

মাথা খোলা, নখ ও চুল বড়ো বড়ো। কোনো সুগন্ধ দ্রব্যের কাছেও সে যায় না। প্রতি পদক্ষেপে লাব্বায়ক আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক– আমি হাযির, 'হে আল্লাহ আমি হাযির' ধ্বনি তুলে সে শুধু সামনেই চলতে থাকে। মরুময় হেজায মুলুকের রুক্ষ শুষ্ক মাঠে ময়দানে সর্বপ্রকার বিপদ মসিবতের ছায়ায় হজ্জের সফর চলতে থাকে।

'নিরাপত্তার শহর মক্কা মোয়াযযামায় প্রবেশ করেই একজন হাজীকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ, হাজারে আসওয়াদে হাত লাগানো এবং চুম্বন–এ সবটাই হচ্ছে সে অবস্থা, যা একজন প্রেমিকের অবস্থানে উপনীত হলে আরেকজন প্রেমিকের জন্যে করা যথার্থ সমীচীন হয়ে পড়ে। এর পর সাফা মারওয়া পাহাড়ের মাঝে দৌড়ানো, পাহাড়ে আরোহণ কিংবা মিনা প্রান্তরে গমন, এ সবই প্রেমের সীমাহীন আগ্রহ অনুপ্রেরণার বহিঃপ্রকাশ। একজন আরবী কবি কতোই না সুন্দর বলেছেন–

আমি আমার জনবসতি থেকে এ উদ্দেশে বের হয়ে যাচ্ছি, সম্ভবত একাকিত্বে তোমার ধ্যান করবো, অতপর যেন কোনো কল্পনাই আমার অন্তরে না আসে। একজন উর্দু কবি বলেন–

ধ্যান ধারণায় বছর বছর ধরে আমি তার সংগে কথাবার্তা বলেছি।

বছর বছর ধরে এ কল্পিত ছবি আমার দৃষ্টির সামনে রয়েছে।

অতপর নিজের কল্যাণকামী প্রেমিকের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়– যেমন প্রেমিকের দৃষ্টিতে যে বড়ো শত্রু বলে পরিলক্ষিত হয়, এমনকি তাকে পাথর নিক্ষেপ করতেও সে প্রস্তুত হয়ে যায়, মিনায় নির্দিষ্ট স্থানে পাথর নিক্ষেপ করার মাঝে এ রহস্য থাকা মোটেই বিচিত্র কিছু নয়। এ পাথর নিক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে সে কাজকেই স্মরণ করায়, যা সব সময়ই অভিশপ্ত ইবলীস শয়তানের সাথে করা হয়। প্রেমিকের পথে যখন শয়তান প্রতিবন্ধক হয় তখন এভাবে পাথর নিক্ষেপ করেই তাকে তাড়াতে হয়। এর পর বিদায়ী তওয়াফ এবং বিদায়কালে বায়তুল্লাহ তার পর্দার সাথে মিলে কান্নাকাটি– এসবই একজন প্রেমিকের প্রেমাস্পদের ঘর থেকে বিদায়কালের একান্ত করণীয় কিছু কাজ।

প্রেমের সর্বশেষ মনযিল হচ্ছে কোরবানী

প্রেম যখন নিজের সব গন্তব্য অতিক্রম করে, তখন কবির ভাষায় তার সর্বশেষ পরিণতি হয়–

প্রথম আমি এই নযর রেখেছি ফুলের সামনে,

অতপর আমার কলিজা, অন্তকরণ এবং মাথা সবটুকুতেই আমি নযর রেখেছি।

প্রকৃত প্রেমিকদের উচিত, সর্বশেষ মনযিলে কদম রেখে নিজেদের জীবন প্রাণের প্রাণ প্রেমিকের মরু গলিতে কোরবান করে দেয়া। কাবা শরীফের হাজীরা কোরবানীর এ প্রথাও মিনায় যথারীতি আদায় করে। নিজেদের প্রাণসমূহ কোরবানীর জন্যে উপস্থাপন করে।

www.nagorikpathagar.org

অতিশয় ক্ষমাশীল আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বলেছেন, আমার রহমত এবার আমার রোষ ক্রোধ পুরোপুরি অতিক্রম করে গেছে।

মহান আল্লাহ নিজের কৃপা অনুগ্রহে বান্দার প্রতি স্নেহের পরশ বুলিয়ে ঘোষণা করেন– 'আর আমি তাকে দান করেছি এক মহত্ত্বপূর্ণ কোরবানী।' এ ঘোষণা মোতাবেক বান্দা প্রাণের বিনিময়ে এমন এক এক প্রাণ চেয়ে নেয়, যা আল্লাহ তায়ালা এসব জাঁবাজ প্রেমিকদের কাজের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। এর পরও মজার কথা হচ্ছে, এ কোরবানীর জন্যে তিনি মহাবিনিময় প্রদানের ওয়াদা করেছেন। কবির ভাষায়–

'জীবন তাঁর উদ্দেশেই বিলিয়ে দিয়েছি, যা ছিলো তাঁরই দান,
সত্য কথা হচ্ছে, এরপরও তাঁর সবটুকু অধিকার আদায় হয়নি।'

সাপ মানুষকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করেছে

শায়খ হযরত আবুল হাসান আলী বিন মোযাইয়ান সগীর (র.) বলেন, আমি একবার তবুকের এক কূপে পানি আনতে যাই। হঠাৎ পা পিছলে আমি কূপের গভীরে গিয়ে পতিত হই। কূপটি ছিলো প্রাচীন। কূপের এক কোণায় কিছু জায়গা ছিলো, আমি সে জায়গাটুকু ঠিকঠাক করে সেখানে বসে পড়ি। কূপটি ছিলো জনবসতিবিহীন অনাবাদী শূন্য মাঠে অবস্থিত। কোথাও কোনো আদম সন্তান আছে বলে মনে হলো না। দৃশ্যত এ কূপ থেকে বাইরে আসার কোনো উপায় উপাদানই ছিলো না।

আমি এ চিন্তাভাবনা করেই বসে ছিলাম। হঠাৎ এক দমকা আওয়ায আমার কানে আসে। চোখ তুলে দেখলাম একটি বিরাট সাপ। সাপটি আমার দিকে এসে আমাকে লেজে পেঁচিয়ে নিয়ে কূপের ওপরের দিকে ওঠতে থাকে। এক সময় সেটি কূপ থেকে বের হয়ে আসে। বাইরে এসেই সে লেজের পেঁচ ঢিলা করে দেয় এবং আমাকে যমীনের ওপর ছেড়ে এক দিকে চলে যায়। *(হায়তুল হায়ওয়ান, প্রথম খন্ড)*

এটা হচ্ছে আল্লাহর কুদরতের এক বিস্ময়কর কারিশমা। তিনি চাইলে সাপ এবং হিংস্র জীব জন্তু দ্বারাও একজন নায়ুক দুর্বল মানুষের কাজ করিয়ে নেন। কবির ভাষায়–

'তিনি কাঁটাকে আদেশ করলে তাও ফুলবাগান হয়ে যায়।'

আল্লাহর ইচ্ছা না হলে সুদৃঢ় কেল্লা এবং ভূগর্ভস্থ সুসংরক্ষিত গোপন কক্ষও কাউকে বাঁচাতে পারে না।

জ্ঞাতব্য

হযরত শায়খ আবুল হাসান (র.)-এর এক খাদেম একবার তার থেকে বিদায়কালে নিবেদন করল; শায়খ, আমাকে কিছু পাথেয় দান করুন। খাদেমের নিবেদনের জবাবে শায়খ বললেন, যদি তোমার কোনো বস্তু হারিয়ে যায়, অথবা তুমি যদি কামনা করো অমুকের সাথে আমার সাক্ষাত হোক, তা হলে এ দোয়া পড়বে– ইয়া জামেয়ান নাস লেইয়াওমিল লা রাইবা ফীহে, ইন্নাল্লাহা লা ইউখলেফুল মীয়াদ। এজমা বাইনী ওয়া বাইনা কাযা।

www.nagorikpathagar.org

–হে সব মানুষকে একটি দিনে সমবেতকারী, যে দিনের আগমনে কোনো সন্দেহ নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অংগীকার ভংগ করেন না। ইয়া আল্লাহ, আমার ও অমুকের মাঝে মিলন ঘটিয়ে দিন।

ওপরের দোয়ায় 'কাযা'– অমুকের স্থলে নিজের উদ্দেশ্য উল্লেখ করবে। ইনশাআল্লাহ হারানো বস্তু পেয়ে যাবে অথবা আকাংখিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যখনই যে কোনো প্রয়োজনে উপরোক্ত দোয়া করেছি, আমার সে প্রয়োজনই পূর্ণ হয়েছে। *(হায়াতুল আওয়ান, প্রথম খণ্ড)*

একটি পরীক্ষিত আমল

শায়খুল মাশায়েখ ইয়াফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত, কোনো প্রয়োজন পূরণ, উদ্দেশ্য সিদ্ধি, দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা অপনোদনের জন্যে নিম্নবর্ণিত আমলটি অত্যন্ত পরীক্ষিত, উপকারী এবং অনেকটা গোপন সম্পদ ভান্ডারের মতো।

এশার নামাযের পর পূর্ণ পবিত্রতা সহকারে আল্লাহ তায়ালার 'লাতীফ' গুণবাচক নামটি ষোল হাজার ছয়শ একচল্লিশ বার পড়বে। কখনো এ সংখ্যার কমবেশী করবে না। সংখ্যার ভুল হলে এ নামের নিগূঢ় রহস্য অবশিষ্ট থাকবে না। উল্লিখিত সংখ্যার হিসাব সংরক্ষণের সহজ পদ্ধতি হলো, একশ উনত্রিশ দানাবিশিষ্ট এক ছড়া তসবীহ নেবে এবং গোটা তসবীহ ছড়াই একশ উনত্রিশ বার পড়বে। তা হলেই এ সংখ্যা পূর্ণ হবে। আর এ নির্দিষ্ট সংখ্যার কারণ, 'লাতীফু' নামটির সংখ্যাগত মান একশ উনত্রিশ এবং এ সংখ্যাকে এ সংখ্যা দ্বারা পূরণ করলে ষোল হাজার ছয়শ একচল্লিশ হয়।

উল্লিখিত আমল শেষে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য দোয়া করবে। ইনশাআল্লাহ দোয়া কবুল হবে। প্রত্যেক একশ উনত্রিশ বার শেষে একবার এ আয়াত পড়বে–

'লা তুদরেকুহুল আবসারু ওয়া হুওয়া ইউদরেকুল আবসারু ওয়া হুওয়াল্লাতীফুল খাবীর।'

সব শেষে এ দোয়া পড়বে–

'আল্লাহুম্মা ওয়াসসে আলাইয়া রেযকী। আল্লাহুম্মা আতফেফ আলাইয়া খালকাকা কামা সুনতা ওয়াজহী আনিস সুজূদে লেগায়রেকা ফাসুনহু আন যুললিস সুওয়ালে লেগায়রেকা বেরাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন।'

ইয়া আল্লাহ! আমার রেযেক প্রশস্ত করে দাও। ইয়া আল্লাহ! তোমার সৃষ্টিকে আমার ওপর স্নেহশীল করে দাও, যেমন তুমি আমার কপালকে তুমি ব্যতীত অন্যকে সাজদা করা থেকে রক্ষা করেছো, তেমনি তাকে অন্যের কাছে কিছু চাওয়ার অপমান অপদস্থতা থেকে রক্ষা করো। হে শ্রেষ্ঠ রহমতকারী, আমার ওপর দয়া করো। *(হায়াতুল হায়ওয়ান, প্রথম খণ্ড)*

সুলতান নূরুদ্দীন জংগী শহীদ (র.)

হযরত সুলতান নূরুদ্দীন জংগী শহীদ (র.) হচ্ছেন দুনিয়ার ইতিহাসের সেসব শাসকের একজন, যার নাম আওলিয়ায়ে কেরামের ফিরিস্তিতে গণ্য করা হয়। সর্বপ্রথম তিনিই শাম (সিরিয়া) দেশে 'দারুল আদল' নামে একটি স্বতন্ত্র বিচারালয় প্রতিষ্ঠা

www.nagorikpathagar.org

করেন। যেখানে ছোটো বড়ো, উচ্চ নীচ, অভিজাত অনভিজাত, আপন পর সবাইর সংগে কোনো প্রকার ভয়ভীতি এবং রেয়াত ছাড়াই আচরণ করা হতো। সে দেশে তিনি বহু ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, একটি স্বতন্ত্র দারুল হাদীস– হাদীস শিক্ষাগার এবং হাসপাতালও তিনি স্থাপন করেন, পঞ্চাশেরও অধিক ইসলামী শহর কাফের খৃষ্টানদের কবল থেকে মুক্ত করেন।

তিনি অধিকাংশ সময়ই কবিতা পংক্তি আবৃত্তি করতেন, এতে তার অন্তরের প্রেরণা এবং মানস প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়। কবিতা পংক্তির মর্ম হচ্ছে–

আমি বিস্মিত হয়েছি সে লোকের ব্যাপারে, যে হেদায়াতের বদলে গোমরাহী খরিদ করে। আর যে দ্বীনের বদলে দুনিয়া খরিদ করে তার ব্যাপার তো আরও বিস্ময়কর। এ দুজনের চাইতে সে ব্যক্তির ব্যাপার আরও বিস্ময়ের, যে অন্যের দুনিয়ার জন্য নিজের দ্বীন বিক্রি করে। মূলত সে-ই হচ্ছে সবচাইতে বেশী দুর্ভাগা।

সিংহ বকরী এক ঘাটে

সিংহ বকরী, বাঘ মহিষ এক ঘাটে– একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন শিরোনামে সাধারণ ও বিশিষ্ট মানুষ নির্বিশেষে সকলের মুখে মুখে এ প্রবাদ বাক্যটি প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ এ প্রবাদ বাক্যটিকে কবিসুলভ অতিশয়োক্তির বেশী কিছু মনে করে না। এ যুগে সম্ভবত রূপক এবং অতিশয়োক্তি ব্যতীত এর কোনো অর্থ হতেও পারে না।

তবে যারা ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন তারা এ সত্য বিস্মিত হননি। দ্বিতীয় ওমর হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রা.)-এর খেলাফতকালে দুনিয়ার মানুষরা বহুবার এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে। তার খেলাফতকালে সিংহ বকরী একখানে এক সাথে চরতে, ঘাস খেতে, পানি পান করতে দেখাটা কোনো আকস্মিক ব্যাপারই ছিলো না; বরং বহুবারই এ ঘটনা ঘটেছে।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ তাবাকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হযরত মূসা বিন আইউব (র.) হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.)-এর খেলাফতকালে কেরমান প্রদেশের এক জংগলে বকরী চরাতেন। আর সে জংগলে সব সময় বকরী ও হিংস্র বাঘ এবং অন্য সব জীব এক সাথে এক জায়গায় চরে বেড়াতো। হঠাৎ একদিন দেখা গেলো, একটি বাঘ একটি বকরীর ওপর হামলা করে বসেছে। এ ঘটনা দেখেই হযরত মূসা বিন আইউন (র.) বলে ওঠলেন, মনে হয় আজ হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.)-এর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। পরবর্তীতে মানুষজন অনুসন্ধান করে জানতে পারে, সে রাতেই হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.)-এর ইন্তেকাল হয়েছে। ১০১ হিজরী সনের ২০শে রজব হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.)-এর ইন্তেকাল হয়।

(হায়াতুল হায়ওয়ান, প্রথম খন্ড)

হযরত আবুল আলিয়া রাবাহী (র.)

হযরত আবুল আলিয়া (র.) তাবেয়ী জামাতের ইমাম এবং হযরত আলী (রা.) ও হযরত মোয়াবিয়া (রা.)-এর বিরোধের সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। একবার উভয়

www.nagorikpathagar.org

পক্ষের সেনাদল যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। তখন হযরত আবুল আলিয়া (র.)-এর যৌবনকাল। তিনিও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হন। তিনি দেখলেন, উভয় পক্ষেই সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীরা কাতারবন্দী হয়ে ময়দান ঘিরে রেখেছেন, কোনো কাতারেরই প্রান্ত দেখা যায় না। এক পক্ষ আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করলে অন্য পক্ষও আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে। উভয় পক্ষের আল্লাহু আকবার ধ্বনিই শূন্যমন্ডল ভরে দিচ্ছে। এক পক্ষ তাওহীদ বাণী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করলে অন্য পক্ষও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করছে।

হযরত আবুল আলিয়া (র.) বলেন, এ অবস্থা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। উভয় পক্ষের কোন্ পক্ষকে মুসলমান সাব্যস্ত করে তাদের সহায়তা করবো আর কোন্ পক্ষকে অমুসলমান সাব্যস্ত করে তাদের সংগে যুদ্ধ করবো। অতএব, আমি যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসি। *(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, সপ্তম খন্ড)*

বন্ধু বান্ধবের সংগে সাক্ষাত

একদিন হযরত আবদুল করীম আবু উমাইয়া (র.) হযরত আবুল আলিয়া রাবাহী (র.)-এর সংগে সাক্ষাতের উদ্দেশে তার কাছে গমন করেন। সাক্ষাতপ্রার্থী হযরত আবদুল করীম আবু উমাইয়া (র.) তাকে নিতান্ত সাধারণ কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে (র.) বললেন, এ তো খৃষ্টান পাদ্রীদের পোশাক। মুসলমান তো বন্ধু বান্ধবের সাক্ষাতে গেলে যথাসাধ্য ভালো পোশাক পরিধান করে।

(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, অষ্টম খন্ড)

হযরত হাসান বসরী (র.)

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, প্রথম যখন কোনো ফেতনা– সমস্যা সংকট দেখা দেয়, তখন একজন আলেমই তা বুঝতে পারেন। আর যখন তা শেষ হয়ে যায় তখন জাহেল মূর্খরাও তা বুঝতে পারে। *(তাবাকাতে ইবনে সাদ, সপ্তম খন্ড)*

হযরত সালামা বিন আবদুর রহমান (র.) হযরত হাসান বসরী (র.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা যে মানুষদের ফতোয়া দেন, তা কি শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে– নাকি নিজস্ব মতের ভিত্তিতে।

হযরত হাসান বসরী (র.) বললেন, আল্লাহর কসম, যতো ফতোয়া আমরা দেই সব ফতোয়া সম্পর্কে শোনা বর্ণনা আমাদের কাছে থাকে না। তবে আমরা এতোটুকু বুঝি, সর্বসাধারণের অভিমত থেকে আমাদের অভিমত উত্তম। তাই আমরা নিজের অভিমতের ভিত্তিতেই ফতোয়া দেই। *(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, সপ্তম খন্ড)*

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন–

বেদয়াতী প্রবৃত্তির অনুসারীদের সংগে কখনো ওঠাবসা করবে না, তাদের সাথে তর্ক বিতর্ক করবে না এবং তাদের কোনো কথাও শোনবে না।

ফকীহের পরিচয়

হযরত মাতার ওয়াররাক (র.) হযরত হাসান বসরী (র.)-কে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করেন। তিনি সে মাসয়ালা বলে দেন। তখন হযরত মাতার ওয়াররাক (র.)

www.nagorikpathagar.org

বললেন, এ মাসয়ালায় অন্যান্য ফকীহরা তো আপনার বিপরীত অভিমত পোষণ করেন।

এ কথায় হযরত হাসান বসরী (র.) বললেন, হে মাতার, তুমি কখনো কোনো ফকীহ দেখেছো কি? তুমি কি জানো ফকীহ কাকে বলে? যে মোত্তাকী এবং দুনিয়াবিমুখ, বড়োদের ডিংগিয়ে যাওয়ার চিন্তা করে না আর ছোটোদের বিদ্রূপ করে না, সে-ই হচ্ছে আসল ফকীহ। *(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, সপ্তম খন্ড)*

অনাগ্রহীকে এলেম শেখানো উচিত নয়

হযরত মোতাররেফ বিন আবদুল্লাহ বিন শিখখীর (র.) বলেন–

অনাগ্রহীকে নিজের খাবার খাওয়াবে না। মাহদী বলেন, এখানে খাবার অর্থ এলমে হাদীস। যে আগ্রহী নয় তাকে এলেম শেখাবে না।

আবুদল্লাহ বিন আমর (রা.) বিন আসের হাদীস সংকলন

হযরত মোজাহেদ (র.) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) বিন আসের কাছে একটি পুস্তিকা দেখতে পাই। জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? বললেন, এর নাম 'সাদেকা'। এতে হাদীসের সেসব রেওয়ায়াত একত্র করা হয়েছে, যা আমি সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, দ্বিতীয় খন্ড)

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) সম্পর্কে হযরত ইমাম শাবী (র.)

হযরত ইমাম শাবী (র.) হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) সম্পর্কে বলেন–

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) হাদীস শাস্ত্রে ছিলেন ভালো, কিন্তু ফেকাহ শাস্ত্রে নন। *(তাকাবাতে ইবনে সা'দ, দ্বিতীয় খন্ড)*

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হচ্ছেন অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী– এ বিষয়টা আলেমদের কাছে অপ্রকাশ্য নয়। তার অধিক হাদীস রেওয়ায়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের অনেকের আপত্তিও ছিলো। তাদের আপত্তি, হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এতো বেশী হাদীস রেওয়ায়াত করেন যা নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামও করেন না। সাহাবায়ে কেরামের এরূপ আপত্তির ভিত্তিতে হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আবু হোরায়রা (রা.)-এর অধিক হাদীস রেওয়ায়াত সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। একবার তিনি বললেন, আবু হোরায়রা, তুমি এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করছো, যা আমরা শুনিনি। তখন হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বললেন–

মা, আমি এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করেছি যা আপনারা শোনেননি। এর কারণ হচ্ছে, আমি যখন এলমে হাদীস অর্জন করেছি, তখন সম্ভবত আয়না আর সুরমাদানী আপনাকে ব্যস্ত রেখেছে। আর আমার তো হাদীস শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোনো কর্মব্যস্ততাই ছিলো না। *(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, দ্বিতীয় খন্ড)*

www.nagorikpathagar.org

কোরআনের ভাষ্যকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ছাত্র জীবন

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইনতেকাল হয়ে গেলে আমি আমার এক আনসার বন্ধুর কাছে গিয়ে বললাম, আল হামদু লিল্লাহ, এখনও বড়ো বড়ো সাহারায়ে কেরাম বর্তমান রয়েছেন। আমাদের তাদের থেকে এলেম হাসিল করা উচিত। নতুবা তাদের অবর্তমানে মানুষ আমাদের মাসয়ালা জিজ্ঞেস করবে আর আমরা মুশকিলে পড়ে যাবো। আমার আনসার বন্ধু ছিলেন খুবই বিনয়ী স্বভাবের। তিনি বললেন, আপনিও যতো সব অবাস্তব কথা বলেন। এমনও কি দিন কখনো আসবে, যেদিন মানুষের আমাদের প্রয়োজন পড়বে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি আনসার বন্ধুর জবাব শুনে তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজে কোমর বেঁধে এলেম অন্বেষণে লেগে যাই। যে সাহাবী সম্পর্কেই আমি জানতাম, তার কাছে হাদীসের কিছু এলেম রয়েছে, আমি তার কাছেই উপস্থিত হয়ে তা হাসিল করতাম।

তিনি বলেন, কোনো কোনো সময় আমি জানতে পারতাম, অমুক সম্মানিত সাহাবী অমুক হাদীস বর্ণনা করেন। তখন আমি তার দরজায় উপস্থিত হতাম। গিয়ে শোনতাম, তিনি বিশ্রাম করছেন। আমি দরজার সামনেই নিজের চাদরখানা মাথার নীচে রেখে শুয়ে থাকতাম। বাতাস আমার চেহারা এবং কাপড়চোপড় ধূলি ধূসরিত করে দিতো, কিন্তু আমি আমার ধ্যানেই মগ্ন থাকতাম। অতপর যখন গৃহস্বামী বাইরে আসতেন এবং আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে বলতেন, হে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভাতিজা, আপনি একি করেছেন! কারো মাধ্যমে আপনি আমাকেই ডেকে পাঠালেই পারতেন, আমি আপনার সেখানে হাযির হতাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তার কথার জবাবে আমি বলতাম, আমি এলমে হাদীস শেখার জন্যে এসেছি। এটা আমারই দায়িত্ব, তাই আমি স্বয়ং উপস্থিত হয়েছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নিজের বংশীয় সম্মান মর্যাদা, আভিজাত্য এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক, তার স্নেহ দৃষ্টিতে অর্জিত সম্মান মর্যাদা, সব কিছু পেছনে ফেলে একজন সাধারণ মানুষের মতো এলেম শেখার জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরেছেন। কেননা, যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য তার সম্মুখে ছিলো, তা তাকে সর্বপ্রকার কষ্ট পরিশ্রম সওয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করে রেখেছিলো। ওলামায়ে কেরাম বলেন– এলেম হচ্ছে এমন এক চিরস্থায়ী সম্মান, যাতে অসম্মানের নাম গন্ধও নেই। তবে তা এমন অপমান অপদস্থতার সংগে অর্জন করতে হয়, যাতে সম্মান মর্যাদার নাম গন্ধ নেই। *(তালীমুত তালীম লিয যারনূজী)*

এ গভীর অন্বেষণ আর ঐকান্তিক চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলেই সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনিই 'রাব্বানিউল উম্মাহ' (উম্মতের আল্লাহওয়ালা), 'হেবরুল উম্মাহ' (উম্মতের প্রাজ্ঞ পন্ডিত), 'তরজুমানুল কোরআন' (কোরআনের ভাষ্যকার) প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হন। সাহাবায়ে কেরামের যুগেই তার ফতোয়া সাধারণভাবে গৃহীত হতো।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সব কথা শোনার পর আনসার বন্ধু আমার কথার মূল্যায়ন করেন এবং বলতে লাগলেন, আপনি আমাদের চাইতে বেশী জ্ঞানবান।

(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, দ্বিতীয় খন্ড)

নবুওয়ত যুগের মুফতী

হযরত সাহল বিন আবী হায়সাম (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে ছয় জন সম্মানিত ব্যক্তি ফতোয়ার কাজ করতেন। তাদের তিন জন মোহাজের এবং তিন জন আনসার। মোহাজের তিন জন হলেন হযরত ওমর ফারুক (রা.), হযরত ওসমান গনী (রা.) এবং হযরত আলী মোর্তাযা (রা.)। আর আনসার তিন জন হলেন হযরত উবাই বিন কাব (রা.), হযরত মোয়ায বিন জাবাল (রা.) এবং হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা.)।

হযরত মেসওয়ার বিন মাখরামা (রা.) বলেন, সব সাহাবীর এলেম এ ছয় জন পর্যন্ত এসে নিশেষ হয়। সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বকর (রা.) যখন কোনো সমস্যা সংকটের সম্মুখীন হতেন, তখন এ ছয় জনকে একত্র করে পরামর্শ নিতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগেও ফতোয়ার ব্যাপারে জনগণ এ ছয় জনের কাছেই যেতেন। অতপর হযরত ওমর (রা.)-এর যুগেও এ অবস্থাই চলতে থাকে। তখনও এ ছয় জনের ফতোয়াই গৃহীত হতো। *(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, দ্বিতীয় খন্ড)*

হযরত ওসমান গনী (রা.) ও হযরত যায়দ বিন সাওহান (রা.)

এ ঘটনাটি সাহাবায়ে কেরামের বিস্ময়কর স্বভাব বৈশিষ্ট্য এবং শালীনতার উদাহরণ। তাদের একদিকে সত্য কথায় বড়ো থেকে বড় বাদশাহ বা শাসকের ভয়ে ভীত না হওয়া, অন্য দিকে শাসকের আনুগত্য পাওয়ার অধিকার সেবকের মতো করে আদায় করা। কোনো কোনো বিষয়ে আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওসমান (রা.)-এর সংগে হযরত যায়দ বিন সাওহান (রা.)-এর দ্বিমত ছিলো। একদিন তিনি হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে তিন তিন বার উচ্চারণ করেন–

'হে আমীরুল মোমেনীন, আপনি সঠিক পথ থেকে দূরে সরে গেছেন, তাই আপনার দলও সঠিক পথ থেকে দূরে সরে গেছে। আপনি সঠিক পথে আসুন, তাহলে আপনার দলও সঠিক পথে আসবে।'

খুব সম্ভব তখন হযরত ওসমান (রা.) হযরত যায়দ বিন সাওহান (রা.)-এর চিন্তাকে অবাস্তব ভেবে জবাবের প্রতি মনোযোগ দেননি। সাথে সাথে কোনো অসন্তুষ্টি বা রোষ ক্রোধও প্রকাশ করেননি; বরং তাকে উদ্দেশ করে বললেন–

'তুমি কি তোমার আমীর– নেতার অনুগত্য করবে না?'

হযরত ওসমান (রা.)-এর কথায় হযরত যায়দ বিন সাওহান (রা.) বললেন, নিসন্দেহে আমি আমার নেতার আনুগত্য করবো। তখন হযরত ওসমান (রা.) বললেন, তা হলে শাম (সিরিয়া) দেশে চলে যাও। হযরত যায়দ বিন সাওহান (রা.) তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে ওঠে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে শাম দেশের দিকে যেখানে যাওয়ার জন্য

www.nagorikpathagar.org

খলীফা হযরত ওসমান (রা.) তাকে আদেশ করেছিলেন– সেদিকে রওয়ানা করেন। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম মতবিরোধ সত্ত্বেও নেতার আনুগত্য নিজেদের ওয়াজেব দায়িত্ব মনে করতেন। *(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, দ্বিতীয় খন্ড)*

সুকণ্ঠ পাঠক থেকে কোরআন শোনা পছন্দনীয়

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম হযরত আলকামা বিন কায়স (র.) যিনি একজন শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর বিশিষ্ট ছাত্রদের একজন ছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা কোরআন তেলাওয়াতে আমাকে বিশেষ সুকণ্ঠ দান করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) আমাকে দিয়ে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করিয়ে শুনতেন আর বলতেন, পড়ো, আমার মা বাপ তোমার জন্যে কোরবান হোন। তিনি আরও বলতেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– 'সুন্দর আওয়ায কোরআন মজীদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।'

আত্মত্যাগের এক আজব উদাহরণ

হযরত ইবরাহীম নাখয়ী ও হযরত ইবরাহীম তায়মী (র.) উচ্চ শ্রেণীর দু'জন তাবে তাবেয়ী। এ উম্মতের সেরা যালেম হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হাজার হাজার আলেম, জ্ঞানী গুণী পন্ডিত ব্যক্তিকে জেলে পুরেছে, হাজার হাজার মানুষকে শহীদ করেছে অথবা শহীদ করতে চেয়েছে। যালেম হাজ্জাজ যাদের শহীদ করতে চেয়েছে, হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.)-ও ছিলেন তাদের একজন। হাজ্জাজের সিপাহীরা তাকে খুজে অস্থির আর তিনি লুকিয়ে থাকতেন।

একদিন জনৈক সংবাদদাতা হাজ্জাজের সিপাহীদের সংবাদ দেয়, ইবরাহীম নাখয়ী অমুক জায়গায় রয়েছেন। ঘটনাচক্রে সেখানে তারই সমসাময়িক আরেক ইবরাহীম অবস্থান করছিলেন। যিনি ইবরাহীম তায়মী নামে পরিচিত। হাজ্জাজের সিপাহীরা এসে তাকে জিজ্ঞেস করলো, ইবরাহীম কে? তিনি বললেন, আমি। অথচ তিনি জানতেন, হাজ্জাজের সিপাহীরা তাকে নয়; বরং হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.)-কে খুজছে।

এ সত্ত্বেও তিনি বিস্ময়কর আত্মত্যাগের পরিচয় দেন। তিনি সিপাহীদের হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.)-এর সন্ধানদানের পরিবর্তে নিজের নামই ইবরাহীম বলে গ্রেপ্তার হয়ে যান। হাজ্জাজের নির্দেশক্রমে তাকে দীনাস নামক জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়। এখানে রৌদ্র তাপ থেকে বাঁচার জন্য কোনো ছায়া অথবা ঠান্ডা থেকে বাঁচার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। এর পরেও দুজনকে এক শেকলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো। বন্দী জীবনের কঠিন কষ্টে হযরত ইবরাহীম তায়মী (র.) এতোই দুর্বল হয়ে পড়েন যে, তার মা জেলখানায় তাকে দেখতে গিয়ে চিনতে পারেননি। অবশেষে এ বন্দিদশায়ই তার জীবনের অবসান হয়।

জেলখানায় বন্দীরা তাকে বলেছিলো, সিপাহীরা তো আপনার খোজে ছিলো না, আপনি কেন স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব বরণ করতে গেলেন। তিনি বললেন, ইবরাহীম নাখয়ীর মতো যুগের ইমাম বন্দী থাকুক, এটা আমি সমীচীন মনে করিনি। তাই আমি তার স্থলে নিজের নাম পেশ করেছি। *(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ষষ্ঠ খন্ড)*

www.nagorikpathagar.org

শালীন শব্দ ব্যবহারের সূক্ষ্ম উদাহরণ

হযরত ইবনে আওন (র.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.)-এর ছাত্র। মর্জিয়াদের ব্যাপারে তিনি কিছুটা সুধারণা পোষণ করতেন। তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় মর্জিয়াদের আলোচনা শুরু হয়। তখন হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) মর্জিয়াদের সম্পর্কে এ কথা বলেন– তার চেয়ে অন্য কথা বলা ভালো ছিলো। *(মর্জিয়া একটি বাতিল ফেরকার নাম)*

কি অসাধারণ শালীনতা। মতবিরোধও প্রকাশ করে দিলেন, অথচ স্বীয় ওস্তাদ হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.)-এর কথা ভুল বা দূষণীয় সাব্যস্ত করলেন না; বরং বললেন, অন্য কথা বলা এর চাইতে ভালো ছিলো।

উচ্চ স্বরে ও নিম্ন স্বরে যেকের সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি

[হযরত মির্জা মাযহার জানে জানাঁ (র.)-এর এ চিঠিখানা ফার্সী ভাষায় লিখিত। এখানে বাংলা অনুবাদ পেশ করা হচ্ছে।]

আল্লাহর প্রশংসা ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদের পর, সবার জেনে রাখা দরকার, হানাফী মাযহাব অনুসারী ফেকাহবিদদের একদল উচ্চ স্বরে আমীন পড়ার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে গিয়ে বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিয়েছেন এবং তার ওপর হারামের ফতোয়া পর্যন্ত জারি করে দিয়েছেন। কিছু কিছু আলেম ও মোহাদ্দেস উচ্চ স্বরে যেকের জায়েয প্রমাণ করেছেন এবং তা নিম্ন স্বরের যেকেরের চেয়ে উত্তম সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এ উভয় দলই মধ্যম পন্থা থেকে দূরে সরে গেছেন। এ আলোচনায় কোনো দলই ইনসাফপূর্ণ কথা বলতে পারেননি। বিষয়টা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

জানা দরকার, যেকের অর্থ স্মরণ করা। যেকের তিন প্রকার। ১. মৌখিক যেকের– যাতে মনোযোগ থাকে না। এ যেকের যে হিসাবের মধ্যেই পড়ে না তা সুস্পষ্ট। এটা যেকেরের প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতার প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। ২. অন্তরের যেকের– যা মুখের নড়াচড়া ব্যতীত আদায় করা হয়। সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় এ যেকেরকে যেকরে খফী– নিম্ন বা অনুচ্চ যেকের বলা হয়। সুফিয়ায়ে কেরামের সব মোরাকাবা– ধ্যানের ভিত্তিই হলো যেকরে খফী বা অনুচ্চ যেকের। সুফিয়ায়ে কেরামের সব তরীকায়ই এ যেকের প্রচলিত রয়েছে। যেকরে খফী বা অনুচ্চ স্বরে যেকেরের আবার দুটি পন্থা আছে। প্রথমত শুধু অন্তরে আল্লাহ তায়ালার সত্তার ধ্যান করা। এ পন্থায় আল্লাহ তায়ালার কোনো গুণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ধ্যান মনে আসবে না। দ্বিতীয়ত আল্লাহর সত্তার ধ্যান করার সাথে সাথে কোনো গুণ বৈশিষ্ট্যের ধ্যান খেয়ালও যেকেরের সময় থাকবে। যেকেরের এ দু'টি পন্থা কোরআনের আয়াত থেকে গৃহীত। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

www.nagorikpathagar.org

'(হে নবী,) তোমার মালিককে স্মরণ করো মনে মনে, সকাল-সন্ধ্যায় সবিনয়ে ও সশংক চিত্তে, অনুচ্চ স্বরের কথাবার্তা দিয়েও (তাঁকে তুমি স্মরণ করো), কখনো তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ো না।' *(সূরা আল আরাফ, আয়াত ২০৫)*

দ্বিতীয়ত আল্লাহ তায়ালার সত্তার ধ্যানের সাথে সাথে বান্দার ওপর তিনি যেসব অনুগ্রহ করেছেন সেসবের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। শরীয়তের পরিভাষায় যার নাম যেকের, তা ঈমান বৃদ্ধির জন্যে অত্যন্ত উপকারী। কোরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসসমূহ এ যেকেরের ফযীলতের আলোচনায় ভরপুর।

তৃতীয় প্রকার যেকের হলো, এভাবে মুখে আল্লাহর যেকের করা যেন অন্তকরণেও তাঁর স্মরণ বিদ্যমান থাকে। যেকেরের অন্য সব ধরন থেকে এ ধরনটাই বেশী কার্যকর। এ যেকের করার আবার দু'টি পন্থা। বান্দা বেশী উচ্চ স্বরে যেকের না করে শুধু নিজেকে শোনানোর মতো আওয়াযে যেকের করবে। শরীয়তের পরিভাষায় একে যেকরে খফী বা অনুচ্চ স্বরের যেকের বলে। যেকেরের এ পদ্ধতি কোরআনের আয়াত থেকে গৃহীত। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

'ডাকো তোমাদের রব– প্রভু পালনকর্তাকে সবিনয়ে অনুচ্চ স্বরে।'

(সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ২০৪)

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, এতোটুকু উচ্চ স্বরে যেকের করা যেন অন্যেরাও তা শুনতে পায়। শরীয়তের পরিভাষায় একে যেকরে যাহর– উচ্চ স্বরে যেকের বলে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যেকেরের এ প্রকার যেকরে খফী– অনুচ্চ স্বরে যেকের থেকে উত্তম। তবে তা আবার নিরংকুশ উত্তম নয়। উত্তম হলে তা হবে আল্লাহর কোন হেকমতের কারণে। যেমন আযান, যেসব নামাযে উচ্চ আওয়াযে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয়, ঘুমন্তদের জাগানো এবং উদাসীন অমনোযোগীদের সচকিত করার উদ্দেশে প্রচলন করা হয়েছে। অনুচ্চ স্বরে যেকেরের উপকার হলো, এতে বান্দার মানসিকতা রিয়া– প্রদর্শনেচ্ছা এবং খ্যাতি প্রসিদ্ধির অনিষ্ট থেকে সংরক্ষিত থাকে। রিয়া এবং প্রসিদ্ধি লাভের মানসিকতা এমন দুটি অনিষ্ট, যা নেক আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়ার পথে মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করে। কোরআনের আয়াত এবং অনেক হাদীস দ্বারা যেকরে খফী– অনুচ্চ স্বরে যেকেরের ফযীলত প্রমাণিত হয়েছে; বরং এক হাদীসে বলা হয়েছে–

'নিসন্দেহে তোমরা কোন বধির এবং অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না।'

এ হাদীস থেকে যেকরে যাহর– উচ্চ স্বরে যেকেরের নিষিদ্ধতার কারণ বুঝা যায়। বিশেষ কোনো অবস্থার সাথে উচ্চ স্বরে যেকের করা এবং নির্ধারিত পন্থা পদ্ধতিতে মোরাকাবা পরবর্তীকালে প্রচলিত হয়েছে। এগুলো কোরআন হাদীস থেকে গৃহীত হয়নি; বরং বুযুর্গানে দ্বীন এলহাম ও ফয়যের সূচনার ইঙ্গিত থেকে গ্রহণপূর্বক তা চালু করেছেন। এ মাসয়ালায় শরীয়ত নীরব, শরীয়ত স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করে না। উচ্চ স্বরের যেকেরে এক ধরনের অপ্রকাশ্য উপকারিতাও পাওয়া যায়। তবে হাঁ, যে বিষয় কোরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তা অন্য কিছু দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের চাইতে

www.nagorikpathagar.org

অবশ্যই উত্তম, তা কোরআন হাদীস ব্যতিরেকে অন্য কিছু দ্বারা প্রমাণিত বিষয় জায়েয কিংবা যতো উপকারীই হোক না কেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত আলী মোর্তাযা (রা.)-কে উচ্চ স্বরে কালেমা তাইয়্যেবার যেকের শিক্ষা দিয়েছেন, যা হযরত শাদ্দাদ বিন আওস (রা.) বর্ণিত হাদীসের শুরুতে আছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রথম হযরত আলী (রা.)-কে দরজা বন্ধ করার আদেশ দেন। অতপর তাকে উচ্চ স্বরে যেকের শিক্ষা দেন। এতে জানা গেলো, মোটামুটি অনুচ্চ স্বরে যেকের শিক্ষাদানই আসলে উদ্দেশ্য ছিলো। আর কথাও উচ্চ স্বরে যেকের জায়েয নাজায়েয হওয়া নিয়ে নয়; বরং কোনটা বেশী উত্তম সেটাই কথা।

উচ্চ স্বরের যেকের অনুচ্চ স্বরের যেকের থেকে নিরংকুশভাবে উত্তম দাবী করা, এটা কোরআনের আয়াত ও হাদীসের দলীল প্রমাণ সুস্পষ্ট অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র। সুতরাং উচ্চ স্বরে যেকের অনুচ্চ স্বরের যেকের থেকে নিরংকুশ উত্তম– এ দাবী ঠিক নয়। অনুরূপ অনুচ্চ স্বরের যেকেরকেও নিরংকুশভাবে উত্তম সাব্যস্তকরণ কোরআন হাদীসের দলীল অস্বীকার করা। অনুরূপ উচ্চ স্বরে যেকেরের সকল প্রকার অস্বীকার করাও কোরআন হাদীসের দলীলের বিপরীত। কেননা, কিছু কিছু জায়গায় উচ্চ স্বরে যেকের জায়েযই নয়। যেমন যেসব নামাযে চুপে কেরাত পড়ার আদেশ রয়েছে সেসব নামাযে উচ্চ আওয়াযে কেরাত পড়া। অনুচ্চ আওয়াযে যেকের সুন্নতসম্মত বলে দাবী করা এবং তা দ্বারা সেসব মোরাকাবা করা, যা সুফিয়ায়ে কেরামের মাঝে প্রচলিত রয়েছে, অথবা উচ্চ আওয়াযের যেকেরকে শরীয়তসম্মত সাব্যস্ত করা– যা পরবর্তীকালের সুফিয়ায়ে কেরাম প্রচলন করেছেন, যা অত্যধিক উচ্চ আওয়াযে করা হয়, এ সবই নিরর্থক। থাক তো উত্তম সাব্যস্ত করা হবে। কিছু নব্য যুবক যে উভয় দিক নিয়ে আলোচনা করছে, তা দেখার যোগ্য নয়। যে কোনো বিষয়ে বাড়তি কমতি ভালো নয়– মধ্যপন্থাই উত্তম। আর উত্তম কথা তাই, যা অল্পে পুরো বিষয় বুঝিয়ে দেয়। যে হেদায়াতের অনুসরণ আনুগত্য করেছে এবং যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য অনুসরণকে অত্যাবশ্যকরূপে আঁকড়ে ধরেছে তার ওপর সালাম।

দুনিয়ায় তাকওয়ার বরকত

দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ইমাম এবং হাফেযে হাদীস হযরত আবদুর রহমান বিন মাহদী (র.) বলেন, আল্লাহর কসম, তোমরা যে জিনিস শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে পরিত্যাগ করবে, তা না পাওয়ার কোনো ক্ষতি অনুভব করবে না।

এর পর তিনি নিজের এক ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আমি আর আমার ভাই এক ব্যাপারে অংশীদার ছিলাম। তাতে খুব বেশী মুনাফা হয়ে আমাদের অনেক সম্পদ লাভ হয়। অতপর সে সম্পদ সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ সংশয় জাগে। আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে সে সম্পদ ছেড়ে দেই। ফলে আমার জীবদ্দশায়ই সে পরিত্যাজ্য সম্পদের সবটুকুই হালাল এবং পবিত্র হয়ে আমার কাছে ফিরে আসে। তা এভাবে যে, আমার ভাই মারা যান এবং আমার পিতা আমার ভাইয়ের ত্যাজ্য সম্পদ

www.nagorikpathagar.org

উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে সে সম্পদ আমি লাভ করি। *(সেফওয়াতুস সাফওয়া লে ইবনিল জাওযী)*

হযরত আবদুল আযীয বিন ইউসুফ (র.) বলেন, একবার আমি বসরা থেকে বিদায় গ্রহণের সংকল্প করে ইয়াহইয়া বিন সায়ীদ (র.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। এরপর আবদুর রহমান বিন মাহদী ও যোহায়র বিন নোয়াইম বানী (র.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাদের থেকেও বিদায় লই। যোহায়র বিন নোয়াইম বানী (র.)-এর সংগে বিদায়ী সাক্ষাতকালে আমি তাকে নিবেদন করি, যদি আপনার কোনো প্রয়োজন থাকে বলুন, যা পুরো করে আমি সৌভাগ্য লাভ করতে পারি।

আমার নিবেদনের জবাবে হযরত যোহায়র বিন নোয়াইম বানী (র.) বললেন, হাঁ, একটা প্রয়োজন তো আমার রয়েছে, তবে তা সাধারণ কোনো প্রয়োজন নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। এ কথায় আমি মনে মনে খুব খুশী হই। যাক, ভাবলাম আমি তার সেবা করার একটা সুযোগ পেয়ে গেছি। অতপর তিনি বলেন, আমার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনটি হলো, তুমি তাকওয়া অবলম্বন করো। কেননা, এ খাম্বাগুলো স্বর্ণের হয়ে যাওয়া থেকে তোমার তাকওয়া অবলম্বন আমার কাছে বেশী প্রিয়। *(সেফওয়াতুস সাফওয়া লে-ইবনিল জাওযী)*

হযরত যোহায়র বিন নোয়াইম বানী (র.)

হযরত যোহায়র বিন নোয়াইম বানী (র.) বসরার সুপ্রসিদ্ধ সুপরিচিত আল্লাহওয়ালা আলেম, ইমাম এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একদিন এক মোতাযেলা আকীদা পোষণকারী তার পাঠসভায় উপস্থিত হয় এবং হতভাগ্য ব্যক্তিটি তার মুখোমুখি বলে, ওহে যোহায়র, আমি শুনেছি, তুমি যিন্দীক– ছদ্মবেশী কাফের। হযরত যোহায়র বিন নোয়াইম বানী (র.) অত্যন্ত গম্ভীর্য সহকারে বললেন, আমি যিন্দীক নই, তবে একজন বদ আমল খারাপ মানুষ আমি।

আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির ওপর তার স্নেহ করুণার অবস্থা ছিলো, তিনি বলতেন, যদি আমার দেহ কাঁচি দিয়ে কাটা হতো আর সব মানুষ আল্লাহর এবাদত আনুগত্য করতো। জনৈক ব্যক্তি নিবেদন করলো, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। বললেন, তুমি উদাসীনতা অমনোযোগিতায় পড়ে থাকো, আর আল্লাহ তোমাকে পাকড়াও করেন, এ অবস্থা থেকে বেঁচে থাকো। (সেফওয়াতুস সাফওয়া লে-ইবনিল জাওযী)

স্বপ্নের আদেশ সম্পর্কিত ফতোয়া

জামে সগীরের ভাষ্যগ্রন্থ 'সেরাজুল মুনীরে' হাফেয আযীযী (র.) একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। ঘটনাটি হলো, হযরত শায়খ ইযযুদ্দীন বিন সালামের যমানায় এক লোক স্বপ্নে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করে। তিনি স্বপ্নদ্রষ্টাকে বললেন, অমুক স্থানে যাও এবং সেখানে মাটির নীচে সম্পদ রয়েছে তা তুমি নিয়ে নাও। শরীয়ত বিধান অনুযায়ী মাটির নীচে থেকে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ যাকাত প্রদানের দায়িত্ব থেকেও তুমি মুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

সকাল বেলা লোকটি কথিত স্থানে গমন করে যমীন খুঁড়ে সম্পদ বের করে আনে। এখন এ ব্যক্তি সমকালীন ওলামায়ে কেরামের কাছে ফতোয়া চাইলো, শরীয়ত বিধান অনুযায়ী আমার এ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে কিনা? কিন্তু স্বপ্নে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ যাকাতও মাফ করে দিয়েছেন। এখন আমার কি করণীয়? অধিকাংশ আলেম ফতোয়া দেন, তুমি মাটির নীচ থেকে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ যাকাতদানের শরীয়ত বিধান থেকে মুক্ত। তোমার ব্যাপরটা আলোচ্য শরীয়ত বিধানের ব্যতিক্রম, কিন্তু হযরত শায়খ ইযযুদ্দীন বিন সালাম (র.) বললেন, না, ব্যাপারটা এমন নয়, যেমন অধিকাংশ আলেম মত প্রকাশ করেছেন। তাকে প্রাপ্ত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে। কেননা, তাকে স্বপ্নে যা বলা হয়েছে তার মর্যাদা বেশীর থেকে বেশী বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসের সমান, কিন্তু এক্ষেত্রে এর চাইতেও বেশী শক্তিশালী বর্ণনা রয়েছে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, গুপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে। এ হাদীস নিসন্দেহে স্বপ্নে কথিত হাদীস থেকে বিশুদ্ধতর। বিশুদ্ধ ও বিশুদ্ধতরো হাদীসের মাঝে বিরোধ হলে আমল বিশুদ্ধতরো হাদীসের ওপর করতে হবে। *(সেরাজুল মুনীর শরহে জামে সগীর, দ্বিতীয় খন্ড)*

অন্তরের দাওয়াই

হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (র.) বলেন, অন্তরের দাওয়াই পাঁচটি–

১. অর্থ বুঝে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করা। ২. উদরকে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য থেকে খালি রাখা। ৩. তাহাজ্জুদ নামায পড়া। ৪. শেষ রাতে কান্নাকাটি করা। ৫. নেককার পুণ্যবান লোকদের সংসর্গ। *(আল খুভ ফিস সালাতে লে-ইবনিল জাওযী)*

জ্বিনদের মাঝে হাদীসের বর্ণনা ও শিক্ষা কার্যক্রম

হযরত আল্লামা কাযী বদরুদ্দীন হানাফী (র.) ছিলেন অষ্টম হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ হানাফী মতাবলম্বী আলেম। জ্বিন সম্প্রদায়ের অবস্থা ও বিধান সম্পর্কিত তার প্রণীত স্বতন্ত্র গ্রন্থ 'আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান্ন' অতি সুপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ। আলোচ্য গ্রন্থে ওপরের শিরোনামে তিনি বর্ণনা করেছেন–

হযরত উবাই বিন কাব (রা.) বর্ণনা করেন, মুসলমানদের এক দল মক্কা মোয়াযযামার উদ্দেশে বের হয়ে ঘটনাক্রমে পথ ভুলে যায়। বিরান মরভূমিতে জীবনের কোনো আশাই তাদের ছিলো না। এ পথভোলা কাফেলা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে কাফন পরে শুয়ে পড়ে। তখন এক জ্বিন গাছ চিরে তাদের সম্মুখে এসে বললো, আমাদের যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস শুনেছি, তাদের মধ্যে এখন শুধু আমিই অবশিষ্ট রয়েছি। আমি স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি–

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং কেয়ামতের দিনের ওপর ঈমান রাখে, তার উচিত সব মুসলমানের জন্যে তাই পছন্দ করা, যা সে নিজের জন্যে পছন্দ করে এবং সকল মুসলমানের জন্যে তাই অপছন্দ করা যা সে নিজের জন্যে অপছন্দ করে।'

www.nagorikpathagar.org

অতপর সে জ্বিন পথভোলা কাফেলাকে রাস্তার ওপর উঠিয়ে পানির ঠিকানা বলে দেয়।

হযরত ওয়াহাব বিন মোনাব্বেহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এবং হযরত হাসান বসরী (র.) প্রতি বছর হজ্জ মৌসুমে রাতের কোনো অংশে মাসজিদে খায়ফে একজন আরেকজনের সংগে সাক্ষাত করতেন, এ সময় অন্য সব মানুষ ঘুমিয়ে যেতো। আগের অভ্যাস অনুযায়ী উভয় বুযুর্গ সংগী সাথীসহ মাসজিদে খায়ফে বসা ছিলেন। এ সময় একটি পতংগ এসে হযরত ওয়াহাব বিন মোনাব্বেহ (র.)–এর কাঁধের ওপর বসে এবং তাকে সালাম করে। ওয়াহাব (র.) তাকে সালামের জবাব দেন এবং বুঝে ফেলেন, এ কোনো জ্বিন হবে। অতপর তিনি পতংগরূপী জ্বিনের সংগে কথাবার্তা শুরু করে দেন, তার পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। সে জবাব দেয়, আমি জ্বিনদের মধ্য থেকে এক মুসলমান। হযরত ওয়াহাব (র.) জিজ্ঞেস করলেন, এ মুহূর্তে তুমি কি উদ্দেশে এখানে এসেছো? আগন্তুক জ্বিন বললো, আপনার মজলিস থেকে এলেম এবং নৈতিক চারিত্রিক ফয়য ও কল্যাণ লাভের উদ্দেশে এসেছি। আমাদের জাতি এভাবেই মানুষদের যারা আলেম এবং নেককার– সেসব পুণ্যবানদের মজলিস থেকে উপকৃত হয়। আমরা আপনাদের অধিকাংশ আমল, নামায, জেহাদ, রোগীর সেবা শুশ্রূষা, খোজ খবর গ্রহণ, জানাযার নামায, হজ্জ ওমরা ইত্যাদিতে শরীক হই এবং আপনাদের এলমী উপকারী বিষয়সমূহ ও হাদীসের বর্ণনাসমূহ সংরক্ষণ করি।

হযরত ওয়াহাব (র.) পতংগরূপী জ্বিনকে জিজ্ঞেস করলেন, জ্বিনদের মাঝে সবচাইতে বড় মোহাদ্দেস এবং আলেম কে? সে হযরত হাসান বসরী (র.)-এর প্রতি ইংগিত করে বললো, আমাদের জাতির মাঝে তার ছাত্ররাই সবচাইতে বড় আলেম এবং মোহাদ্দেস। *(আকামুল মারজান)*

ওস্তাদ এবং আলেমের সম্মান

খোলাসাতুল ফাতাওয়া গ্রন্থে রয়েছে, মজলিসে শাগরেদ ওস্তাদের আগে কথা শুরু করবে না এবং ওস্তাদের আসনে বসবে না। যদিও তিনি সেখানে উপস্থিত নেই।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, ছাত্রদের যেমন শিক্ষকের সম্মান করা জরুরী, তেমনি প্রত্যেক সাধারণ মানুষ, যারা দ্বীনের বিধান অবগত নয়, তাদেরও ওলামায়ে কেরামের সম্মান করা জরুরী। *(খোলাসাতুল ফাতাওয়া, চতুর্থ খন্ড)*

বড় কথার নগদ শাস্তি

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, একদিন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় 'আমি কখনো কিছু ভুলি না।' একথা বলার পরই আমি কর্মচারীকে বললাম, আমার জুতা আনো। কর্মচারী বললো, জুতা তো আপনার কাছে সামনেই রয়েছে। এ যেন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আমার ভুলটা ধরিয়ে দেয়া।

(রওযাতুল ওকালা লে-ইবনে হেব্বান)

সময়ের দাবী কি?

আশপাশের প্রথা প্রচলন, আরাম আয়েশ, বিলাসিতা-পূজার মানসিকতা ও চিন্তাচেতনা থেকে কিছুটা আলাদা হয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন, তখন আপনার দৃঢ়

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বাস জমবে, 'সময়' বেচারা না কাউকে মদ খেতে ডাকে, না বিলাসিতা আর নির্লজ্জতার দাওয়াত দেয়। আর না নারীকে গৃহ-রাণী হওয়ার পরিবর্তে অফিসের কেরানী হতে বাধ্য করে। না কোনো অবস্থায় নারীকে উলংগ থাকতে, উলংগ ঘোরাফেরা করতে এবং গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে জন্ম বা বৈবাহিক সূত্রে বিয়ে হারাম) লোকদের সংগে ঢলাঢলি রং ঢং করতে বাধ্য করে। না 'সময়' বেচারা কাউকে বলেছে, সিনেমার অভিশাপ অবলম্বন না করলে তোমাকে গলা টিপে হত্যা করবো। আর না কাউকে বলেছে, যদি তুমি ইউরোপের সামাজিকতা, আচার আচরণ অবলম্বন না করো, নিজেই অপব্যয় ও মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের অসংখ্য অগণিত খাত সৃষ্টি করে সে সবের দাবী পূরণের জন্যে সুদ, ঘুষ, জুয়ার মাধ্যমে হারাম অর্থ উপার্জন না করো, তাহলে তোমাকে জীবিত থাকতে দেয়া হবে না।

নিজের মনকে কিছুটা পরীক্ষা করে দেখুন। দেখবেন, আমাদের অন্তরে সময়ের দাবীর এ জিগির শয়তানই সৃষ্টি করেছে। আমরা খামাখাই সময় বেচারার ওপর অপবাদ আরোপ করেছি। আজও দুনিয়ায় কেটি কোটি মানুষ রয়েছে, যারা এ সব বিষয় থেকে দূরে এবং বিংশ শতাব্দীর এ সময়কালে জীবিত রয়েছেন। শুধু যে জীবিত রয়েছেন তাই নয়; বরং বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখলে সর্বদিক থেকে সময়ের দাবী পূজারীদের জীবনের চেয়ে তাদের জীবন অতি বেশী শান্তি স্বস্তিপূর্ণও বটে।

চিন্তার বিষয়

(প্রায় ৭০ বছর আগের লেখা একটি প্রতিবেদন)

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এসব কিছুই সময়ের দাবী, যা এখানে আলোচিত হয়েছে, ভালো হোক কি মন্দ, কিন্তু দুনিয়ার বৃহদাংশ মানুষের সেসব দাবী পূরণ করে চলেছে। আজকের ইউরোপ, আমেরিকা, যারা বর্তমান সভ্যতা নামক অসভ্যতার আবিষ্কারক, কমপক্ষে তারা তো এ সব কাজে পুরোপুরি লেগে আছে। আর আমাদের সাধারণ লেখাপড়া জানা লোকেরাও যথাসম্ভব তাদের অনুকরণে কোনো প্রকার ত্রুটি করে না। সাথে সাথে আইনের মাধ্যমে দুনিয়ায় শান্তি স্বস্তি, নিরাপত্তা, অপরাধ নির্মূলকরণের উদ্দেশে যেসব নিত্য নতুন পন্থা পদ্ধতি ইতিপূর্বে চিন্তাও করা যেতো না, তাও আজ দুনিয়াময় প্রচলিত রয়েছে। আইনী মিশন সফল করার জন্যে শয়ে শয়ে সংস্থা, দপ্তর অধিদপ্তর কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে কাজ করে চলেছে। মানুষের দৈহিক সুস্থতার জন্যে আজকাল যে নানাবিধ ওষুধ দাওয়াই, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং হাসপাতাল, চিকিৎসালয় ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের যে আধিক্য, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এসবের কোনো কল্পনাও কারো মনে উদিত হয়নি। জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী সুলভ করার জন্য যতো মিল কারখানা, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি এবং বীজ ও সারের যে নন নব অভিজ্ঞতা আজ কাজে লাগানো হচ্ছে, পঞ্চাশ বছর আগে এসবের অস্তিত্বও ছিলো না। আধুনিক বিজ্ঞান এখন ভূপৃষ্ঠ থেকে অবসর হয়ে আকাশ পানে ছুটে চলেছে এবং শূন্যমন্ডলে ভ্রমণ পর্যটনের পথ ধরেছে।

www.nagorikpathagar.org

সারকথা হচ্ছে, ভোর রাতের আলোর ধোকা, যাকে উন্নতি নামে অভিহিত করা হচ্ছে, তা নিজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মপরিকল্পনা এবং উপায় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সহকারে আজ পূর্ণ যৌবন ও উন্নতির শিখরে উপনীত হয়েছে। নিসন্দেহে আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর কৃতিত্ব মানুষের মেধা ও মস্তিষ্ককে জাদুর মোহগ্রস্ত করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু জ্ঞানী অন্তর্দৃষ্টির অধিকারীদের জন্যে এখানে চিন্তাযোগ্য বিষয় হলো, ভূপৃষ্ঠ আর আকাশ এক সংগে একাকার করে, আইন এবং যন্ত্রপাতির চূড়ান্ত সীমার উন্নতিতে উপনীত হওয়ার পরিণামে মানুষ এবং মানবতা কি পেয়েছে? এখানে ব্যক্তিবিশেষ বা বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর আলোচনা নয়, সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে এক সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে, আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতিতে তাদের জীবনের কোনো এক শাখায় এ পর্যন্ত স্বস্তি লাভ করা হয়েছে কিনা, নাকি প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সস্তা এবং তার অর্জন সহজ হয়েছে? মানুষের রোগব্যাধি কি কিছুমাত্র কমেছে? অথবা আরোগ্য লাভকারীদের সংখ্যা কি বেড়েছে? অপরাধবৃত্তি কি বন্ধ হয়েছে? হত্যা, ধ্বংস কি কমেছে? অফিস আদালতসমূহে কি ঘুষের বাজারে মন্দা পড়েছে? বিচারালয় থেকে ন্যায়বিচারপ্রাপ্তি কি মানুষের জন্যে সহজ সুলভ হয়ে গেছে? না পৃথিবীর যে অংশে আধুনিক পদ্ধতির রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার কোথাও শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং ঘটনাবলীই নিজের ভাষায় উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের জবাব দেবে। আর এ নয় যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং ঘটনাবলী প্রত্যেকটি প্রশ্নের নেতিবাচক জবাব দেবে; বরং তাদের ডেকে বলবে–

'যতোই ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ছে রোগ যেন ততোই বেড়ে চলেছে।'

এখন ভেবে দেখুন, সময়ের দাবী কি এটাই যে, বিশ্বে শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব মানবকে শান্তি স্বস্তির জীবন দান করতে যেসব পন্থা পদ্ধতি, উপায় উপকরণ, যন্ত্রপাতি ব্যর্থ হচ্ছে, সেসবেরই কি আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে? নাকি ভিন্ন কোনো পথ অনুসন্ধান করে নবতর কোনো অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা চলবে? জ্ঞান বিবেকের দাবী কি, আমাদের কারোই এ ব্যাপারে দ্বিমত না করে বরং ঐকমত্য হওয়া উচিত যে, আমাদের এখন ভিন্ন পথ খোজা কর্তব্য। এখন কোরআনের ভাষায় সময়ের দাবী শুনুন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

'এখনও কি সময় আসেনি যে, ঈমানদাররা আল্লাহর স্মরণ এবং তাদের প্রতি নাযিল করা সত্যের প্রতি ঝুঁকবে।'

এ আয়াতের মর্মবাণী মোতাবেক আল্লাহর ওপর ঈমান এবং আখেরাতের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস এমন বিষয়, যা মানুষকে সত্যিকার অর্থে মানুষ বানায়। যতোক্ষণ মানুষ মানুষ হবে না, ততোক্ষণ কোনো আইন, কোনো আইনী মেশিনারী দুনিয়ায় শান্তি নিরাপত্তা স্থাপনে যে সক্ষম হবে না, তা জানা কথা। কেননা, আইন কোনো স্বয়ংক্রিয় মেশিন নয়, যা নিজে নিজেই কাজ করবে। আইনী মেশিনারী তো মানুষই চালাবে। মানুষের কর্ম, চরিত্র, নৈতিকতা, মানসিকতা একবার বিনষ্ট হয়ে গেলে সব আইন

www.nagorikpathagar.org

(মেশিনারী) নিষ্ফল অকর্মণ্য হয়ে যাবে। তাছাড়া তখন আইন মুক্ত বাজারে বিক্রি হয়ে তার অপমান অপদস্থতা প্রত্যক্ষ হয়। তাই দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার একটাই মাত্র উপায় আছে এবং তা হলো, মানুষকে আল্লাহর ওপর ঈমান এবং আখেরাতের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের শিক্ষা দিতে হবে, আর তাকে আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমানের রংয়ে রঞ্জিত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। কাউকে কোনো পদ সমর্পণের জন্যে তার যেরূপ কর্মদক্ষতা দেখা হয়, তার চাইতেও বেশী দেখতে হবে তার অন্তরে আল্লাহর ওপর ঈমান ও আখেরাতের ভয় কতোটুকু আছে।

ইতিহাস সাক্ষী, যখন মানব সমাজ আল্লাহর ওপর ঈমান ও আখেরাত ভীতির ধারক বাহক হয়েছে, তখনই জগতে শান্তি স্বস্তি, নিরাপত্তা এসেছে। আর যখনই মানব সমাজ এ বৈশিষ্ট্য দুটো থেকে পিছু হটেছে, তখনই তারা নিরাপত্তাহীনতা, অশান্তি বিশৃঙ্খলা এবং আরো হাজারো বিপদ মসিবতের শিকার হয়েছে। ইউরোপ উদ্ভাবিত বিবিধ ইজম, তন্ত্রমন্ত্র এবং মতবাদের অভিজ্ঞতা মানব সমাজের ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ, কোনোটাই মানব সমাজকে শান্তি স্বস্তি নিরাপত্তা দিতে পারেনি। তাই জ্ঞানী বুদ্ধিজীবী, দূরদৃষ্টিসম্পন্নদের উদ্দেশে বলছি, ইউরোপ উদ্ভাবিত বিবিধ তন্ত্রমন্ত্র, ইজম, মতবাদের অভিজ্ঞতা তো আপনাদের হয়েই গেছে। তাই এখন জগদ্বাসীর ওপর একটু করুণা করে ইসলামী বিধানের অভিজ্ঞতাও গ্রহণ করুন। তবে শর্ত হলো, তা যেন হাতে বানানো আধুনিক ইসলামের নবতর কোনো সংস্করণ না হয়; বরং তা যেন কোরআন সুন্নাহর আসল এবং যথার্থ পথনির্দেশনার ওপর ভিত্তিশীল হয়, যা রেসালাতের যুগ থেকে অদ্যবধি ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে শুধু আইন কখনো যথেষ্ট নয়। আল্লাহর ওপর ঈমান এবং আখেরাতের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

সভ্য দেশসমূহে অপরাধের বন্যা

আধুনিক যুগের তথাকথিত সভ্য দেশসমূহের অবস্থা বর্ণনা করে কবি বলেন–

'লিখবে দুঃখ ধ্বনি জগতের ইতিহাসে, অন্ধকার হয়ে চলেছে বিজ্ঞানের আলোকে।'

বিগত দিন পর্যন্ত মুসলমানদের বিস্ময়কর উন্নতি ভিন জাতিসমূহকে স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলো যে, বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা, রাজনৈতিক শৃংখলা এবং অন্যান্য উন্নতি দ্বীন মেনে চলার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর একমাত্র দ্বীনই প্রকৃত অর্থে বিশ্ব শান্তির জিম্মাদার হতে পারে। হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর শাসনকালের সে ঘটনা এখনো ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায়নি, যখন মুসলমানদের পাথেয়শূন্য সৈন্য দল অল্প সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পংগপাল সদৃশ পারস্য বাহিনীর সংগে যুদ্ধ করে তাদের সেনাপতিকে শাহী দরবারে এ নিবেদন করতে বাধ্য করেছে–

আমরা এমন দলের বিরুদ্ধে কি করে সফল হতে পারি? তাদের প্রতিটি সৈন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধের ময়দানে নিজেকে বিলিয়ে

www.nagorikpathagar.org

দেয়। সন্ধ্যা নামতেই তারা কোনো নরম বিছানা এবং আরাম শয্যার পরিবর্তে রাত অতিবাহিত করে নামাযের মোসাল্লায়। যখন আমাদের সৈন্যরা ঘুমের ঘোরে অচেতন হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই বেখবর হয়ে পড়ে, তখন তাদের আনুগত্যের শির প্রভু পরোয়ারদেগারের সামনে যমীনে রাখা থাকে এবং তারা কেঁদে কেঁদে বিশ্ব অধিপতিকে সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত ডাকতে থাকে। কবির ভাষায়–

'যখন বিশ্ব নিদ্রিত, তখন আমরা কাঁদি, কলিজায় এক ধরনের ব্যথা ওঠে
আর অন্তরে থাকে ব্যথা বেদনার মতো আরো কিছু।'

এ বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে মুসলমান যেদিকেই আগুয়ান হয়েছে আল্লাহর কুদরত সেদিকেই তাদের সংগে ছিলো। অমুসলিমদের কাছেও মুসলমানদের বিস্ময়কর উন্নতির নিগূঢ় রহস্য ছিলো তাদের ইসলাম এবং ইসলামের আনুগত্য অনুসরণ। মুসলমানদের তো এ বিশ্বাস ছিলোই যে, একমাত্র দ্বীন ইসলামই আমাদের চূড়ান্ত উন্নতির মাধ্যম হতে পারে।

হযরত ওমর (রা.) তার এক প্রাদেশিক গভর্নরকে উপরোক্ত বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশে যা লিখেছিলেন, তা সব সময়ের জন্যে প্রত্যেক মুসলিম শাসকের দৃষ্টির সম্মুখে ও অন্তরে অংকিত করে রাখার যোগ্য এবং তাই মুসলমানদের ইহজাগতিক কল্যাণ ও সফলতার জামিনদার। হযরত ওমর (রা.) তার প্রাদেশিক গভর্নরকে লিখেছিলেন–

তোমরা সংখ্যায় সবচেয়ে কম ছিলে, আল্লাহ তায়ালা ইসলাম দ্বারা তোমাদর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তোমরা ছিলে সবচেয়ে হীন অপদস্থ, ইসলাম দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সম্মানিত করেছেন, শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। তোমরা সবেচেয়ে নিস্ব দরিদ্র ছিলে, ইসলাম দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ধনাঢ্য করেছেন।

অতপর তিনি গভর্নরকে বললেন, আজ যদি তোমরা ইসলাম এবং ইসলামের বিধি বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তোমরা পুনরায় সে গর্তেই নিপতিত হবে যেখানে আগে তোমরা ছিলে।

কর্ম এবং ভাগ্য গুণে আজ আমাদের সেদিনও দেখতে হয়েছে। এখন মুসলমানদের সম্মান মর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তি নিশেষ হয়ে গেছে। তাদের নৈতিক চরিত্র, এলমী আমলী অবস্থা বরবাদ বিনষ্ট হয়ে গেছে। অথচ তারা অবচেতন ঘুমের ঘোরে আরাম আয়েশ আস্বাদন করে চলেছে। যখন তাদের চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে তখন রোগকেই ওষুধ ভেবে উল্টো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করেছে এবং দ্বীনের টুঁটি চেপে ধরে দ্বীনের সব স্মারক নিশ্চিহ্ন করাকেই উন্নতির সর্বপ্রথম পর্যায় বলে বুঝেছে। দুঃখ অনুশোচনার অন্ত থাকে না যখন দেখতে পাই, মুসলিম জাতির সর্বশেষ আশ্রয়স্থল এবং তাদের কোনো রকমে টিকে থাকা রাষ্ট্রশক্তিসমূহ, যাদের কর্মতৎপরতা মুসলমানদের ভাগ্যের জন্যে সিদ্ধান্তকর মনে করা হয়, তারা যখন উন্নতির ময়দানে কদম রাখার ইচ্ছা করে, তখন সর্বপ্রথম যে বস্তুকে উন্নতির পথের প্রধান কন্টক মনে করে তাকে অপসারিত করা হয়, তা হচ্ছে দ্বীন এবং দ্বীনের চিহ্নসমূহ। আহা, পূর্বসূরিদের পদাংক

www.nagorikpathagar.org

অনুসরণে, তাদের আনুগত্যে উন্নতির নিদর্শন যদি এদের দৃষ্টিতে নাও আসে, উন্নতির জন্যে যদি তাদের একান্তই ইউরোপের দরজায়ই মাথা ঠোকার প্রয়োজন ছিলো, তাহলে তারা যদি পুরোপুরি ইউরোপেরই অনুসরণ করতো, ইউরোপের মতো যুদ্ধবিদ্যা শেখা ও যুদ্ধাস্ত্র বানানোর যোগ্যতা অর্জন করতো, নিজের দেশের শিল্প কারখানা, ব্যবসায় বাণিজ্য, আবিষ্কার উদ্ভাবন ও কৃষির উন্নতির জন্যে ইউরোপেরই অনুকরণ করতো, তাহলেও তো বৈষয়িক উন্নতি হতো। আর এসব কিছু অর্জন করে বিশেষ আরাম আয়েশ, ফ্যাশন জুতা, পোশাক আশাক, সভ্যতা সংস্কৃতি এবং দ্বীন ধর্ম পরিহারেও যদি ইউরোপের অনুকরণ অনুসরণ করতো, তবে হয়তো একটা সীমা পর্যন্ত তাদের অক্ষম ভাবা যেতো, কিন্তু আমাদের দেশে তো উন্নতির সূচনাই মনে হয় দ্বীন ধর্ম পরিহার করে। তাদের মতে উন্নতির মর্মকথা শুধু ফ্যাশন এবং ইউরোপীয় পোশাক আশাক ও বিলাসিতার পূজা অর্চনার মাঝেই সীমাবদ্ধ।

যদি কেউ এসব কল্পিত উন্নত লোকদের জিজ্ঞেস করতো, ইংরেজদের মতো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব না করলে তোমাদের উন্নতির কোন্ দুর্গটা বিজয়ের বাইরে থেকে যেতো। ইংরেজী হ্যাট বুট, ছুরি, কাঁটা ব্যবহারের ওপর জগতের কোন্ উন্নতিটা নির্ভরশীল। ইউরোপের নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, উলংগপনা অবলম্বন না করলে মুসলমানদের জাতীয় উন্নতিতে কোন্ ঘাটতিটা অবশিষ্ট থেকে যেতো। রাণী সুরাইয়ার অর্ধ উলংগ ছবি যদি সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ না করা হতো তবে মুসলিম জাতীয়তা এবং জাতীয় উন্নতিতে কোন্ ধাক্কাটা লাগতো, কেন আজ অর্ধ উলংগ হয়ে মুসলিম রমণীকুলের মাঝে লিজ্জতা এবং পর্দাহীনতার সর্বপ্লাবী তুফান বইয়ে দেয়া হয়েছে? সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ অর্ধ উলংগ ছবি সম্পর্কে আমি বলতে পারছি না, বাস্তবের সাথে এর সম্পর্ক কতোটুকু। সত্য কথা হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের দুর্ভাগ্যের দিন এসে গেলে তাদের জ্ঞান বিবেক অন্ধ হয়ে যায়। *(এখানে ৭০ বছর আগের একটি ঘটনার প্রতি ইংগীত দেয়া হয়েছে)*

যেসব ভদ্র মহোদয় দ্বীন ধর্মকেই উন্নতির পথে জগদ্দল পাথর ভাবেন, দ্বীন ধর্মকে বিদায় জানানোর ওপরই সকল রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণতা নির্ভরশীল মনে করেন, আমি এখন সেসব ভদ্র মহোদয়ের সামনে উন্নত সভ্য বলে কথিত দেশ ও জাতিসমূহের কিছু তুলনামূলক চিত্র বিচারের জন্যে তুলে ধরছি, যা দেখে এ ভদ্রলোকদের হয়তো দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে যে, জাগতিক ব্যবস্থাপনাও দ্বীন ধর্মের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা হতে পারে। দ্বীন ধর্ম ছেড়ে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় আইন কখনো বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

ইউরোপীয় শহরসমূহে হত্যাপরাধ

১৯২৮ সালের ১২ জুলাই লখনৌ থেকে প্রকাশিত 'সাচ' পত্রিকা চতুর্থ খণ্ডের পঞ্চবিংশতিতম সংখ্যায় খেলাফত পত্রিকার সূত্রে লেখেছে, ডঃ মুকম্যান আমেরিকার নতুন সভ্যতা সম্পর্কে নিম্নের অভিমত প্রকাশ করেছেন–

বছর বছর হত্যার যে ভীতিকর ঘটনাসমূহ দ্রুত বেড়ে চলেছে, তা আমাদের আমেরিকান সভ্যতার ওপর এক বিশ্রী কলংক। নিত্যদিন অপরাধের ধরন এতো জটিল

www.nagorikpathagar.org

ও প্যাঁচালো হয়ে চলেছে, যাতে অনুসন্ধানও মুশকিল হয়ে পড়ছে। ১৯২৭ সনে তো ভীতিজনক এমন কিছু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে যার নযির অপরাধের ইতিহাসে পাওয়া অসম্ভব। নিম্নে তেইশ বছরের অপরাধ চিত্র অংকিত হচ্ছে, যাতে সভ্য আমেরিকায় অপরাধের দ্রুত গতি সম্পর্কে জানা যাবে–

সন	শহর সংখ্যা	জনসংখ্যা	হত্যাকাণ্ড	লাখপ্রতি
১৯০০	৩১	১১৯৮১০৩৪	৬০৯	৫/১
১৯০৫	৩১	১৪০২৪৪২২	৬৬০	৬/৬
১৯১০	৩১	১৬৮৭৩২২৩	১২৬৫	৮/১
১৯১৫	৩১	১৮৭২২৭৬২	১৬১৪	৮/৬
১৯২০	২৮	২০৫৭১৮২৯৫	১৭৫৬	৮/৫
১৯২৫	২৮	২১৫৮৮২৭৪	২৩৯৭	১১/১
১৯২৬	৩০	২২৯১৩৫০০	২৩০২	১০/১
১৯২৭	৩০	২৩১৯৭৪০৩	২৩০৪	১০/১

লন্ডন থেকে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্র 'ডেইলী টেলিগ্রাফ' ৪ঠা আগস্ট সংখ্যায় আমেরিকায় হত্যাকান্ডসহ অন্যান্য অপরাধ তদন্তে গঠিত কমিশনের রিপোর্টের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখে, যে কমিশন আমেরিকার জন্যে গঠন করা হয়েছিলো, শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও লন্ডন ও ওয়েলসে বছরে স্বেচ্ছায় হত্যার সংখ্যা ঘটেছে ১৫৪। বিপরীতপক্ষে সমপরিমাণ সময়ে সমগ্র আমেরিকায় নয়; বরং আমেরিকার শুধু একটি শহর নিউইয়র্কে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা দুশ একুশে উপনীত হয়েছে।

(সাচ, লখনৌ, ১৯২৮, ১৪ সেপ্টেম্বর)

এমন শহর থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। দুই কোটি জনঅধ্যুষিত শহরে বছর পরিক্রমায় দুই হাজার তিনশ সাতানব্বইটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। সেগুলো এমন শহর, যার অধিবাসীদের নিজেদের সভ্য ও সংস্কৃতিবান বলতে লজ্জাবোধ হয় না, আর না অন্যদের জংলী বর্বর বলে অভিহিত করতে লজ্জা শরম তাদের পথে কোনো প্রকার বাধা হয়। এ যদি হয় সভ্যতা সংস্কৃতি, তবে এমন সভ্যতা সংস্কৃতিকে আমরা বিদায়ের সালাম জানাচ্ছি।

অপরদিকে ইউরোপীয়দের ভাষায় অনুন্নত অসভ্য দেশ আমাদের এ উপমহাদেশ, যেখানে আটাইশ কোটি লোকের বসবাস, এমন ঘন জনবসতির দেশেও বছরে এমন ঘটনা হাতেগোনা সংখ্যায়ই সংঘটিত হয়। প্রতি অর্ধ লক্ষে নিশ্চিতরূপে গড়ে অর্ধ জনের হত্যাকান্ডও সংঘটিত হয় না। তাই নির্দ্বিধায় বলতে হয়, ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতি থেকে আমাদের বর্বরতা জংলীপনা হাজারো গুণে ভালো।

পুলিশ বিভাগের ব্যয় আটাইশশ' কোটি টাকা

সাথে সাথে বিস্ময়ের অবধি থাকে না, যখন আমরা দেখতে পাই, ১৯২৭ সনে, যে বছর তেইশশ' চল্লিশটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সে বছর

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকায় অপরাধ দমন বিভাগে যে অর্থ ব্যয়িত হয়েছে, তার পরিমাণ কোনো দশ বিশ কোটি টাকা নয়; বরং আটাইশশ কোটি টাকা। এর পরও আমেরিকায় পুলিশের সংখ্যা অপর্যাপ্ত বলে মনে করা হয়। তাই বর্তমানে পুলিশের সংখ্যা আরও বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। অপরদিকে ইউরোপের ভাষায়, আমাদের অসভ্য অনুন্নত এশীয় দেশসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, এসব দেশের পুলিশ বিভাগ এবং অপরাধ দমন উদ্দেশে যা ব্যয়িত হয়, তথাকথিত সভ্য দেশ আমেরিকার পুলিশ বিভাগ এবং অপরাধ দমনের উদ্দেশে ব্যয়িত অর্থের সাথে তার কোনো তুলনাই হয় না।

ওপরে আমেরিকায় সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তা কোনো বিরোধী পক্ষের অভিযোগ নয়; বরং স্বয়ং আমেরিকা অপরাধ অনুসন্ধান পর্যালোচনার জন্যে যে কমিশন গঠন করেছে, সে কমিশনেরই স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি। এটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত ডেইলী টেলিগ্রাফের ৪ঠা আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়ে আমাদের এ উপমহাদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অপরাধের তুলনা অপরাধের সাথে এবং কথিত বিভাগের জন্য ব্যয়িত অর্থের তুলনা করা হলে আমরা দেখতে পাই, যে পুলিশ বিভাগের জন্যে বছরে আটাইশশ' কোটি টাকা ব্যয় হয়, তাদের অধীনে আমেরিকার মতো একটি সভ্য শিক্ষিত দেশে বছরে তেইশশ চল্লিশটি স্বেচ্ছা হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। এর পাশাপাশি উপমহাদেশের মতো একটি অশিক্ষিত এবং ইউরোপীয়দের ভাষায় বর্বর জংলী দেশে না পুলিশের যথারীতি কোনো ব্যবস্থা আছে, আর না এখানকার পুলিশ বিভাগের জন্য আমেরিকার তুলনায় উল্লেখ করার মতো অর্থ ব্যয় হয়। এতদসত্ত্বেও এখানে আমেরিকার তুলনায় অপরাধ বলতে গেলে শূন্যের কোটায়। এ অবস্থায় একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয় যে, সভ্য বলে কথিত দেশসমূহ এবং আমাদের দেশের মাঝে অপরাধ চিত্রের এ বিরাট পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, এখনও আমাদের দেশে দ্বীন ধর্মের কিছু না কিছু প্রাণ অবশিষ্ট রয়েছে। পক্ষান্তরে ইউরোপ এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। আর দ্বীন ধর্মই একমাত্র পন্থা, যা পুলিশের পর্যবেক্ষণ সংরক্ষণ ব্যতীতই মানুষকে অপরাধ সংঘটন থেকে বিরত রাখতে পারে।

ব্যভিচার বেহায়াপনা

বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থা, সভ্যতা, আইন বিধান ও শাসনব্যবস্থার কল্যাণ কাঠামো নিচের চিত্র থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। এ হিসাব বৃটেনের শুধু এক বছরের।

বেহায়াপনার অপরাধে গ্রেফতার হয় ৩২৫ জন এবং তাদের মধ্যে ২৫৮ জন শাস্তিপ্রাপ্ত। অপরাধে সাহায্যকারী গ্রেফতার হয় ৩৬ জন এবং প্রত্যেকেই শাস্তিপ্রাপ্ত। দালালী করতে গিয়ে গ্রেফতার হয় ২ জন। যারা উভয়ই শাস্তিপ্রাপ্ত।

এখানে স্মরণ রাখা দরকার, বৃটিশ আইন যে ব্যভিচারকে অবৈধ শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করেছে, তা কিন্তু সাধারণ ব্যভিচার নয়; বৃটিশ আইনে ব্যভিচারের বিশেষ একটি ধরণই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটি হচ্ছে, জোরপূর্বক ব্যভিচার বা ধর্ষণ। নয় তো সাধারণ ব্যভিচার ইউরোপীয় শরীয়ত বিধানে সভ্যতা সংস্কৃতির এক মহা গুরুত্বপূর্ণ

www.nagorikpathagar.org

স্তম্ভ। লন্ডনের একটি প্রসিদ্ধ পার্ক হাইড পার্ক। তাতে সংঘটিত বিবিধ অপরাধের যে সংখ্যা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১৯২৮ সনের ৩১ মার্চ পার্লামেন্টে উপস্থাপন করেছেন, বছরওয়ারী তার হিসাব নিম্নরূপ ঃ

ধর্ষণের দায়ে গ্রেফতার হয় ১ জন এবং সে শাস্তিপ্রাপ্ত। অপমানমূলক অপরাধে গ্রেফতার হয় ৫৬ জন, এর মধ্যে ৪০ জন শাস্তিপ্রাপ্ত। অপরাধমূলক হামলার দায়ে গ্রেফতার হয় ২ জন এবং এতে কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি।

ওপরে যে অপরাধচিত্র পেশ করা হয়েছে তা কোনো গোপন জায়গা কিংবা, গুন্ডা বদমাশদের আড্ডাখানায় অথবা কোনো পাতালপুরীতে সংঘটিত হয়নি; বরং তা সংঘটিত হয়েছে খোলামেলা বিনোদন ক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষের সম্মিলন স্থলে, এসব জায়গায় তো সাধারণত সর্বদাই পুলিশ পাহারা থাকে।

অপরদিকে আমরা যদি সেসব দেশের অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করি, যেসব দেশে দ্বীন ধর্মের কিছু নিদর্শন এখনও অবশিষ্ট রয়েছে, তবে সেসব দেশকে আমরা ইউরোপীয় তথাকথিত সভ্য সংস্কৃতিবান দেশসমূহের তুলনায় বহুলাংশে নিরাপদই দেখতে পাই। ধীরে ধীরে সেসব দেশ থেকে দ্বীন ধর্মের প্রাণ যতোই বের হয়ে যাচ্ছে, ততোই সেসব দেশে দিন দিন অপরাধবৃত্তি বেড়ে চলেছে।

হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফত আমলের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। হযরত ওমর (রা.) অভ্যাস মোতাবেক এক রাতে জনসাধারণের খোজ খবর জানার জন্যে ঘুরছিলেন। এক গলিতে এসে তিনি হঠাৎ করে শুনতে পেলেন, এক ঘরের ভেতর থেকে কিছু কবিতা আবৃত্তির আওয়ায ভেসে আসছে। অভিনিবেশ সহকারে শুনে তিনি বুঝলেন, এক মহিলা এ কবিতা আবৃত্তি করছে–

'আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহর আযাবের ভয় না থাকতো, তা হলে যৌবনের কামনা বাসনা পুরণে এ পালংকের কাঠও হেলিয়ে দেয়া হতো।'

এ কবিতা আবৃত্তি শুনে হযরত ওমর (রা.) বাড়ীর ভেতরে অবস্থিত মেয়েলোকটি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করলেন। অনুসন্ধানে জানা গেলো, এ বাড়ীটি একজন সৈনিকের। সে দীর্ঘ দিন থেকে জেহাদে রয়েছে। বাড়ীতে তার স্ত্রী একা অবস্থান করছে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে এ মেয়েলোকটি নিজের সতীত্ব বজায় রেখে সময় অতিবাহিত করছে। খলীফা হযরত ওমর (রা.) তখনই সরকারী আদেশ জারি করলেন, কোনো সৈনিক চার মাসের অধিক সময় বাড়ী থেকে দূরে থাকতে পারবে না। *(তারীখুল খোলাফা)*

আপনি বলুন, এ ঘটনায় কোন্ পুলিশ মেয়েলোকটির হেফাযত করছিলো! যৌবনের কামনার কাছে পরাভূত এ মেয়েটির রাতের নীরব নিকষ অন্ধকারে কার ভয় ছিলো! এ প্রশ্নের জবাব সুনির্দিষ্ট। এ হচ্ছে শুধু দ্বীন এবং দ্বীনী শিক্ষার প্রভাব। তাই মেয়েটিকে মহা অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো। যেসব দেশে দ্বীন ধর্মের কিছু প্রভাব এখনো অবশিষ্ট রয়েছে, সেসব দেশে আজও এ ধরনের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। এ সব ঘটনা এবং অবস্থার পরেও কি আমাদের শিক্ষিত সুধীজন দ্বীন ধর্মকে

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক ব্যবস্থাপন এবং উন্নতি সমৃদ্ধির পথে বাধাই বলে চলবেন। কোরআনের ভাষায়–

'সেসব লোকের কি হলো, এরা কথা বুঝার কাছেও যায় না।'

(সূরা আন নেসা, আয়াত ৭৮)

প্রবন্ধের উপসংহার

এ প্রবন্ধ আমি চৌত্রিশ বছর আগে ভারত বিভাগের পূর্বে লিখেছি। যখন ইংরেজরা পরিপূর্ণ দাপটে এ উপমহাদেশে তখন রাজত্ব করছিলো। এ সময় খেলাফত কমিটি ও কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রায় মৃত হয়ে পড়েছিলো। কোনো ইসলামী রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভের দূরতম সম্ভাবনাও কারো চিন্তার ধারে কাছে ছিলো না। সে সময় দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আনসার' পত্রিকার ১৯২৮ সনের ৮ অক্টোবর সংখ্যায় এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

ঘটনাক্রমে পুরাতন পেপার কাটিং সামনে পড়ে গেলে এ প্রবন্ধটিকেও এ পুস্তকের সাথে জুড়ে দেয়ার আগ্রহ জাগে। সাথে সাথে আজ থেকে চৌত্রিশ বছর আগের সময় এবং বর্তমান সময়ের একটা তুলনামূলক চিত্রও দৃষ্টির সম্মুখে এসে হাযির হয়। চুরি ডাকাতি, ধোকা প্রতারণা প্রবঞ্চনা, হত্যা, লুটতরাজ, যেনা ব্যভিচার, অশ্লীলতা বেহায়াপনা, উলংগপনার যে সংখ্যা এখন আমাদের সামনে আসছে, সেসবের হিসাব সামনে রাখলে চৌত্রিশ বছর পূর্বে উদ্ধৃত সংখ্যা কোনো গুরুত্বই ধারণ করে না।

যে বিষয়টি মনের ওপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে, তা হচ্ছে যুগের কৌতুকপূর্ণ যুলুম। ইংরেজ শাসনামলে আমরা ভাবতাম, এসব অনিষ্ট অপয়া ইংরেজের আনীত। ইংরেজ চলে গেলে সাথে সাথে এসব কিছুও ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। তাই মানুষ কোনো ছিদ্রপথে স্বাধীনতার কিরণচ্ছটা দেখতে পেলেই তা অর্জনের জন্য দৌড়াতো এবং এ জন্যে বিভিন্নমুখী চেষ্টা প্রচেষ্টা চালাতো। এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের এ আকাংখাও তো পূর্ণ করেছেন। ইংরেজের কবল থেকে তারা মুক্ত স্বাধীন হয়েছে এবং পাকিস্তান নামক একটি ইসলামী রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করেছে। সাথে সাথে এ রাষ্ট্রের কল্যাণ মংগল, শান্তি স্বস্তি ও নিরাপত্তা অন্যদের অধীনতা থেকে মুক্তি, ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী সামাজিকতা, কর্মতৎপরতা দৃষ্টির সামনে ঘুরতে থাকে, যা ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করা হলে অর্জিত হওয়া হয়তো সুনিশ্চিত, কিন্তু বিগত পনেরো বছরে চক্ষু যা অবলোকন করছে তা নিম্নের কবিতার বিষয়বস্তুর চেয়ে বেশী কিছু নয়।

কার জানা ছিলো, ইংরেজ চলে যাবে আর লর্ড মেকলের শিক্ষায় রঞ্জিত এ কালো ইংরেজরা আমাদের ওপর এমনি ঝেঁকে বসবে। যারা ইংরেজদের থেকে শুধু তাদের মন্দ অনিষ্টকর বিষয়সমূহ– যেমন বিলাসিতা, অশ্লীলতা, মদ্যপান প্রভৃতিই আত্মস্থ করেছে। শ্বেতকায় ইংরেজরা তো বুঝে শুনে কোনো কাজ করতো, কিন্তু আমাদের ওপর ঝেঁকে বসা কৃষ্ণকায় ইংরেজদের চিন্তা করার মতো মেধা মনন এবং বুঝার মতো আক্কেল বুদ্ধিও শ্বেতকায় ইংরেজদের মতো নেই। তাদের মতে, শ্বেতকায় ইংরেজরা যা কিছু করে গেছে বিনা বাক্যব্যয়ে সেসবের অনুকরণই হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞান আর কর্ম

www.nagorikpathagar.org

কৌশল। যেখানে কালো ইংরেজদের সাদা ইংরেজের অনুকরণে ইসলাম আড়াল হয়, সেখানে ইসলামের প্রশস্ততা উদারতা, শোনা শব্দসমূহের দোহাই পেড়ে আধুনিক ইসলামের এমন এক ঢিলেঢালা অবয়ব দাঁড় করায়, যাতে সাদা ইংরেজের যাবতীয় বদমাশী অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, অনৈতিকতা ইত্যাদি পুরোপুরি খাপ খায়। এ জন্য সভ্যতা সংস্কৃতি ও রিচার্সের নামে 'মেকলের' শিক্ষাব্যবস্থার ছাঁচে ঢালাই করা মস্তিষ্কসমূহকে বসিয়ে দেয়া হয়, যারা ইসলাম শুধু ইংরেজদের ভাষায় শুনেছে এবং ইংরেজেদের চোখেই দেখেছে। ওলামায়ে কেরাম যদি এ কৃষ্ণকায় ইংরেজদের ভ্রান্তি সম্পর্কে কিছু বলেন, তখন তাদের ইসলামের নিজেদের সংস্করণ গ্রহণ এবং যাবতীয় পাপাচার বৈধ বলে সাব্যস্ত করার উপদেশ দেয়া হয়। এরই নাম দেয়া হয় সময়ের দাবী, সময় জ্ঞান।

আলেম সমাজের জন্য মূল্যবান পথনির্দেশ

১৩৩৬ হিজরী সনে আমি যখন দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ছাত্র জীবন সমাপ্ত করি, তখন কাঠিয়াওয়াড় শহরের দেরাবল নামক স্থানের এক আরবী মাদরাসায় শিক্ষকতার জন্য আমাকে ডাকা হয়, কিন্তু আমার অনুগ্রাহী মুরব্বী, দারুল উলূম দেওবন্দের মোহতামেম হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব আমাকে দারুল উলূমেই শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশে ফিরিয়ে রাখেন। আমি কাঠিয়াওয়াড়ের দেরাবলে গমনের সিদ্ধান্ত নিয়ে সম্মানিত ওস্তাদ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.)-এর অনুমতি প্রার্থনা করি। আমি তাকে বলি, এ পর্যন্ত ওস্তাদমণ্ডলীর স্নেহছায়ায় ছিলাম, কোনো দায়িত্বও ছিলো না। এখন এমন এক জায়গায় যেতে হচ্ছে, যেখানে এমন কোনো মুরব্বী জনও থাকবেন না, কোনো জটিল বিষয়ে সম্মুখীন হলে যার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে। এ কথার জবাবে সম্মানিত ওস্তাদ বললেন, আমি তোমাকে প্রত্যেকটি বিষয়ের কয়েকটি কেতাবের নাম বলে দিচ্ছি, সেগুলো অধ্যয়ন করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ সব জটিলতারই সমাধান হবে।

এটা জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সেই অতলান্ত সমুদ্রের পক্ষেই সাজে; যার দৃষ্টি জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার সব গ্রন্থের ওপর ব্যাপ্ত। তার মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত স্মরণশক্তির এমন এক ভাণ্ডার ছিলো, তাতে তিনি যাই পড়তেন তাই রক্ষিত হয়ে যেতো। আমি সম্মানিত ওস্তাদের মজলিস থেকে থেকে উঠে এসেই যা যা স্মরণে ছিলো লিপিবদ্ধ করে রাখি। এখন এলেমপ্রিয় ভাইদের জন্যে তা উপস্থাপন করছি।

হাদীস শাস্ত্রে – বোখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারী।

ফেকাহ শাস্ত্রে – বাদায়েউস সানায়ে এবং হেদায়া।

ফেকাহর মূলনীতি শাস্ত্রে – ইবনে হুমাম রচিত তাহরীরুল উসূল এবং তার সারসংক্ষেপ।

এলমে মায়ানী ও বাদায়ে (শব্দার্থ ও শব্দের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য জ্ঞান)–এর জন্যে বাহাউদ্দীন রচিত তালখীসুল মেফতাহের ব্যাখ্যা।

নাহু (বাক্য প্রকরণ) শাস্ত্রে – এশমূনী।

মানতেক (তর্ক) শাস্ত্রে – শরহে সোল্লাম বাহরুল উলূম।

www.nagorikpathagar.org

জান্নাত জাহান্নামের অবস্থান

তাফসীরে খাযেন প্রভৃতি গ্রন্থে– 'আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়াল আরদু' আয়াতের তাফসীরে হযরত কাতাদা (রা.) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, জান্নাত সপ্তাকাশের ওপরে আর জাহান্নাম যমীনের সপ্তস্তরের নিচে অবস্থিত।

বাবা মাকে সৎকাজের আদেশ দান পদ্ধতি

ফেকাহ শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ আল এহতেসাবে বলা হয়েছে, যদিও বাবা মায়ের সম্মান মর্যাদা রক্ষা সন্তানের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব, কিন্তু তারা যদি কোনো অবৈধ কাজে লিপ্ত থাকেন, তবে যথার্থ নিয়মে বিনম্রভাবে সঠিক কথা বলা বাবা মায়ের সম্মান মর্যাদার পরিপন্থী নয়; বরং তা বলাই তাদের যথার্থ কল্যাণ কামনা। সম্মান মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রেখে একবার তাদের ভুল সম্পর্কে অবহিত করার পরও যদি তারা সে কাজ পুনরায় করে, তবে তাদের পেছনে পড়ে মনোকষ্টের কারণ সৃষ্টি করবে না; বরং নীরবতা অবলম্বন করে আল্লাহর দরবারে তাদের জন্যে দোয়া করতে থাকবে, যেনো আল্লাহ তায়ালা তাদের সহীহ পথের দিশা এবং নেক আমলের তাওফীক দেন।

গোনাহের আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ নিজের কাছে রাখা

শায়খ আবু ইসহাক এসফারায়েনীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মোহাযযাবে' রয়েছে, যে গ্রন্থে ঈমান ইসলাম বিরোধী বিষয়বস্তু রয়েছে এবং তা দ্বারা গোনাহকে সুন্দর করে দেখিয়ে তার প্রতি মানুষদের উৎসাহিত করা হয়, সেসব গ্রন্থ নিজের সংগ্রহে রাখা এবং অধ্যয়ন উভয়ই গোনাহ।

যাদুল মায়াদ গ্রন্থে আল্লামা ইবনে কাইয়েম (র.) বলেন, যেসব গ্রন্থ কুফুর ও শেরেকের আলোচনা সম্বলিত, সেগুলোর বেচাকেনাও জায়েয নয়। অবশ্য কেউ যদি কুফুর ও শেরেকের আলোচ্য বিষয় খন্ডনের উদ্দেশে এ ধরনের গ্রন্থ নিজের সংগ্রহে রাখে এবং অধ্যয়ন করে, তা হলে বিশেষ প্রয়োজনের কারণে তাতে কোনো দোষ নেই।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র.)-এর সত্য ভাষণ

হযরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র.) নিজের আত্মজীবনী 'তাযকেরা'য় লেখেন– সত্যপন্থী ও মধ্যপন্থীদের নিয়ম হলো, তারা পূর্বসূরি ইমামদের সবাইকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করেন। তাদের সবার প্রতি সম্মান এবং ব্যাপক সুধারণা পোষণকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতভুক্ত হওয়ার নিদর্শন বলে বিশ্বাস করেন। তাদের সম্পর্কে এ বিশ্বাসও পোষণ করে যে, তাদের আমল কেতাব (কোরআন) ও সুন্নাহ অনুযায়ী ছিলো, তাদের মাঝে এমন কেউ নেই যিনি কোনো দলীল প্রমাণ ব্যতিরেকে গবেষণা পরিচালনা করেছেন। অবশ্য নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টা শুধু আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্যই নির্দিষ্ট।

ইসলামের ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা—
মুসলমানদের প্রত্যেক ষষ্ঠ শাসক অপসারিত বা নিহত হন

হযরত আল্লামা কামালুদ্দীন দামিরী (র.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'হায়াতুল হায়ওয়ানে' ইসলামের ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তা হলো,

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানদের প্রত্যেক ষষ্ঠ শাসক অপসারিত অথবা নিহত হয়েছেন। অতপর নিজের কথা প্রমাণ করার উদ্দেশে তিনি কয়েক শতাব্দীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। আমরা এখানে হযরত আল্লামা কামালুদ্দীন দামিরীর আলোচনার সারসংক্ষেপ পাঠকদের জন্যে উপস্থাপন করছি। মুসলমানদের খেলাফতের অনুক্রম নিম্নরূপ–

১. মুসলমানদের সর্বপ্রথম আমীর বা শাসক ছিলেন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

২. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), ৩. হযরত ওমর (রা.), ৪. হযরত ওসমান (রা.), ৫. হযরত আলী বিন আবী তালেব (রা.)।

হযরত আলী (রা.)-এর পর হযরত হাসান বিন আলী (রা.) ষষ্ঠ খলীফা নির্বাচিত হন এবং কিছুদিন পর তিনি অপসারিত হন। এর পর থেকে খেলাফতের অনুক্রম নিম্নরূপ–

১. হযরত মোয়াবিয়া বিন আবী সুফিয়ান (রা.), ২. ইয়াযীদ বিন মোয়াবিয়া, ৩. মোয়াবিয়া বিন ইয়াযীদ, ৪. মারওয়ান বিন হাকাম, ৫. আবদুল মালেক বিন মারওয়ান, ৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়র (রা.)– তিনি ছিলেন ষষ্ঠ খলীফা, তিনি নিহত হন। এর পর খেলাফতের ধারা নিম্নরূপ–

১. ওয়ালীদ বিন আবদুল মালেক, ২. সোলায়মান বিন আবদুল মালেক, ৩. হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.), ৪. ইয়াযীদ বিন আবদুল মালেক, ৫. হেশাম বিন আবদুল মালেক, ৬. ওয়ালীদ বিন ইয়াযীদ বিন আবদুল মালেক। তিনি ছিলেন ষষ্ঠ শাসক, তাকে পদচ্যুত করা হয়। এরপর,

১. ইয়াযীদ বিন ওয়ালীদ বিন আবদুল মালেক, ২. ইবরাহীম বিন ওয়ালীদ, ৩. মারওয়ানা বিন মোহাম্মদ।

এখানে এসে উমাইয়া কেলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে। ত্যাই ঐতিহাসিক মূলনীতি তথা মুসলমানদের প্রত্যেক ষষ্ঠ শাসক পদচ্যুত বা নিহত হওয়ার কার্যক্রম এখানে আর প্রকাশ পায়নি। ইয়াযীদ বিন ওয়ালীদের পর বনু উমাইয়ার মাত্র তিন জন খলীফা খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন। এরপর আব্বাসী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। বিস্ময়করভাবে তাতেও উল্লিখিত মূলনীতিটি কায়েম থাকে।

আব্বাসী খেলাফত

১. আবুল আব্বাস সাফফাহ, ২. আবু জাফর মনসূর, ৩. মুহাম্মদ মাহদী, ৪. মূসা আল-হাদী, ৫. হারূনুর রশীদ, ৬. আমীন বিন হারূনুর রশীদ। ষষ্ঠ খলীফা আমীন মামুনুর রশীদ বিন হারূনুর রশীদ কর্তৃক অপসারিত ও নিহত হন। এর পর খেলাফতের ধারা নিম্নরূপ–

১. মামুনুর রশীদ, ২. ইবরাহীম আল মোতাসেম বিল্লাহ, ৩. ওয়াসেক বিল্লাহ, ৪. জাফর আল মোতাওয়াক্কেল বিল্লাহ, ৫. মোহাম্মদ আল মোনতাসের বিল্লাহ, ৬. আহমদ আল মোস্তায়ীন বিল্লাহ। তিনি পদচ্যুত ও নিহত হন।

www.nagorikpathagar.org

এরপর,

১. মোহাম্মদ আল মুতায বিল্লাহ, ২. জাফর আল মোহতাদী বিল্লাহ, ৩. আহমদ আল মোতামেদ আলাল্লাহ, ৪. আহমদ আল মোতাযেদ বিল্লাহ, ৫. আল মোকতাফী বিল্লাহ ৬। জাফর আল মোকতাদের বিল্লাহ। তাকে দুবার পদচ্যুত করা হয়।

এরপর যারা খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন। তারা হলেন–

১. আবদুল্লাহ বিন মোতায আল মোরতাযা বিল্লাহ, ২. মোহাম্মদ আল কাসের বিল্লাহ, ৩. আহমদ আর রাযী বিল্লাহ, ৪. ইবরাহীম আল মোত্তাকী বিল্লাহ, ৫. আবদুল্লাহ আল মোকতাফী বিল্লাহ বিন আল মোকতাফী, ৬. আবুল ফযল আল মুতী বিল্লাহ। তিনি পদচ্যুত হন।

পরবর্তি খেলাফতের ধারা–

১. আহমদ আল কাদের বিল্লাহ, ২. আবদুল্লাহ আল-কায়েম বে আমরিল্লাহ, ৩. আল-মোকতাদী বি আমরিল্লাহ, ৪. মোস্তাযহের বিল্লাহ, ৫. মোস্তারশেদ বিল্লাহ, ৬. জাফর আর রাশেদ বিল্লাহ। তিনি পদচ্যুত হন।

অতপর খেলাফতের অবস্থা ছিলো নিম্নরূপ–

১. আল মোকতাযী লে আমরিল্লাহ, ২. মোস্তানজেদ বিল্লাহ, ৩. মোস্তাযী বিনূরিল্লাহ, ৪. নাসেরুদ্দীনিল্লাহ, ৫. আয যাহের বে আমরিল্লাহ, ৬. মোস্তাসেম বিল্লাহ। তিনি পদচ্যুত ও নিহত হন।

এরপর খেলাফতের অনুক্রম নিম্নরূপ–

১. মোস্তানসের বিল্লাহ, ২. হাকেম বে আমরিল্লাহ, ৩. মোস্তাকফী বিল্লাহ, ৪. হাকেম বে আমরিল্লাহ বিন আল মোস্তাকফী বিল্লাহ, ৫. মোতাযেদ বিল্লাহ, ৬. মোতাওয়াক্কেল আলাল্লাহ। এর পর আব্বাসী খলীফাদের সংখ্যা আর ছয় পর্যন্ত উপনীত হওয়ার সুযোগ আসেনি।

ফাতেমী খলীফাদের অবস্থা

আল্লামা দামিরী (র.) মিসরে প্রতিষ্ঠিত ফাতেমী খলীফাদের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত ঐতিহাসিক মূলনীতিটি কার্যকর থাকার কথা বলেছেন। ফাতেমী খলীফাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ–

১. মাহদ, ২. কায়েম, ৩. মনসূর, ৪. মুয়েয, ৫. আযীয, ৬. হাকেম। তিনি নিজের বোনের হাতে নিহত হন।

এরপর ফাতেমী খেলাফতের ধারা ছিলো নিম্নরূপ–

১. যাহের, ২. মোস্তানসের, ৩. মোস্তালী, ৪. আমের, ৫. হাফেয, ৬. যাফের। তিনি ছিলেন ষষ্ঠ খলীফা, তিনি পদচ্যুত হন। এরপর ১. ফায়েয ও ২। আযেদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং ফাতেমী খেলাফতের এখানেই সমাপ্তি ঘটে।

আইউবী খেলাফত

আইউবী ফলীফাদের মাঝেও ষষ্ঠ শাসক পদচ্যুত অথবা নিহত হওয়ার ইতিহাসের মূলনীতি কার্যকর থাকে। তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার অনুক্রম নিম্নরূপ–

www.nagorikpathagar.org

১. সালাহুদ্দীন আইউবী (র.), ২. আযীয, ৩. আফযাল, ৪. আল আফেলুল কবীর, ৫. কামেল, ৬. আল আদেলুস সগীর। তিনি পদচ্যুত হন। এরপর আইউবী খলীফাদের সংখ্যা আর ছয়ে উপনীত হয়নি।

তুর্কী খলীফাদের অবস্থা

আল্লামা দামিরী (র.) তুর্কী শাসকদের মাঝেও উল্লিখিত ঐতিহাসিক মূলনীতিটি বাস্তবায়িত হওয়া প্রমাণ করেছেন *(উদাহরণ হিসাবে আমরা যতোটুকু উদ্ধৃত করেছি আশাকরি তাই যথেষ্ট হবে)।*

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.)-এর উক্তি

এক লোক একবার হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র.)-কে হযরত আলী (রা.) ও হযরত মোয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন–

তা ছিলো এমন রক্ত, যা থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের তরবারিসমূহ পবিত্র রেখেছেন, এখন আমরা কেন সে রক্তে নিজেদের জিহ্বা রঞ্জিত করবো। *(হায়াতুল হায়ওয়ান, প্রথম খণ্ড)*

ইউরোপবাসীর দৃষ্টিতে ফেকাহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কেতাব হেদায়া

জনাব আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী এম.এল.এল.এম হিন্দুস্তানী একাডেমী, এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত স্বরচিত গ্রন্থ 'আংরেযী আহাদ মেঁ হিন্দুস্তান কে তামাদ্দুন কী তারিখ' গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় লেখেন–

জাদুকরী বর্ণনাশক্তির অধিকারী বক্তা, আইনবেত্তা এডমন্ড বার্ক হানাফী ফেকাহর সুপ্রসিদ্ধ সুপরিচিত গ্রন্থ 'হেদায়া'র এক সারসংক্ষেপের ফারসী অনুবাদের ইংরেজী অনুবাদ দেখে এ গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন–

এ গ্রন্থে মেধা মননের এক বিরাট শক্তি পরিলক্ষিত হয় এবং এ গ্রন্থে এমন এক আইন দর্শন বর্ণিত রয়েছে, যাতে অত্যন্ত সূক্ষ্মতা দেখতে পাওয়া যায়।

হেদায়া গ্রন্থের সারসংক্ষেপের ফারসী অনুবাদের ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থটি এডমন্ড বার্কের উক্ত অভিমতসহ অক্সফোর্ডের বিখ্যাত বোলডেন লাইব্রেরীর সৌন্দর্য হয়ে আছে।

এডমন্ড বার্কের আসল (আরবী) হেদায়া অধ্যয়নের সুযোগ হবে কোত্থেকে? আসল গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ দেখার সৌভাগ্যও তার হয়নি। সারসংক্ষেপের ফারসী অনুবাদের ইংরেজী অনুবাদ দেখেই বেচারা এডমন্ড বার্ক এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। যদি এ বৃটিশ চিন্তাবিদ, আইনবেত্তা আসল হেদায়া গ্রন্থ দেখতে পেতেন, তবে আল্লাহই ভালো জানেন, হেদায়া গ্রন্থ এবং এর রচয়িতার কতোটুকু মর্যাদা তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হতো। *(সেদকে জাদীদ, ১৮ই আগস্ট সংখ্যা, ১৯৬১)*

যুবকদের পরিবর্তে বৃদ্ধ প্রবীণদের সাহচর্য উত্তম

হযরত আমর বিন আলা (র.)-এর বর্ণনা, একদিন আমি যুবকদের মজলিসে বসা ছিলাম। হযরত সায়ীদ বিন জোবায়র (র.) আমাকে সতর্ক করে বললেন, তোমার এখানে কি কাজ? বৃদ্ধ প্রবীণদের মজলিসে গিয়ে বসো। *(রওযাতুল ওকালা)*

www.nagorikpathagar.org

মানুষের সৌভাগ্য

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম হযরত আবু হাতেম (র.) বলেন, চারটি বিষয় মানুষের সৌভাগ্যের লক্ষণ।

১. স্ত্রী মেযাজমাফিক হওয়া, ২. সন্তানাদি অনুগত হওয়া, ৩. বন্ধু বান্ধব নেককার হওয়া, ৪. জন্মস্থানেই রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হওয়া। *(রওযাতুল ওকালা)*

আরবী ভাষার বিস্ময়কর প্রশস্ততা

'কেতাবুল মোবতাকের ফী-মা ইয়াতাআল্লাকু বিল মোআন্নাসে ওয়াল মোযাক্কার' 'গ্রন্থে বলা হয়েছে, মধুর জন্যে আশি, সাপের জন্যে দুশ', 'সিংহের জন্যে পাঁচশ', উটের জন্যে এক হাজার এবং তরবারি ও মসিবতের জন্যে আরবীতে চার হাজার নাম রয়েছে। হযরত ইমাম আসমায়ী (র) বলেন, পাথরের সত্তরটি নাম তো আমারই স্মরণ আছে।

এতো প্রশস্ততর অভিধান এবং কোনো বস্তুর এতো অধিক সংখ্যক নাম স্মরণ রাখতে যে স্মৃতিশক্তি স্মরণশক্তির প্রয়োজন ছিলো, তেমন স্মৃতিশক্তি মহান আল্লাহ আরবদের দান করেছিলেন।

হাম্মাদ রাদিয়া একদিন সমকালীন খলীফাকে বললেন, এ মজলিসেই আমি আপনাকে একশ' কাসীদা শোনাতে পারবো, যার প্রত্যেকটির পংক্তি সংখ্যা হবে বিশ থেকে নিয়ে একশ পর্যন্ত। এ বলে তখনই তিনি তার কাসীদাসমূহ খলীফাকে শুনিয়ে দেন।

সম্মান মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে হযরত ইউসুফ বিন আসবাত (রা.)

হযরত ইউসুফ বিন আসবাত (র.) প্রাচীন সুফিয়ায়ে কেরামের মাঝে একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন। একজন মুসলমান চিঠি লেখে তাকে জিজ্ঞেস করলো, প্রবৃত্তি আমাকে সম্মান মর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জনে বাধ্য করছে, এখন আমি কি করবো?

তিনি জবাবে লেখেন, প্রবৃত্তিকে সম্মান মর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জনের কামনা বাসনা থেকে প্রতিরোধ করা সে জেহাদ থেকে উত্তম, যে জেহাদে নিজের জীবন বিপদগ্রস্ত করে শত্রুর মোকাবেলা করা হয়।

(তাফসীরে রূহুল বায়ান, প্রথম খণ্ড, সূরা বারাআত)

হযরত কোতায়বা বিন মুসলিম (র.)-এর অশ্বপৃষ্ঠে নদী অতিক্রম

হযরত কোতায়বা বিন মুসলিম (র.) বোখারা জয়ের উদ্দেশে জায়হুন নদীর তীরে উপনীত হন। তখন কাফেররা সব নৌকা নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নেয়, যাতে তিনি নদী অতিক্রম করতে না পারেন। এসব সম্মানিত ব্যক্তিদের সমগ্র জীবনে রীতি ছিলো, তারা প্রয়োজনে যথাসাধ্য বস্তুগত উপায় উপাদান একত্র করতেন এবং তার যথাযথ ব্যবহারও করতেন। যেখানে বস্তুগত উপায় উপাদান ব্যর্থ হতো, সেখানে সরাসরি বস্তুগত উপায় উপাদানের স্রষ্টার দরবারে দোয়া করে তার প্রতি মনোনিবেশ করতেন।

www.nagorikpathagar.org

এটাই ছিলো তাদের সফল ও কার্যকর অস্ত্র। হযরত কোতায়বা বিন মুসলিম (র.) পরিস্থিতি দেখে নিম্নের ভাষায় আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন–

ইয়া আল্লাহ, তুমি জানো, শুধু তোমার উদ্দেশেই আমার জেহাদ; তোমার দ্বীনের সম্মান মর্যাদা এবং তোমার সত্তার জন্যেই আমাদের এ লড়াই। তুমি আমি এবং আমার সংগীদের এ দরিয়ায় নিমজ্জিত করে দিও না। আমার নিয়ত যদি তোমার দ্বীনের সম্মান মর্যাদা এবং তোমার সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু হয়, তবে আমাদের এ দরিয়ায় ডুবিয়ে দাও। এ দোয়া করেই তিনি নিজের ঘোড়া দরিয়ার অথৈ পানিতে নামিয়ে দেন। দেখতে দেখতে তার পুরো বাহিনী পদব্রজে এবং ঘোড়ায় আরোহিত অবস্থায়ই দরিয়ায় নেমে পড়ে। আল্লাহর অনুগ্রহে একজন সৈন্যেরও সামান্যতম কোনো ক্ষতি বা কষ্ট হয়নি। সবাই এমন নিরাপদে নির্বিঘ্নে দরিয়া পার হয়ে যান যেন তারা কোনো স্থলভূমি অতিক্রম করছেন। *(তাফসীরে রুহুল বায়ান)*

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

কোরআন পড়ুন! কোরআন বুঝুন!! কোরআন অনুযায়ী জীবন গড়ুন!!!

হাজার বছরের কোরআন মুদ্রণের ইতিহাসে এই প্রথম– চার রঙে সজ্জিত

আমার শখের

কোরআন মাজীদ

এতে আল্লাহ্ তায়ালার নাম, কোরআনের হালাল হারাম ও আদেশ নিষেধের আয়াতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ দেয়া হয়েছে

▼ *কোরআন বুঝার জন্যে পড়ুন- আল কোরআন একাডেমী লন্ডন-এর ডাইরেক্টর জেনারেল হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদের 'কোরআন শরীফ : সহজ সরল বাংলা অনুবাদ', বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের জন্যে কোলকাতা ফন্টে 'কোরআন শরীফ'। বাংলা অনুবাদ ও সাইয়েদ কুতুব শহীদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহ 'কোরআনের পাঞ্জে সূরা ও দোয়া দরূদ', 'কোরআনের পাতায় নারীর অধিকার', 'কোরআনের পাতায় সন্ত্রাস ও জেহাদ', 'আমপারা'। আরো রয়েছে 'কোরআনের অভিধান', 'কোরআনের সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' (আরবী ছাড়া), 'কোরআনের সাথে পথ চলা', 'মনীষীদের কোরআন গবেষণা' ও 'বিস্ময়কর গ্রন্থ আল কোরআন'।*

▼ কোরআনের ব্যাখ্যা জানার জন্যে পড়ুন– সাইয়েদ কুতুব শহীদ রচিত বিশ্বের সর্বাধিক মানুষের পঠিত, সর্বাধিক ভাষায় অনূদিত *'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' (২২ খণ্ডে সমাপ্ত)*। মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীর *'তাফসীরে ওসমানী' (৭ খণ্ডে সমাপ্ত)* ও মওলানা আবু সলিম মোহাম্মদ আবদুল হাই'র 'আসান তাফসীর'।

▼ কোরআন অনুযায়ী জীবন গড়ার জন্যে পড়ুন- মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ী রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত বিশ্ব সীরাত প্রতিযোগিতায় প্রায় ১২শ' পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রথম পুরস্কার বিজয়ী গ্রন্থ *'আর রাহীকুল মাখতুম'*, ঐতিহাসিক প্রামাণ্যচিত্র *'দ্যা ম্যাসেজ'*, ছবির কাহিনীর বাংলা রূপান্তর *'মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম', 'সীরাতে ইবনে কাছীর'*, প্রিয় নবীর ব্যক্তি জীবনের অনুপম সংগ্রহ *'তিনি চাঁদের চেয়ে সুন্দর', 'সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান', 'মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য', 'শোনো শোনো ইয়া এলাহী আমার মোনাজাত', 'জান্নাতের মানচিত্র', 'শুধু তোমাকে চাই', ও 'গানে গানে লিখি আল্লাহর নাম'*। আরো পড়ুন *'ফতোয়া ইউসুফ আল কারদাওয়ী', 'শহীদে মেহরাব ওমর ইবনুল খাত্তাব', 'ইসলামী আন্দোলন সংকট ও সম্ভাবনা', 'মাবরূক আল্লাহুম্মা মাবরূক'*, 'ইতিহাস ও ঐতিহ্য সিরিজের *'স্বর্ণ যুগে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ', 'মুসলিম ইতিহাসের গৌরবগাথা', 'হাজার সাল পহলে' ও 'মুক্তো দিয়ে গেথেছি মালা'* ইত্যাদি।

▼ আরো রয়েছে আল কোরআন একাডেমী লন্ডন এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মুনমুন পাবলিশিং হাউস-এর কতিপয় বিশ্লেষণধর্মী রচনা ও উপন্যাস- 'নাম সমাচার', 'দজ্জালের পা', 'বিয়ে নিয়ে ইয়ে', তালাকের পাঁচালী', 'প্রজন্মের প্রহসন', 'সাক্ষীর কাঠগড়ায় নারী', 'নির্বাচিতার কলাম', 'তিন তলার সিঁড়ি', 'বুবু', 'রাণী এলিজাবেথের দেশে', 'নূরী', 'দর্পনে আপন ছায়া', 'কন্যাকাহিনী' ও 'জিবরাঈলের জবানবন্দী' সহ অনেক সুখপাঠ্য বই।

▼ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় বিশ্বের প্রথম ইসলামী তথ্য ভান্ডার 'বাংলাদেশ ইসলামিক ডাইরেক্টরী'
'মোমেনের ডায়েরী', 'ইসলামী ক্যালেন্ডার' ও রং বেরংয়ের ওয়াল পোষ্টার।

▼ অচিরেই আসছে : 'কোরআনের পাতায় ইহুদী জাতির ইতিহাস', 'তাওহীদ শেরক ও আধুনিক জাহেলিয়াত' সহ আরো অনেক বই।

কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

Al Quran Academy London

63 Green Dragon Yard, London E1 5NJ, United Kingdom. Phone: 0044 020 7274 9164, Phone & Fax : 0044 020 7274 7418, Mob : 07956 466 955
Bangladesh Centre : 17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondy, Dhaka Phone & Fax : 8158971, 8158526 Mobile : 0188 363997
Sales Centre : Wireless Rail Gate, Moghbazar, Dhaka-1217 Phone : 933 9615 & 38, Banglabazar, Computer Market (1st Floor) Stall No. 226
E-mail:info@alquranacademylondon.com website www.alquranacademylondon.com

www.nagorikpathagar.org

পরিচ্ছন্ন বিনোদনের জন্যে
আল কোরআন একাডেমী লন্ডন ও
টেরেস্ট্রিয়া ইন্টারন্যাশনাল লি. এর

জমজমাট আয়োজন

বাংলা ভাষায় এই প্রথম- মাত্র ১ সিডিতে
কোরআনের যাদুকণ্ঠ ক্বারী আবদুল বাসেতের পূর্ণাংগ তেলাওয়াত ও
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদের সহজ সরল বাংলা অনুবাদ।

মুসলমানদের তেলাওয়াতের কোরআন ও ব্যবহরিক কোরআনের ব্যবধান এবং মুসলমানদের জান্নাতে যাওয়ার দিকনির্দেশনা নিয়ে মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ী রচিত দুটি ব্যাতিক্রমধর্মী নাটক
'কোরআনের জবানবন্দী', ও 'জান্নাতের মানচিত্র'

হৃদয়স্পর্শী ইসলামী গানের ভিডিও ও অডিও এ্যালবাম

আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশে নিবেদিত 'শুধু তোমাকে চাই', 'মিনতি আমার রাখো', 'ওগো দয়াময়', 'সকলি তোমার দয়া', *প্রিয় নবীর শানে* 'রসূল নামের ফুল এনেছি' *(নজরুলের গান)* 'হে প্রিয় নবী রসূল আমার', *নির্বাচিত ইসলামী গান* 'এখনো স্বপ্ন দেখি', 'রাব্বে যেদনী এলমা', 'আলোর মশাল', 'সুন্দর পৃথিবী তোমার', 'আবার শুরু হোক পথচলা' *রোযার গান* 'আহলান ওয়া সাহলান ইয়া শাহরু রামাদান' *ঈদের গান* 'এক ফালি চাঁদ ও *দেশের গান* 'আই লাভ মাই কান্ট্রি'।

সম্পূর্ণ নতুন ধারায় এই গানগুলো লিখেছেন খ্যাতিমান লেখিকা
মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ী

সুর দিয়েছেন লোকমান হাকিম, মশিউর রহমান, গোলাম মাওলা, জাফর সাদেক, আবুল আলা মাসুম, মনিরুজ্জামান (মনির) ও লেখিকা স্বয়ং

কণ্ঠ দিয়েছেন বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় শিল্পী হাসনা হেনা আফরিন, ও জান্নাতুল ফেরদাউস, আরো কণ্ঠ দিয়েছেন মশিউর রহমান, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, শামিমুল হক, আসিফ ইকবাল, শাহাবুদ্দীন, শিশু শিল্পী আজমিরা আনজুম রাফা, নুসরাত জাহান কুমুদ, তানজিলা তাসনিম সৃজনী, হোমায়রা আনজুম নেহা ও সানজিদা শাহরিন।

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদের অনুবাদ সহ নিত্য পঠিতব্য ও অতি প্রয়োজনীয় আমপারার ১৯টি সূরার সুললিত তেলাওয়াতের অডিও ভিসিডি,
তেলাওয়াত ঃ হাসনা হেনা আফরিন ও বাংলা অনুবাদে কণ্ঠ ঃ জান্নাতুল ফেরদাউস

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

বাংলাদেশ সেন্টার ঃ ১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫
ফোন : ০০৮৮-০২-৮১৫৮৯৭১, ৮১৫৮৫২৬
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ ৩৬২ ওয়ারলেস রেল গেইট (মাসজিদ কমপ্লেক্স ২য় তলা), বড় মগবাজার
ফোন: ৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাঃ ০১৮৮ ৩৬৩৯৯৭
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (দোতলা), দোকান ২২৬, বাংলাবাজার, ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন